কিছু বলুন। বলতে হয়।"

সর্বনাশ! গলাটা কাঠ হয়ে এল ভদ্রলোকের। এমন জানলে এ-সব হাঙ্গামা সে করতেই দিত না শঙ্করকে।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতেও হল। কিছু বলতেও হল। তবে ভরসা এই যে, সবাই গ্রামের লোক।

থেমে থেমে অতি কষ্টে তারিণীশঙ্কর বললে, "আমাদের এ গ্রামের চেহারা এখন একদম বদলে গেছে। আগে যারা এসেছে তারা দেখে আর চিনতে পারবে না। কিন্তু কেমন করে হল? কে করলে? তুমি করলে? তোমার ব্যাটা করলে? আমি করলাম? রাখহরি করলে? না, কেউ করেনি। করলে এই শঙ্কর। কোত্থেকে এল কেউ জানি না। কেন এল তাও জানি না। জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই বলে না। ওকে যেন ভগবান পাঠিয়ে দিলেন আমাদের গ্রামে। এত সুন্দর ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। ও আমাদের নিজের ছেলের চেয়েও বেশী।"

সবাই একসঙ্গে সায় দিয়ে উঠল।

তারিণীশঙ্কর বললে, "সারা গাঁয়ের লোককে সে আপনার করে নিয়েছে। ভগবানের কাছে দিনরাত তার মঙ্গল কামনা করছি। আমি আর কিছু বলতে পারছি না।"

প্রধান অতিথি হরি মোড়ল মাটিতে উবু হয়ে বসে বসে সব শুনছিল। বয়স তার সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো সব সাদা। মুখে একটিও দাঁত নেই। তারিণীশঙ্কর বসতেই সে উঠে দাঁড়াল। বললে, "তারিণীবাবু যা বললেন তা ঠিক। আমি একটি কথা বলছি—ঠিক কিনা তোমরা বল। শঙ্করের দেশ যেখানেই হক, আমরা তাকে এখান থেকে যেতে দেব না। আমরা সারা গাঁয়ের লোক চাঁদা করে তার ঘরবাড়ি করে দেব, জমি জায়গা দেব, বিয়ে দেব—দিয়ে এই গাঁয়ে রেখে দেব। আমি তার বাড়ি তৈরি করবার সব খরচ দেব। তোমরা কে কী দেবে তাই বল।"

তারিণীশঙ্কর প্রথমেই বললে, "আমি দেব পঁচিশ বিঘে জমি।"

হরি মোড়ল বললে, "বাড়ি তৈরী ছাড়াও আমি দেব দশ বিঘে জমি।"

আর একজন বললে, "আমি দেব দু'বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

এমনি করে কেউ এক, কেউ দুই, কেউ তিন বলতে বলতে যখন পঞ্চাশ বিঘের ওপর জমি দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—শঙ্কর নিজে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললে, "আপনারা থামুন। বাড়িঘর জমিজায়গা আমি চাই না। আমি চাই আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ। এইটিই আমি চেয়েছিলাম, আর তা আমি পেয়েছি। বিষয় সম্পত্তি বাড়িঘর নিয়ে আমি কী করব? আমি একা।"

এই বলে সে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়েই বসে পড়ল। তীরটা যাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে তার বুকে ঠিক লেগেছে কিনা বোধকরি একবার দেখতে চাইলে। ইন্দ্রাণী তখন মাথা হেঁট করে বসে আছে। মুখখানা ভাল দেখা গেল না।

ছেলেদের ইস্কুলটা ত সরকারী পয়সায় বড় হবেই, মেয়েদের ইস্কুলটাও শেষ পর্যন্ত বাদ যাবে না, তবে এখন যেমন চলছে চলুক।

এ যুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রামের প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের পাঠালে। ছোট ছোট মেয়েগুলো ত এলই, এমনকি বড় মেয়েরাও আসতে লাগল। বড় মেয়েরা যত-না এল পড়তে, তত এল ইন্দ্রাণীকে দেখতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সাধারণত রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানে না। এক-একজন ত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে, "ও মা, এ যে দেখছি মাথায় সিঁদুর রয়েছে! তা কর্তাটি ছেড়ে দিয়েছে, না আছে এখনও?" এক-একজন এমন কথা বলে যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ইন্দ্রাণীর।

প্রথম কয়েকদিন জয়া প্রায় অধিকাংশ সময় তার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকত। ইন্দ্রাণী ভেবেছিল, শঙ্কর শুধু সেই জন্যেই তার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। নইলে নিশ্চয়ই সে আসত। তাই জয়া যেদিন বলেছিল, "আজ রাত্রেও তোর কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণীর সত্যিই ভয় হয়েছিল মনে-মনে। বলেছিল, "তুই কি আমাকে আগলে রাখতে চাস নাকি?"

জয়া হেসেছিল। বলেছিল, "তা যেরকম রূপ নিয়ে জন্মেছিস, বিশ্বাস করব কেমন করে? তার ওপর বলছিস যখন কর্তাটির সঙ্গে তোর রাগারাগি হয়েছে—"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "নজর দেবার মত কেউ আছে নাকি তোদের গাঁয়ে?"

"পাশেই ত রয়েছে একজন।"

সে যে শঙ্করের কথা বলছে সেকথা বুঝতে ইন্দ্রাণীর দেরী হয়নি। বলেছিল, "যাঃ।"

জয়া বলেছিল, "আর যাই করিস, দেখিস যেন ওইখানে নজর দিস না।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "কেন? তোর বুঝি আগেই নজর পড়ে গেছে।"

জয়া বলেছিল, "ভারি শক্ত ঠাঁই। একবার ফিরেও তাকায় না।"

কথাটা শুনে খুশিই হয়েছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু সেদিন ইস্কুলের মিটিংএ শঙ্করের কথা শুনে তার সব আশা যেন নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

হালদারদের যে-মেয়েটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে, তার ডাক-নাম টুনু। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, রং ময়লা, চেহারাটা ঠিক ভালও বলা চলে না, আবার নেহাত মন্দও নয়। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টটা বড় মন্দ! সে-বছর গড়গড়ির মেলায় তার ভাই দুপয়সার তেলেভাজা খেয়ে এল; তাকেও দিয়েছিল দুটো, সেও খেয়েছিল, কিন্তু তার কিছু হল না। ভাইটার হল কলেরা। দিনে হল, রাত্রে মরে গেল। একটিমাত্র ভাই, বারো বছরের ছেলে, ধড়ফড় করে মরে গেল চোখের সামনে।

মা সেবা করেছিল ছেলের। মার হল পরের দিন। ছেলেকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে বাবা ফিরে এসে দেখলে, স্ত্রী ছটফট করছে। ছেলের শোক আর রোগের যন্ত্রণা বেশিক্ষণ তাকে সহ্য করতে হল না। বারো ঘণ্টাতেই সব শেষ হয়ে গেল। ছেলেকে আর স্ত্রীকে শ্মশানে রেখে এসে বাবা যে একটু বসে বসে কাঁদবে তারও সময় পেলে না। বাড়ি ফিরেই সে শুয়ে পড়লো। কিন্তু কি জানি কেন, বাপ অত সহজে গেল না। গাছ-গাছড়ার শিকড় ধারণ করে দুদিন সমানে যুঝলে এই মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে। সবাই বলতে লাগল, ভগবান এত নিষ্ঠুর নন। দুদিন পরে সে উঠে বসল। বললে, "খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খাব।" পাশের বাড়ি থেকে একথালা ভাত আর একবাটি মাছের ঝোল চেয়ে আনলে টুনু। বাপ আর মেয়ে দুজন খেলে বসে বসে। কিন্তু সেই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া হয়ে গেল। সকালে বাপ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। কেমন করে কখন যে মরে গেছে টুনু তা জানতেও পারল না। ছুটে ছুটে লোক জড়ো করলে। সবাই বলতে লাগল—ছেলে মলো, স্ত্রী মলো, অশৌচ অবস্থায় মাছ-ভাত খাওয়া তার উচিত হয়নি। শাস্ত্রবাক্য অমান্য করার এই ফল। শাস্ত্রবাক্য অমান্য অবশ্য টুনুও করেছিল। কিন্তু যমরাজ তাকে স্পর্শ করলে না।

বিয়ে অবশ্য একটা তার হয়েছিল। তখন তার বারো বছর বয়েস। বিয়ের পর সে তার স্বামীকেও আর দেখিনি, শ্বশুরবাড়িও যায়নি। সামুরাই গ্রামে গিয়ে হালদার তার জামাইএর খোঁজখবর অনেক করেছে কিন্তু নটবর গোঁসাইএর কোনও পাত্তা মেলেনি। ভিটেয় মাত্র একটা ন্যাড়া কুলগাছ ছাড়া আর কিছু ছিলও না লোকটার।

কাজেই টুনু সধবা কি বিধবা তাও সে জানে না।

বাপ ছিল নিতান্ত গরিব। সেও যখন

চলে গেল, আপনার বলতে কেউ আর রইল না টুনুর। বাড়িতেও কিছু নেই যে, বসে বসে খাবে।

টুনু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। তার চোখের জল গেল শুকিয়ে, মুখের কথা গেল বন্ধ হয়ে। এর ওর বাড়ির দোরে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখলে দয়া হয়। অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কেউ দেয় দুটি অন্ন, কেউ দেয় লজ্জা নিবারণের বস্ত্র।

কিন্তু শুধু অন্ন আর বস্ত্র দিলেই চলে না। ভগবান তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন, নেননি শুধু তার দেহের স্বাস্থ্য। সারা অঙ্গে তখন তার যৌবনের জোয়ার। অযত্ন-বর্ধিত বুনো গাছের মত সর্বদেহে তার বন্য মাদকতা।

তার জন্য চাই একটু নিরাপদ আশ্রয়।

তাও-বা কোনোদিন মিলত, কোনোদিন মিলত না।

সেই টুনু আজ আশ্রয় পেয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

ইন্দ্রাণী কিন্তু দুদিনেই তার চেহারা দিয়েছে বদলে।

"তুই রান্না করবি আর সেই রান্না আমি খাব? এই সাবানখানা নিয়ে যা পুকুরের ঘাটে, গিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার হয়ে আয়।"

ইন্দ্রাণী তাকে ভাল সাবান মাখিয়ে, ভাল তেল মাখিয়ে, নিজের পুরনো কাপড় পরিয়ে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে যে, তাকে আর সেই টুনু বলে চেনবার জো নেই।

ইন্দ্রাণী সেদিন একটা কাগজে লিখলে ঃ

ভাই জয়া,

অতিথির উপর রাগ করতে নেই। জিনিসটে যদি সত্যিই তোর হয় তো সে জিনিসে আমি হাত দেবো না, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। এখন কিন্তু তোকে আমার একান্ত প্রয়োজন। দয়া করে টুনুর সঙ্গে একবার আসবি? না এলে আমি নিজেই যাব। ইতি।

তোর
ইন্দ্রাণী

টুনুর সঙ্গে জয়া এল হাসতে হাসতে।

"ও-সব কী লিখেছিস হতভাগী?"

"বেশ করেছি। এখন শোন তোকে আমি কী জন্যে ডেকেছি।"

এই বলে জয়াকে তার ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে বললে, "তোর বাবুটির সঙ্গে যে একবার দেখা করা দরকার। তোর অনুমতি ছাড়া ত দেখা করতে পারি না।"

জয়া বললে, "আমার আবার বাবু কে? যাঃ!"

"ওই যে গো পাশে থাকে, তোমাদের গাঁয়ের হিরো, ইস্কুলের সেক্রেটারি।"

"কেন, শঙ্করদার নামটা কি তোকে উচ্চারণ করতে নেই নাকি?"

এই বলে খুব রসিকতা করেছে মনে করে হাসতে হাসতে জয়া ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "কী দরকার? বল না। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুই কি ভেবেছিস বল দেখি? ও কি আমার কাছে সত্যিই দুর্লভ? আমি যদি ইচ্ছে করি, কেনা গোলামের মত ওকে আমার পিছু পিছু ঘোরাতে পারি।"

জয়া বললে, "পারবি না।"

"বাজি রাখ।" ইন্দ্রাণী বললে, "দ্যাখ্ পারি কি-না!"

জয়া বললে, "না বাবা, যদি-বা একটু আশা আছে তাও আবার যায় কেন?"

"আছে নাকি আশা?"

নীরবে হাসতে হাসতে জয়া তার চোখের ইশারায় জানিয়ে দিলে—আছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে, "কথাবার্তা হয়েছে নাকি কিছু?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—শঙ্করকে বিয়ে করবি? আপত্তি না থাকে ত বল্, একবার দেখি চেষ্টা করে।"

কথাটা ইন্দ্রাণীর বুকে গিয়ে বাজল ধক্ করে। তবু সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুই কি বললি?"

"আমি? আমি ভাই লজ্জায় মুখ বুজে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।"

ইন্দ্রাণী হঠাৎ তলিয়ে গেল তার নিজের চিন্তায়। সত্যিই ত ওরই-বা কী দোষ? বিয়ে যে এতদিন সে করেনি—এই তার পরম সৌভাগ্য। দুরন্ত অভিমানে যাকে সে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, মনের উত্তেজনা শান্ত হলে সেই

"খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?"

তারই কথা ভেবেছে সে দিবারাত্রি। সমরকে পাঠিয়েছে কলকাতায়। ফিরে এসে বলেছে, কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে বারবার শুধু মাথা ঠুকেছে আর অনুতাপ করেছে। কেঁদেছে আর বলেছে ভগবানকে—'তাকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে দেখি তাকে আমার মনের মত করে তুলতে পারি কিনা! যে-ভুল আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগটুকু দাও একবার।' তার সে প্রার্থনা যে এমন'করে তিনি শুনবেন সেকথা কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই।

শঙ্করের এখন অভিমানের পালা।

ইন্দ্রাণী প্রস্তুত হল অভিসার যাত্রায়।

শঙ্কর খেতে এসেছিল বাগান-বাড়িতে। কার্তিক বাড়িতে খায় দিনের বেলা।

সেদিন রবিবার। ইস্কুলের কাজ বন্ধ।

শঙ্কর শেষ রাত্রে ওঠে বিছানা ছেড়ে। স্যানিটারী প্রিভি, স্নানের ঘর, শঙ্কর তৈরি করিয়েছে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টারেও তৈরি করিয়ে দিয়েছে।

আমগাছের তলায় অনেকক্ষণ ধরে শঙ্কর এক্সারসাইজ করে, নিজের হাতে কুয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের ড্রাম ভর্তি করে, তারপর স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে যখন উঠনে এসে দাঁড়ায়—পূর্বদিকের আকাশে তখন সূর্য ওঠে। দুহাতের আঙুলে আঙুলে ভাঁজ দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করে শঙ্কর। গ্রামের কয়েকজন ছেলে আসে ব্যায়াম করতে। শঙ্কর তাদের দেখিয়ে দেয়।

বারোয়ারীতলায় কার্তিকের ব্যান্ডপার্টির বাজনার আওয়াজ শোনা যেতেই শঙ্কর বেরিয়ে পড়ে।

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাতে উঠে ইন্দ্রাণী সব-কিছু দেখেছে। রোজই দেখে।

রাত্রে খাওয়া শেষ করেই কার্তিক বাড়ি চলে যায়। শঙ্কর একাই থাকে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় তার কাছে। সে যখন এল না তখন তাকেই যেতে হবে। কিন্তু যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে আসে। ছাতে গিয়ে একা বসে বসে খানিকটা কাঁদে।

ইন্দ্রাণী জয়াকে বললে, "চল্ এবার যাই। খাওয়া এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

দুজনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, খাওয়া শেষ করে শঙ্কর তখন চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবছে। মুখ তুলে তাকিয়ে এদের দেখেই একটু হেসেই বললে, "কী খবর?"

জয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "আপনার মাষ্টারনী কী যেন বলবে।"

শঙ্কর বললে, "বলুন।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ভেবেছিলাম ক্লাসটা দেখতে যাবেন একবার, গেলেন না তাই আসতে হল।"

"রাস্তাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। জয়ার বাবা তাড়া লাগিয়েছেন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে।" শঙ্কর জয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি ত জানো ওই রাস্তার ওপর দিয়ে শহর থেকে মোটরে চড়ে ডাক্তার আসবেন তোমাদের হাসপাতাল দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ইস্কুলে সত্তর জন মেয়ে আসছে। একটা ঘরে কুলোয় না, দুটো ঘরে বসাতে হয়।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি। একা সামলাতে পারছেন না?"

"না। দুদিক সামলান শক্ত।"

শঙ্কর বললে, "পড়ছে ত সব অ আ ক খ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেই ত হয়েছে আরও মুশকিল। কেউ ত অক্ষর চেনে না। বইও নেই অনেকের। সবাইকে চিনিয়ে দিতে হয়।"

শঙ্কর জয়ার দিকে তাকালে। "বন্ধুকে একটু সাহায্য কর না।"

"ও আমার বন্ধু কেন হবে? শত্রু।"

এই বলে জয়া হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, "সত্যি কিনা—আচ্ছা তুইই বল না!"

শঙ্কর বললে, "ওরে বাবা 'তুই' হয়ে গেছে এরই মধ্যে? তাহলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।"

জয়া বললে, "কখ্খনো না। ওকে সাহায্য করতে গিয়ে কি আমি মরব?"

"তবে দেখুন," শঙ্কর বললে, "অতগুলো মেয়ে থাকবে না। কতক গেছে হুজুগে পড়ে, কতক গেছে আপনাকে দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

শঙ্কর বললে, "বয়েসে ছোট হতে পারেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে মর্যাদায় আমার চেয়ে আপনি অনেক—অনেক বড়।"

মাথা হেঁট করে কথাটা শুনছিল ইন্দ্রাণী। শঙ্করের বলা শেষ হলে ইন্দ্রাণী তার আয়ত চোখের পাতাদুটি একবার তুললে শঙ্করের দিকে। তুলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলে। রাগ নয়, অভিমান নয়, ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত যে-চোখের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল শঙ্করের, তার চিহ্ন-মাত্র ছিল না সে-চোখে। মিনতিকাতর চোখদুটি যে এরই মধ্যে সজল হয়ে এসেছে সেটুকু চোখে পড়বার মত যথেষ্ট আলো তখন ছিল সে-ঘরে।

শঙ্করের কিন্তু বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা গেল না, সে বরং তার বলার সুরটা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিলে। বললে, "তুমি বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই। তাছাড়া সে অধিকারই-বা আমি পাব কোথায়?"

"অধিকার?" জয়া বললে, "ওর হয়ে আমি দিলাম আপনাকে। বলুন আপনি। বেশ শোনাবে।"

এই বলে ব্যাপারটাকে আরও তরল করে দেবার জন্য জয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আমাকে কেউ 'আপনি' বললে না। —আর কিছু বলবি?"

"কাকে বলব?"

ইন্দ্রাণীর গলাটা যেন ধরে গিয়েছে মনে হল।

জয়া বললে, "আমি ত তোকে আগেই বলেছি, শঙ্করদার শরীরটাও যেমন পাথরের মত, ওর মনটাও তেমনি। নে, চল।"

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। শঙ্করের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। না তাকাবার কারণ বোধহয় তার চোখে তখন জল এসে পড়েছিল। জয়া কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালে। দুষ্টু হাসি ছিল তার মুখে। কিন্তু মুখের হাসি তার মুখেই রয়ে গেল শঙ্করের মুখের পানে চেয়ে। তারও মুখখানা যেন কান্নার মত করুণ। মনে হল তারও চোখদুটো যেন চিক চিক করছে।

সরোজিনী সেবা-সদনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তা তৈরির কাজ জোর চলছে। ব্যালুমা থেকে গাড়ি গাড়ি কাঁকর আসছে, পাথর আসছে। তারিণীশঙ্কর শহরের মিউনিসি-প্যালিটি থেকে হাতে-টানা একটা রোলার এনে দিয়েছে।

রাখহরির মুহূর্তের অবসর নেই। ডাক্তার-খানার ওষুধপত্র থেকে আরম্ভ করে সব রকমের সব জিনিস আনিয়ে সাজিয়ে দেবার ভার দেওয়া হয়েছে একজন ঠিকাদারের উপর। জিনিসপত্র আসতে আরম্ভ করেছে।

মন্মথবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাখহরি এরই মধ্যে একদিন গিয়েছিল রাস্তাটা দেখতে। শঙ্করের কাছে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললে, "দ্যাখো, ভাল কাজের একটা নেশা আছে। জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে বটে, কিন্তু মন্দ লাগছে না।"

শঙ্কর তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলে একটুখানি।

রাখহরি বললে, "নেশাটা তুমিই ধরিয়ে দিলে।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"তবে মন্মথবাবু আমাকে খুব সাহায্য করলেন।"

শঙ্কর বললে, "মানুষটি ভাল।"

"তোমাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। প্রায়ই বলেন তোমার কথা।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের ওপ্নিংএর দিন আসবেন ত?"

রাখহরি বললে, "বললেন ত চেষ্টা করব। হ্যাঁ, কথায় কথায় তোমার সেই বন্ধু নরেনের কথা উঠল। বললাম, আসবার জন্যে একখানা চিঠি লিখে দিন না। উনি বললেন, হতভাগা যত না আসে ততই ভালো। এই দেখুন একখানা চিঠি লিখেছে। হাতের লেখা দেখুনে না। রাবিশ্! বলে ড্রয়ার থেকে খামের একখানা চিঠি দেখালেন।"

"কী লিখেছে চিঠিতে?" শঙ্কর জিজ্ঞাসা না করে পারলে না।

রাখহরি বললে, "হাতের লেখা দু'লাইনের বেশী পড়তে পারলাম না। মন্মথবাবু বললেন, আমি পড়েছি অতি কষ্টে। বড়লোকের ছেলে—বড়লোক বন্ধু জুটেছে। সেই বন্ধুর সঙ্গে কোথায় কোন্ জঙ্গলে যাবে বাঘ মারতে।"

শঙ্কর হো হো করে হেসে উঠল। "নরেন বাঘ মারবে?"

রাখহরি বললে, "হ্যাঁ। মন্মথবাবুকে লিখেছে খুব ভাল একটা বন্দুক কিনবে। তার লাইসেন্সের জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে পাঠাবেন।"

শঙ্কর বললে, "বন্দুক কিনলেই বুঝি বাঘ মারা যায়?"

রাখহরি কিন্তু এসেছিল অন্য কথা বলতে। বললে, "মরুকগে, শোন। সেইটের কী হল? সেই যে বলেছিলাম।"

"কী বলেছিলেন, বলুন ত।"

কথাটা শঙ্করের ঠিক মনে পড়ছিল না। রাখহরি বললে, "শুভকাজগুলো একসঙ্গে সেরে দিই তাহলে।"

"শুভকাজ?" শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করলে।

রাখহরির কেমন যেন লজ্জা করছিল বলতে। "এখনও মনে পড়ল না? নিজের কথা কি কিছু মনে থাকে না তোমার? জয়ার বিয়ে।"

ইন্দ্রাণী আসার পর কথাটা শঙ্কর সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। পরিষ্কার জবাব দিলে রাখহরি আঘাত পাবে। শঙ্কর এখন আর তাকে সে-আঘাতটা দিতে চাইলে না। বললে, "রাস্তাটা শেষ হোক্, আপনার ডাক্তারখানা খুলে যাক্, তারপর বলব। এখন কিছু ভাবতে পারছি না।"

শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখে, কে যেন বসে আছে তার বিছানায়। ঘরের জানলা দরজা সবই খোলা। বন্ধ করার অভ্যাস তার নেই। পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর ভরে গেছে।

চিনতে দেরি হল না শঙ্করের। ইন্দ্রাণী বসে আছে। সেই ইন্দ্রাণী তার এত কাছে? একেবারে নাগালের ভেতর, মুঠোর মধ্যে।

শঙ্কর উঠে বসল না, শুধু পাশ ফিরে শুলো ইন্দ্রাণীর দিকে মুখ করে। "ইন্দ্রাণী!"

ইন্দ্রাণী চুপ করে আছে, কোনও কথা বলছে না। ডান হাতটি বাড়িয়ে শঙ্কর তার একখানি হাত চেপে ধরে আবার ডাকলে, "ইন্দ্রাণী!"

মাথা হেঁট করে বসে ছিল ইন্দ্রাণী। তার চোখ থেকে গড়িয়ে টপ্ করে এক ফোঁটা জল পড়ল শঙ্করের হাতে।

"তুমি কাঁদছো ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে কথা বললে। "আমাকে ক্ষমা কি তুমি করবে না?"

শঙ্কর বললে, "কী দোষ তুমি করেছ যে, তোমাকে আমি ক্ষমা করব?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমাকে অপমান করেছি, তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—"

"যাকে ভালবাসতে পারবে না, তাকে তাড়িয়ে দেবে না ত কী করবে?"

"কিন্তু তারপর?" ইন্দ্রাণী বললে, "কেঁদে কেঁদে মরলাম।"

শঙ্কর বললে, "কার জন্যে কাঁদলে? যে-লোকটা তোমাকে প্রতারণা করেছিল, যে-লোকটা ছিল তোমার দু' চক্ষের বিষ—তার জন্যে কেঁদে মরলে?"

"তাছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না যে!"

"কেন? দুটো মন্ত্র পড়ে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলে?"

ইন্দ্রাণী মাথা হেঁট করে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল, কোনও কথা বললে না। শঙ্করের হাতটি ধরে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "আমার মা চেয়েছিল আমি মানুষ হই, তুমিও চেয়েছিলে একটি মানুষের মত মানুষ। কাউকে আমি খুশী করতে পারিনি। মা সরে গেল আমার কাছ থেকে। তুমিও আমাকে সরিয়ে দিলে তোমার কাছ থেকে। আমার আর কোনও অবলম্বন রইল না পৃথিবীতে। আমি চলে এলাম দূরে। চেষ্টা করলাম আমার পিছনের জীবনটাকে ভুলে যেতে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, তুমি সুখী হও।"

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে। বললে, "কেমন করে হব?"

"মানুষ কেমন করে সুখী হয় তুমি জানো না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না। পারলাম না ত সুখী হ'তে!"

শঙ্কর বললে, "পারবে কেমন করে? ভালবাসা দিতে পারনি যে! মানুষ সুখী হয় ভালবেসে। তোমার উচিত ছিল প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পার—এমন একটি মানুষকে খুঁজে বের করা।"

"কী যা-তা বলছ? আমি হিন্দুর মেয়ে না?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "ধ্যেৎ তেরি হিন্দু! দেখছি ত চারদিকে তাকিয়ে। ভালবাসার নামগন্ধ নেই কোথাও। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘরকন্না করছে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে হচ্ছে, অথচ কেউ কাউকে ভালবাসে না। কাজ কি তোমার এই হিন্দু-সমাজে? তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ। সবার আগে তুমি নিজে, তোমার জীবন। তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার অধিকার তোমার আছে।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে' শুনছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন অন্য শঙ্কর। যে-শঙ্করের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়, এ যেন সে শঙ্কর নয়।

শঙ্কর কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বললে, "তুমি বলছ তুমি হিন্দুর মেয়ে। দেবতা আর অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে বিয়ের সময়। তার পরমুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি। তোমার স্বামী পছন্দ হয়নি, স্বামীর ঘর পছন্দ হয়নি, শাশুড়ী পছন্দ হয়নি। শাশুড়ী ঝি-এর মত কাজ করেছে, আর তুমি সেজেগুজে চুপচাপ বসে বসে রাগে ফুলেছ। বৌভাতের দিন বিদ্রোহের চরম করে' তুলেছ। ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, বিধবা মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, আর ঠিক সেই সময় তুমি কী করেছ? কচি খুকি নও, লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে, অসহায়া সেই বিধবা শাশুড়ীর অনুরোধ উপরোধ নিষেধ-বারণ সবকিছু অগ্রাহ্য করে' তাকে সেই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছ সেখান থেকে। তুমি যদি তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, ছেলে তার যত বড় পাষণ্ডই হোক, তিনি অন্তত অমন করে গলায় ফাঁসি লটকে আত্মহত্যা করতেন না।"

মার কথা বলতে বলতে শঙ্করের গলাটা ধরে এল, চোখ দুটো ছল্ ছল্ করতে লাগল।

ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়ে তখন দর্ দর্ করে' জল গড়াচ্ছে। দু হাত বাড়িয়ে শঙ্করের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, "আর বোল না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার অন্যায় হয়েছে, অপরাধ হয়েছে।"

এই বলে সে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শঙ্কর তাকে তুলে দিলে। বললে, "কেঁদো না, চুপ কর। হিন্দুর মেয়ে! হিন্দুর মেয়ে! শাশুড়ী মরে গেছে, খবর পেয়েছ, অশৌচ পালন করনি। তারপর তোমার সেই স্বামী তোমার কাছে গেছে অনুতপ্ত হয়ে, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে তোমাকে চেয়েছে, তোমাকে ভাল-বেসে তোমার ভালবাসা পেয়ে নিজেকে আবার নতুন করে' গড়ে তুলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে, তুমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার পর্যন্ত করতে চাওনি, অপমান করে, দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ। তখন তুমি হিন্দুর মেয়ে ছিলে না? তখন কোথায় ছিল তোমার হিন্দুত্ব?"

কাঁদতে কাঁদতে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "চুপ কর, তুমি চুপ কর। তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—তুমি আর বোল না।"

শঙ্কর বললে, "বেশ আর বলব না। কিন্তু আমি খুশী হতাম, যদি দেখতাম, তুমি একটি মানুষকে ভালবেসে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছ।"

"না, তা আমি পারিনি। কোনোদিন পারব না।" বললে ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর বললে, "তোমার হিন্দুধর্ম এইখানে খানিকটা কাজ করেছে। তোমার সহজাত সংস্কার তোমাকে ও-পথ মাড়াতে দেয়নি।"

"কী বললে? ওইরকম করলে তুমি খুশী হতে? তোমার রাগ হত না?" ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে।

"রাগ কেন হবে?" শঙ্কর বললে, "আমি জানতাম আমি তোমার অযোগ্য, তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি, তাই অন্য আর-একজনকে ভালবেসে সুখী হয়েছ। এ ত আনন্দের কথা। ভালবাসতে পারার মত, ভালবাসা পাওয়ার মত—সুখ বল সৌভাগ্য বল—আর-কিছু আছে মানুষের জীবনে? ভালবেসে ভুলও যদি কর তবু ভাল। ভালবাসার অভিনয় নয়, সত্যিকারের ভালবাসা। পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছে তারা, জানবে, মা-বাপের ভালবাসার সন্তান। সেই রকমের সন্তানের মা হ'তে তোমার ইচ্ছা করে না?"

"জানি না। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ভগবানের নাম নিয়ে আর এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—শুধু তোমার কথা ছাড়া আমি আর কারও কথা ভাবতে পারিনি। তোমার সেই ঝিলপাড়ার বাড়িতে সমরকে পাঠিয়েছি। নিজে গেছি। তোমাদের বস্তির বাড়িটা দেখে এসেছি। থানায় গেছি তোমার সন্ধান করতে। থানার বড়বাবু তোমার সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন। বলেছেন, 'ছেলেটাকে আমি ভুল বুঝে-ছিলাম।' তিনি আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমিও তার খোঁজ করছি—খবর পেলেই তোমাকে জানাব'।"

বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।"

ইন্দ্রাণী তখন ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলেছে।

"কিন্তু কেন? কেন তুমি সেই গুণ্ডাটাকে খুঁজে মরছিলে? সে ত তোমাকে সুখে রাখতে পারত না।"

"না আমি তাকে খুঁজিনি। আমি খুঁজেছিলাম সেই লোকটিকে যে একদিন আমার কাছে গিয়ে বলেছিল—আমি ভাল হব। আমি তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব।"

এই বলে ইন্দ্রাণী তার হাতখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "অনেক কথাই ত তুমি আমাকে বললে, এইবার আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দাও।"

"কি বলবে বল।"

"তুমি কি কোনও মেয়েকে ভালবেসেছ?"

শঙ্কর বললে, "বেসেছি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "কাকে? জয়াকে?"

"না। ইন্দ্রাণীকে।"

ইন্দ্রাণী, "কেন ঠাট্টা করছ? ইন্দ্রাণীকে তুমি পাওনি, পাবার আশাও কোনোদিন করনি, তার কাছ থেকে দূরে এক গ্রামে এসে লুকিয়ে বসে আছ, তবু বলছ তাকে ভালবাসি?"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি ভালবাসি। ভগবানকেও ত মানুষ পায় না, কাছে পাবার আশাও করে না, তবু মানুষ তাকে ভালবাসে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না না হেঁয়ালী রাখ। সত্যি বল।"

"সত্যি বলছি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ইন্দ্রাণী এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের বুকের ওপর। দুহাত দিয়ে শঙ্করের মুখখানি চেপে ধরে বললে, "আবার বল! তুমি আবার বল!"

বলতে বলতে আবার তার সেই সুচারু সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্ত কেঁপে উঠল, মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি দেখা গেল, আয়ত দুই চোখের কালো দুটি তারা থেকে আরম্ভ করে সুঠাম সুগঠিত দুটি হাত, হাতের আঙুল—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অবয়ব আনন্দের শিহরণে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কৃত তারের মত থর থর করে কাঁপতে লাগল।

জানলার পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ইন্দ্রাণীর সেই অপরূপ সুন্দর মুখের ওপর। স্বচ্ছ দু' ফোঁটা জল টলটল করছে তার চোখের কোণে।

শঙ্কর ধরলে তার মুখখানি দুহাত দিয়ে। বললে, "তুমি তোমার মনের মত স্বামী পাওনি, কিন্তু আমি? আমি ত

পেয়েছিলাম আকাশের চাঁদ—যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। তাই ইন্দ্রাণীর নাম হয়েছিল আমার জপমালা—যে ইন্দ্রাণী আমাকে তাড়িয়ে—"

কথাটা ইন্দ্রাণী তাকে শেষ করতে দিল না। "না না, আর বোল না। আর আমি তোমাকে"—বলতে বলতে ইন্দ্রাণী তার নিজের মুখ দিয়ে শঙ্করের মুখ দিলে বন্ধ করে।

তারপর আকাশে রইল অতন্দ্র চাঁদ, আর ঘরে রইল আনন্দবিহ্বল এই বিনিদ্র দম্পতি। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ রাত্রি আর স্তম্ভিত গ্রাম।

আশ্চর্য সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে। সেখান থেকে ঠিকরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে পথের ধুলোয়। ঝির্ ঝির্ করে মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন শিউরে উঠছে শির্ শির্ করে। রিম ঝিম রিম ঝিম করে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক— মগজে ধরিয়ে দিচ্ছে গোলাপী নেশার আমেজ।

শঙ্কর ঠিকই বলেছিল। তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা কমে এসেছে। অজুহাত নানারকমের। কেউ বলছে, 'টেপীর মায়ের অসুখ, এ সময় টেপী ইস্কুলে গেলে ঘরের কাজকর্ম করবে কে?' আবার কেউ-বা বলছে, 'টগরীর পরনের কাপড় ছিঁড়ে-গেছে, শহর থেকে কাপড় এনে দিই, তারপর ইস্কুলে যাবে।'

তারিণীশঙ্কর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরেও আনছে অনেককে। এক টাকার জায়গায় মাইনে করে দিয়েছে দু'টাকা। মোট কথা মাস্টারনীর মাইনেটা কোনরকমে উঠে যাবে।

সেদিন শঙ্করকে ডেকে পাঠালে তারিণীশঙ্কর।

জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ইস্কুল কেমন চলছে?"

"আমার ইস্কুল? আপনি বলছেন কি?"

"ঠিকই বলছি। তোমাকে সেক্রেটারি করে দিয়েছি, তুমি যাবে একবার করে', দেখবে, নতুন মাস্টারনীকে একটু বলবে ভাল করে'—তবে ত? শুনছি তুমি একদম ও-পথ মাড়াও না।"

"লজ্জা করে। তাছাড়া ফট্ করে কে কখন কি বদনাম রটিয়ে দেবে।"

"বদনাম রটালেই হল? আমরা মাইনে দিই, ও কাজ করে, না না তুমি যাবে।"

শঙ্কর বললে, "আপনি বরং যাবেন মাঝে-মাঝে।"

"আমি কি আর যাইনি ভেবেছ? দুদিন গিয়েছিলাম। তাছাড়া মেয়েটিকে আমার বাড়িতে ডেকে এনে খুব খাইয়ে দিয়েছি সেদিন। ভারী ভাল মেয়ে। তুমি আমাকে কাকাবাবু বল, তাই না শুনে ও-ও আমাকে কাকাবাবু বললে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। কার্তিকের মায়ের সঙ্গে কত কথা।"

শঙ্কর আর বেশী কিছু শুনতে চাইলে না। কাজ আছে, বলে চলে গেল।

কিন্তু দোরের কাছ থেকে পিছনে ডাক শুনে আবার তাকে ফিরে যেতে হল। "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ ডাকছি।" তারিণীশঙ্কর বললে, "একটা কথা মনে পড়ে গেল। শুনছি নাকি রেখো তোমার সঙ্গে ওর ওই ধিঙ্গি মেয়েটার বিয়ে দিতে চায়?"

শঙ্কর বললে, "চাইতে পারে, কিন্তু বিয়ে করছে কে?"

"হ্যাঁ। খবরদার, খবরদার। মেয়েকে দিয়ে ব্যাটা তোমাকে হাত করতে চায়। তোমার জন্যে খুব ভাল মেয়ে দেখে দেব আমি। কার্তিকের আর তোমার এক সঙ্গে বিয়ে দেব। পুব দেশের ভাল মেয়ে।"

শঙ্কর আবার পালাতে চাইলে, কিন্তু তারিণীশঙ্কর আবার বসালে তাকে। যেতে দিলে না। বললে, "ওই যে মাষ্টারনী এসেছে, দাঁড়াও, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করব আমি—ওর বোন-টোন আছে কি না। বউ করতে হয় ত ওই রকম মেয়ে। তোমার কাকীমাও বলছিল—ঘর আলো করা মেয়ে। হ্যাঁ, শোন, যে-কথাটা বলবার জন্যে ডাকলাম তোমাকে। শুনছি নাকি ওর ডাক্তারখানার ওষুধপত্র সব এসে গেছে?"

শঙ্কর বললে, "সব আসেনি। আসছে কিছু-কিছু।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ব্যাটার বেশ খসবে, কি বল?"

"হ্যাঁ তা খসবে বই-কি! ও-সবের দাম ত কম নয়।"

"কিন্তু আমার রাস্তা খোলবার আগেই ব্যাটা ওর ডাক্তারখানা খুলে দেবে না ত?"

শঙ্কর বললে, "তাই পারে কখনও? ডাক্তারখানা হলেই ত হবে না, ডাক্তারও ত চাই!"

"হ্যাঁ তা চাই। ডাক্তার আনবে।"

শঙ্কর বললে, "ডাক্তার ত উড়ে আসবে না! আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই আসতে হবে। রাস্তাটা আগে শেষ হক।"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি ট্রেনে আসে? স্টেশনের রাস্তাটা ত হয়ে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "না গরুর গাড়ি চড়ে ডাক্তার আসবে না বলেছে। বলেছে; বড় রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরে চড়ে আসবে।"

তারিণীশঙ্কর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল; "ঠিক হয়েছে। আগে আমার রাস্তা খুলবে, তারপর আমার সেই রাস্তার ওপর দিয়ে রাখহরির ডাক্তার আসবে। তাহলে আমার রাস্তা আগে, তারপর ওর ডাক্তারখানা।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি চলি। আমার দেরি হয়ে গেল।"

বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শঙ্কর সেদিন সত্যিসত্যিই গেল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। কিন্তু রাস্তা তৈরির কাজ ছেড়ে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। বিদ্যালয়ের তখন ছুটি হয়ে গেছে।

পাশেই ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টার।

শঙ্কর গিয়ে দেখলে, তোলা উনুনের উপর কেটলিতে চায়ের জল গরম করছে টুনু, আর ইন্দ্রাণী তখন স্নানের ঘর থেকে এসে জামা কাপড় ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

শঙ্কর বলল, "নমস্কার!"

ইন্দ্রাণী চট্ করে মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে মুখের হাসি ঠোঁট দিয়ে চেপে বললে, "নমস্কার। বসুন।"

খাটের উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ইন্দ্রাণী চোখের ইশারায় সেইখানেই তাকে বসতে বলেছিল, কিন্তু টুনু রয়েছে বলে শঙ্কর খাটের তলা থেকে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

রাত্রে টুনু শোয় পাশের ঘরে। কাজেই এ-ঘরের কোথায় কি থাকে শঙ্কর সবই জানে।

ইন্দ্রাণী কিছু বলবার আগেই শঙ্কর বললে, "তারিণীবাবু ইস্কুলটা মাঝে মাঝে দেখতে বলছিলেন, তাই এসেছিলাম আপনার ছাত্রীদের দেখতে। রাস্তা থেকে আসতে দেরি হয়ে গেল। নইলে ছুটির আগেই আসতাম।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি এখান পর্যন্ত এসেছেন। ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে আপনি দোর থেকে ফিরে যাননি এই যথেষ্ট। টুনু সেক্রেটারি-বাবুকে আগে এক পেয়ালা চা দাও। শুধু চা দেবে? দাঁড়াও দেখছি।"

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শঙ্কর ডাকলে, "টুনু।"

"উঁ" টুনু মুখ তুলে তাকালে।

"কাজকর্ম ভাল করে করছ ত?"

টুনু মাথাটি হেঁট করে বললে, "হুঁ।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েটা কেমন? মাষ্টারনী লোক ভাল ত?"

টুনু এবার তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটু হেসে বললে, "খুব ভাল"।

ইন্দ্রাণী ফিরে এল একটা কুঁজো হাতে নিয়ে। বললে, "টুনু কুঁজোতে এক ফোঁটা জল নেই। যাও চট্ করে' সেক্রেটারিবাবুর বাগানবাড়ির কুয়ো থেকে জল নিয়ে এস। ছাড়ো, চা আমি করে নিচ্ছি।"

টুনু উঠে দাঁড়াল। কুঁজোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দোরের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ল। "কুঁজোর জলটা ফেলে দিলাম।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি"।

"কিন্তু এ রকম আর কতদিন চলবে বল ত? আমার আর ভাল লাগছে না।"

এই বলে ইন্দ্রাণী ডিম ভাঙতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "রাস্তা, ডাক্তারখানা খুলে যাক।"

"কখন খুলবে?"

"আর বেশি দেরি নেই।"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেদিন কি বিপদেই না পড়েছিলাম। কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, বরটি কী করে? কী যে বলব ভেবেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বললাম, কিছুই করে না। বরের আমার মাথার ঠিক নেই। পাগল বললেও হয়। জিজ্ঞাসা করলে, ছেড়ে দিয়েছে নাকি? বললাম, একরকম ছেড়ে দেওয়াই! প্রথম যেদিন এখানে এলাম, জয়া জিজ্ঞাসা করলে, তখন ত জানি না তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাই সত্যি কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলাম।"

শঙ্কর বললে, "তোমাকে আরও কাঁদাবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু পারলাম না।"

ইন্দ্রাণী কাজ করতে করতে বলতে লাগল, "তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর জয়াকে একদিন বলেছি, তোকে আমি মিছে কথা বলেছি জয়া। স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি। আসলে আমার এখনও বিয়েই হয়নি। অভিভাবক বলতে কেউ নেই, একা একা এখান ওখান ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই মিছেমিছি সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে সধবা সেজেছি। মেয়েটা খুব চালাক। আমার কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেনি।"

শঙ্কর বললে, "কাকীমা তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঘর আলো-করা বউ। তোমার বোন-টোন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।"

"কেন?"

"থাকলে তার সঙ্গে হয় আমার, নয় কার্তিকের বিয়ে দেবেন।"

দুজনেই হাসতে লাগল।

ইন্দ্রাণী বললে, "হায়রে অদৃষ্ট। বোন আমার নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর না।"

"কী কাজ?"

"জয়াকে যে কথা বলেছি তোমার কাকা-বাবুকে বল সেই কথা। বল, মাষ্টারনীর বিয়ে হয়নি, সে কুমারী। জিজ্ঞাসা করবে ত, তাহ'লে সিঁথিতে সিঁদুর কেন? বলবে, অপরিচিত জায়গায় এল বলে পুরুষদের ভয়ে মিছেমিছি সিঁদুর পরে এসেছে।"

"তারপর?"

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে বললে, "তোমার সঙ্গে আবার আমার বিয়ে হবে। বেশ হবে কিন্তু।"

ভাজা ডিমটা প্লেটের উপর রাখলে ইন্দ্রাণী। বললে, "যে-মানুষটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল এখন ত আর তুমি সে-মানুষ নও। একেবারে বদলে নতুন মানুষ হয়ে গেছ। কাজেই নতুন করে' আবার যদি আমাদের বিয়ে হয়, মন্দ হবে না।"

"ভুল বলছ ইন্দ্রাণী," শঙ্কর বললে, "আমি ঠিক সেই মানুষই আছি। এতটুকু বদলাইনি। বদলান এত সহজ নয়।"

প্লেটটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। "না গো মশাই না।" বলতে বলতে শঙ্করের কাছে এসে প্লেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, "খাও। আমি চা আনছি।"

"তুমি খাবে না?"

"পরে খাব। তুমি খাও আগে।"

শঙ্কর ধরে বসল। "না এক সঙ্গে খাব।"

"ধেৎ! টুনু এসে পড়বে।"

শঙ্কর চামচ দিয়ে ডিমটা দু'ভাগ করে' একটা ভাগ নিজের জন্যে রেখে আর একটা ভাগ হাত দিয়ে তুলে ইন্দ্রাণীর মুখের কাছে ধরলে। বললে, "হাঁ কর। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

"না।"

"তোমাকে খেতেই হবে।"

"ধেৎ! না—"

শঙ্কর কিছুতেই ছাড়বে না।

ইন্দ্রাণীও হাঁ করবে না। তাকে বিশ্রী দেখাবে হয়ত'। "খেয়ে রেখে দাও না। বলছি আমি পরে খাব।"

শঙ্করের কিন্তু জেদ চড়ে গেছে। হাঁ করে তার হাত থেকে তাকে খেতেই হবে। এক হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে সে জোর করে ধরে টেনে তাকে নিজের কোলের উপর এনে ফেললে। তারপর আদর করে তাকে খাওয়াতে লাগল। এক সঙ্গে সবটা কিছুতেই খেলে না ইন্দ্রাণী। একটু একটু করে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে নিতে লাগল। ছোট মোড়ার উপর বসে আছে শঙ্কর। ইন্দ্রাণী তার পা দুটো মুড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শঙ্করের কোমরটা, আর হেসে হেসে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খাচ্ছে।

টুনু এসে পড়বে বলে খেতে আপত্তি করেছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু মনের আনন্দে সে-জ্ঞান সে হারিয়ে ফেললে খেতে খেতে।

"বেশ তাহ'লে তোমাকে আমি খাইয়ে দিই।"

বাকী টুকুরোটি ডান হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে ইন্দ্রাণী শঙ্করের মুখের কাছে ধরলে।

দুজনেই খেতে লাগল।

দোরের দিকে কেউ তাকায়নি। টুনু বাগান-বাড়িতে যাবে, কুয়ো থেকে জল তুলবে, কুঁজোটা ধোবে ভাল করে', তারপর জল ভরে নিয়ে ফটকের বাইরে এসে ফটকটা বন্ধ করবে, তারপর আসবে। ততক্ষণে তাদের খাওয়া হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া শেষ হয়েছিল, কিন্তু শঙ্করের তখনও শেষ হয়নি। খেতে খেতে হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল দোরের উপর।

একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে দোরে দাঁড়িয়ে আছে টুনু নয়—জয়া।

শঙ্কর না পারলে উঠে দাঁড়াতে, না পারলে ইন্দ্রাণীকে সরিয়ে দিতে, কী যে করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। ইন্দ্রাণী ছিল

দাঁড়িয়ে আছে টুনু নয়—জয়া

দোরের দিকে পিছন ফিরে, বাকী ডিমটুকু খাইয়ে দেবার জন্যে হাতটাও ঠিক সেই সময় তুলে ধরলে। হাতটা সরিয়ে দিয়ে শঙ্কর ডাকলে, "জয়া!"

ইন্দ্রাণী চট্ করে শঙ্করকে ছেড়ে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই দোরের দিকে তাকিয়ে দেখে, জয়া নেই।

"কোথায় জয়া?"

শঙ্কর বললে, "দেখেই চলে গেল।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ছি ছি, তুমি একি করলে বল ত?"

বলেই সে চা করতে বসল। বলল, "জানি এই রকম হবে একদিন। আর কতদিন চাপা দিয়ে রাখবে আর কেনই-বা রাখবে? ভালই হয়েছে। আজ আমি জয়াকে সব বলে দেব।"

শঙ্কর বললে, "না না আজ বোল না।"

"কেন বল ত? এখনও তুমি চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছ কেন?"

টি-পটে চা দিয়ে জল ঢেলে ইন্দ্রাণী কাপ দুটো আনবার জন্যে উঠল। বললে, "কী ভেবে গেল বুঝতে পারছ?"

শঙ্কর বললে, "খুব পারছি।"

"তার ওপর, তোমার ওপর ওর নজর আছে।"

"সব জানি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "তবু বলব না?"

"না।"

"যদি জিজ্ঞাসা করে? কী জবাব দেব?"

"যা হক একটা দেবে বলে'। দুদিন পরে জানতেই ত পারবে সব।"

টুনু এল জলের কুঁজো নিয়ে। জিজ্ঞাসা করলে, "কুঁজোটা এই ঘরে রাখি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "রাখো।"

কুঁজোটা রেখে টুনু বললে, "আমি চা করছি। ছাড়ো।"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে, "জয়াকে দেখলি?"

"দেখলাম।" টুনু বসল চা করতে। তারপর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললে, "ওইখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে বলতে বারণ করলে।"

আজ আর টুনুকে ইন্দ্রাণী লজ্জা করলে না। চা তৈরির ভার তার উপর ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী শঙ্করের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই ত দাঁড়িয়ে আছে, শুনলে, এখন কী করব বল। ডেকে আনব?"

"আমি চলে যাই। তারপর।"

"তার মানে লজ্জাটা নিজে গায়ে মাখতে চাচ্ছ না। 'মরি ত আমিই'"—

টুনু চা নিয়ে এল। ইন্দ্রাণী চায়ের কাপ দুটি তার হাত থেকে নিয়ে একটি শঙ্করের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর-একটি নিজে নিয়ে বসল খাটের উপর।

"সত্যি কথা বলতে কেন বারণ করছ আমাকে বলতে হবে।"

চা খেতে খেতে শঙ্কর বললে, "গ্রামে দুজন বড়লোক। আমার কাকাবাবু, আর জয়ার বাবা। দুজনের মনের মিল নেই। আমি সেইটেকেই মূলধন করে দুজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছি। জয়ার বাবার গোপন বাসনা আমাকে তিনি জামাই করবেন। আজকেই যদি সে আশাটুকু নির্মূল হয়ে যায়, আর কালকেই যদি বলে দেন—এই রইল তোর ডাক্তারখানা, ওটা আমার বৈঠকখানা হবে। তাহলেই গেছি। তাই আমি তোমার কথাটা বলতে চাই সেইদিন—যেদিন ও'র ডাক্তারখানাটা খোলা হবে। তার আর দেরি নেই। রাস্তা আর ডাক্তারখানা একই সঙ্গে খোলা হবে। আর দুচারটে দিন কোনরকমে দাও চালিয়ে। তোমার ভয় বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। অভিনয় করে দুদিন মজা কর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "মজাটা কেমন যেন মর্মান্তিক হয়ে যাচ্ছে।"

শঙ্কর বললে, "এই দ্যাখো কেমন সুন্দর বাংলা বলছ তুমি। আমি লেখাপড়া শিখিনি। পারি না।"

"তোমাকে আমার ইস্কুলে ভর্তি করে নেব।" ইন্দ্রাণী বললে।

শঙ্কর বললে, "টুনু সব শুনেছে ত।"

"শুনুক। টুনু বড় ভাল মেয়ে। ও আমাকে সব বলেছে। গাঁয়ের ব্যাটাছেলেগুলো ভারি বজ্জাত, না টুনু?"

টুনু বললে, "হ্যাঁ দিদিমণি।"

বলেই সে লজ্জায় যেন মরে গেল।

ইন্দ্রাণী বললে, "সব সমান। আমাদের সেক্রেটারিবাবুকে ভাল মনে করেছিলাম। ও আমাকে কেমন করছে দ্যাখ্।"

"আমি চলি।" শঙ্কর চলে গেল।

ইন্দ্রাণী তার পিছু পিছু দোর পর্যন্ত

এল, কিন্তু জয়াকে কোথাও দেখতে পেলে না। পালিয়েছে নাকি?

সদর দোরটা বন্ধ করে ইন্দ্রাণী যেই ফিরেছে, দেখলে এদিকের একটা দেয়ালের আড়াল থেকে জয়া বেরিয়ে এল।

"দিলি ত পোড়ারমুখী সব শেষ করে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "কি করব বল, ইস্কুলের সেক্রেটারি, একটু হাতে রাখতে হয়।"

"ওর নাম বুঝি হাতে রাখা? কোলে শুয়ে পড়েছিলি, আমি বুঝি দেখিনি!"

ইন্দ্রাণী বললে, "গায়ের জোরে পারলাম না যে! লোকটার গায়ে অসুরের মতন বল।"

জয়া বললে, "দাঁড়া, কাল আমি সব রটিয়ে দেব। শঙ্করদা ভাল, শঙ্করদা ভাল। বাবাঃ, আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।"

"তোর বাবা ত ওকে জামাই করবে।"

"আবার? তোর মতন সতীনকে নিয়ে আমি ঘর করব বুঝি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি তখন ছেড়ে দেব। —আচ্ছা ধর, আমি যদি বলি আমি কুমারী। সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি পুরুষ মানুষের ভয়ে। আমি যদি ওকে বিয়ে করি?"

জয়া বললে, "কর না। আমি কেড়ে নেব।"

দেখতে দেখতে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। ময়নাবুনি থেকে শহরে যাবার পাকা সড়ক। বাহাদুর শঙ্কর। বাহাদুর কার্তিক আর গ্রামের ছেলেরা। তারিণীশঙ্করের ইচ্ছা, শহর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বড় বড় উকিল, আর দুচারজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে এনে, বেশ একটু জমকালো রকমের সভায় নিজের নামটা প্রচার করে রাস্তাটা খোলার ব্যবস্থা করা। তারিণীশঙ্কর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে জানালে, সবাইকে এক করা মুশকিল। তবে আগামী পঁচিশে তারিখে কিসের যেন একটা ছুটি আছে, সেইদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের সামর্থ্যে এই যে এত বড় একটা কাজ করা হয়েছে, তার জন্যে প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

শঙ্কর বললে, "তার ত এখনও দশবার দিন দেরি।"

তারিণীশঙ্কর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন। কাজেই দেরিটাকে আর দেরি মনে হচ্ছে না। বললেন, "তা হক না। এদিককার আয়োজনও ত করতে হবে।"

"না আমি সেজন্যে বলছি না। রাখহরিবাবুর ডাক্তারখানার কাজ শেষ হয়ে গেছে। উনি আর খরচ টানতে পারবেন না, তাই ওটা উনি সরকারের হাতে তুলে দিতে চান।"

তারিণীশঙ্করের খুশীর মাত্রাটা যেন আর এক ধাপ উঠল। হেসে বললেন, "দেখলে? আমার কথাটাই ঠিক হল ত শেষ পর্যন্ত। ওটা যাতে আমার হাতে আসে তার ব্যবস্থা করে দিও শঙ্কর। ও ডাক্তারখানা ইউনিয়ন বোর্ড চালাবে।"

শঙ্কর বললে, "তাই হবে আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"আমি বেঠিক কখনও বলি না।"

শঙ্কর বললে, "শহর থেকে সিভিল সার্জেন আসবেন পরশু।"

"তুমি তাহলে সিভিল সার্জেনের কানে-কানে ওই কথাটা বলে দিও।"

"নিশ্চয়ই বলব।"

শঙ্কর বললে, "পরশু তাহলে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে শহর থেকে আপনারই এই রাস্তার ওপর দিয়ে।"

তারিণীশঙ্কর তার কথাটাকে আর-একবার আওড়ালেন। "হেঁ-হেঁ, আমারই রাস্তার ওপর দিয়ে। আমার রাস্তা আগে, তারপর তোর ডাক্তারখানা! ওর ডাক্তারখানা আর রইলো কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "তাহ'লে এই কথা রইল। আজ তাহলে এই রাস্তার ওপর হাতে লিখে একটা সাইনবোর্ড পুঁতে দিই। আনুষ্ঠানিক ভাবে রাস্তাটা আজই খুলে দেওয়া হল। ধরে নিন।"

"সাইন বোর্ড? কী লেখা থাকবে তাতে?"

শঙ্কর বললে, "তারিণীশঙ্কর সরণী।"

"সরণী? সরণী মানে?"

শঙ্কর বললে, "সরণী মানে সড়ক। নামটা ইন্দ্রাণী বললে। আপনার ওই মাষ্টারনী।"

আরও খুশী হল তারিণীশঙ্কর। ইন্দ্রাণীর নাম শুনে আর-একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে, "জিজ্ঞাসা করেছিলে ওর বোন-টোন আছে কিনা?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "এ-সব হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর বলব আপনাকে একটা কথা। শুনে খুশী হবেন কিনা জানি না, তবু বলব।"

"না না এক্ষুনি বল।" ধরে' বসল তারিণীশঙ্কর। কিন্তু কিছু না বলেই হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল শঙ্কর।

উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শঙ্কর।

হাতে-লেখা সাইন-বোর্ড পুঁতে দেওয়া হল রাস্তার ধারে। তারিণীশঙ্কর সড়ক। সরণী কথাটা বাদ দিয়ে দিলে শঙ্কর। বললে, "আমরা সব মুখখু-সুখখু মানুষ, সরণী কথাটার মানে বুঝব না। আমাদের সড়কই ভাল।"

পরের দিন সিভিল সার্জেন আসবেন শহর থেকে। আসবেন 'সরোজিনী সেবা সদন' দেখতে। দেখেই যাবেন শুধু। দেখে গিয়ে মন্মথবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে' যা করবার করবেন।

রাখহরি বললে, "মন্মথবাবুও আসতে পারেন।"

পরের দিন সকাল থেকে সেবা-সদন সাজাতে আরম্ভ করেছে গ্রামের ছেলেরা। সরোজিনী সেবা সদনের সাইন-বোর্ড টাঙানো হয়েছে। নানারকম রঙিন কাগজের ফুল আর শিকলি তৈরি করে দিয়েছে জয়া।

কার্তিক তার ব্যাণ্ড-পার্টির রিহার্স্যাল দিচ্ছে। নিজে তার হাতে নিয়েছে বন্দুক আর কাঁধে ঝুলিয়েছে ক্যামেরা।

শঙ্কর তারিণীশঙ্করকে নিয়ে ব্যস্ত। তারিণীশঙ্কর বলছে, সে যাবে না। শঙ্কর বলছে, "চলুন। ডাক্তারখানার উদ্বোধন যদিও আজকে হচ্ছে না, তবুও আজ আপনার যাওয়া উচিত।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ও যে আসেনি আমার বালিকা বিদ্যালয়ের মিটিংএ!"

"এসেছিলেন। এসেই চলে গিয়েছিলেন মেয়েকে রেখে।"

"তাহলে আমাকে তুমি যেতে বলছ?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যাবেন শুধু আপনার রাস্তার ওপর দিয়ে শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে সেইটি দেখতে।"

"ঠিক বলেছ। তাহলে যাই। আমি কিন্তু কথা বলব না রেখোর সঙ্গে।"

"তা নাই-বা বললেন। তবু চলুন।"

ফরসা জামা কাপড় পরে গলায় একটা চাদর ঝুলিয়ে তারিণীশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। কার্তিককে বললেন, "ভাল করে বাজাবি। শহর থেকে সিভিল সার্জন আসছে তারিণীশঙ্কর সরাণের ওপর দিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "সরাণ নয়, সরণী।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ও হো হো, এতক্ষণে বুঝতে পারছি—আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক রাস্তাকে সরাণ বলি।"

শঙ্কর বললে, "কিন্তু সরাণ সরণী বদলে সড়ক করে' দিয়েছি।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "বেশ করেছ। যা সবাই বোঝে সেই কথা লেখাই ভাল।"

তারিণীশঙ্কর রাখহরির সঙ্গে কথা বলবে না, রাখহরিও বলবে না তারিণীর সঙ্গে। রাখহরি ছিল তার ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে, আর তারিণী ছিল তার রাস্তার

সাইন-বোর্ডটার কাছে। শঙ্কর শ্ননলে না কিছ্নতেই। তারিণীকে বললে, "আসন্ন আপনাকে একবার ডাক্তারখানাটা দেখাই।"

"রেখো যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফটকের কাছে।"

"থাক না!"

"দিয়েছ ত আচ্ছা করে খরচ করিয়ে।"

"সেইটেই ত দেখাতে চাচ্ছি আপনাকে।"

তারিণীশঙ্কর এল। ঢ্নকল রাখহরির ডাক্তারখানায়।

"ওরে বাবা, এত ওষ্নধ?"

শঙ্কর বললে, "এইদিকে তাকান।"

"ওরে বাবা, এটা কী?"

রাখহরি বলে উঠল, "অপারেশন টেবিল। ওইখানে শ্নইয়ে কাটাছাঁটা করা হবে।"

তারিণীশঙ্কর সেদিকে তাকালে না। না তাকিয়েই বললে, "দাম নিশ্চয়ই অনেক!"

শঙ্কর চোখের ইশারা করে দিলে রাখহরিকে। রাখহরি বললে, "টাকাকড়ি যা কিছ্ন ছিল সব শেষ হয়ে গেল। মেয়েটার বিয়ে কেমন করে দেব তাই ভাবছি।"

ভারী খ্নশী হল তারিণীশঙ্কর। রাখহরির বিমর্ষ ম্নখখানার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলে না। বললে, "তা যদি বলছ ত একবার জিজ্ঞাসা কর শঙ্করকে। রাস্তাতে আমার কম খরচ হল না। তার ওপর আবার মেয়েদের ইস্কুল।—ওরে বাবা, এ-ঘরে বিছানা পাতা কেন?"

রাখহরি বললে, "যে-সব র্নগী বাড়ি যেতে পারবে না তারা থাকবে এইখানে। এ ঘরে প্নর্নষদের ছটি বেড, আর এই ঘরে মেয়েদের ছটি বেড।"

তারিণীশঙ্কর বসল একটা খাটের উপর। বেশ করে টিপেট্নপে দেখলে। বললে, "লোহার তৈরি। দাম আছে।"

শঙ্কর বললে, "ভাল করে চেপে বসন্ন। দেখাচ্ছি একটা জিনিস।"

তারিণীশঙ্করকে র্নগীর মত শ্নইয়ে খাটের হ্যাণ্ডেল ঘ্নরিয়ে একদিকটা উ'চু করে' দেখিয়ে দিলে। বললে, "উ'চু নিচু নানারকম করা যায় এগ্নলো।"

"তাহলে এরই দাম অনেক বল।"

"নিশ্চয়।"

দেয়ালের ঘড়িতে টং করে' আওয়াজ হল। রাখহরি সেইদিকে তাকিয়ে বললে, "আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। এস আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

সবাই বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যাণ্ড-পার্টির দল তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্কর বললে, "আমি একট্ন এগিয়ে দেখি। তোরা ঠিক হয়ে থাক।"

তারপর হঠাৎ কী ভেবে কার্তিকের হাত থেকে বন্দ্নকটা নিয়ে বললে, "এইটে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তারের গাড়ি দেখলেই আমি আওয়াজ করব। আওয়াজ শ্ননলেই তোরা বাজাতে আরম্ভ করবি। দে একটা কার্টিজ দে।"

কার্তিক বললে, "ফাঁকা কার্টিজ নয় কিন্তু।"

"নাই-বা হল।"

কার্তিক জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আসবে কেমন করে? গাড়ি ত চলে আসবে এগিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "আমি গাড়ির পাদানিতে চড়ে বসব।"

এই বলে শঙ্কর এগিয়ে চলে গেল। নতুন তৈরি সোজা রাস্তা। ছেলেরা তাকিয়ে রইল সেইদিকে। শঙ্কর যাচ্ছে ত যাচ্ছেই।

খানিক দ্নরে গিয়ে রাস্তাটা যেখানে ঢাল্ন হয়ে নেমে গেছে, একট্ন একট্ন করে শঙ্কর সেইখানে অদ্নশ্য হয়ে গেল।

রাস্তার ধারে ধানের মাঠ, প্নকুর আর গাছপালার ঝোপ। ঝোপের কাছে জ্নতোর আওয়াজ হতেই শঙ্কর তাকালে সেইদিকে। তাকিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে পড়তে হল সেইখানে। দেখলে, নরেন এগিয়ে আসছে। অনেকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা। সেই আদালতে দেখেছিল তাকে আর এই এখন দেখছে। চেহারার বিশেষ কিছ্ন পরিবর্তন হয়নি। দামী একটা স্নট পরে তাকে মানিয়েছে চমৎকার।

শঙ্কর বললে, "কি রে নরেন, এখানে কেন?"

নরেন একটা কথাও বলছে না। এগিয়ে আসছে তার দিকে। নরেনের একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে আর একটা হাত খালি।

"কি রে, কথা বলছিস না যে? তোর খবর আমি পেয়েছি।"

তব্ন কথা বলছে না নরেন। শঙ্করের কাছে এসে ফস্ন করে পকেট থেকে হাতখানা বের করলে। হাতে একটা ছোট্ট অটোমেটিক রিভলবার। শঙ্কর ভাবতেই পারেনি যে, নরেন সেটা চালিয়ে দেবে। দ্নম্ন করে একটা আওয়াজ হল। শঙ্করের তলপেটে লাগল গ্নলিটা।

বাঁ হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে শঙ্কর চিৎকার করে উঠল, "নরেন।"

নরেন তখন রাস্তার ধারে ধারে প্রাণপণে ছ্নটছে আর পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। শঙ্করের হাতে দেখেছে বন্দ্নক। ভয়ে তখন তার হয়ে গেছে।

ওদিকে আওয়াজ শ্ননে কার্তিকের ব্যাণ্ড-পার্টি তখন বাজাতে আরম্ভ করেছে।

যত জোরেই ছ্নট্নক, নরেন তখনও রেঞ্জের বাইরে যায়নি। শঙ্করের হাতে রয়েছে দোনলা বন্দ্নক। একটিমাত্র কার্টিজ আছে ওতে। ওই একটি কার্টিজই যথেষ্ট। সন্ধান তার অব্যর্থ। এক্ষ্ননি তাকে শ্নইয়ে দিতে পারে।

বন্দ্নকে একবার হাত রাখলে শঙ্কর। হঠাৎ কী ভেবে হাতটা সরিয়ে নিলে। প্রতিহিংসাপরায়ণ মন এক্ষ্ননি হয়ত প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠতে পারে, তাই বন্দ্নক থেকে কার্টিজটি বের করে দ্নরে ছ্নড়ে ফেলে দিলে।

পেটে বাঁ হাতটা চেপে ধরে ছ্নটতে ছ্নটতে ফিরে আসছে শঙ্কর। ব্যাণ্ড-পার্টি সমানে বাজিয়ে চলেছে।

কার্তিক বললে, "শঙ্করদা, গাড়ি কোথায়?"

শঙ্করের ম্নখে জবাব নেই। রাস্তার উপরেই বসে পড়ল শঙ্কর।

ব্যাণ্ডের বাজনা বন্ধ করে দিয়ে কার্তিক ছ্নটে এল তার কাছে।

"এ কী? এত রক্ত কেন শঙ্করদা?"

"বন্দ্নকের গ্নলি লেগেছে।" শঙ্কর বললে।

"এই বন্দ্নকে? কখ্নো না।" বলেই বন্দ্নকটা তার হাত থেকে নিয়ে চট করে' সেটা খ্নলে দেখলে কার্টিজটা নেই, চোখ

দিয়ে নলটা দেখলে—তাতে ফায়ারিংএর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কার্তিক চিৎকার করে উঠল, "শঙ্করদা! বল—বল এ-কাজ কে করলে?" বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

কার্তিকের সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনে ছেলেরা ছুটে এল।

কার্তিক বললে, "শঙ্করদাকে বাড়ি নিয়ে যা। আমি আসছি।"

শঙ্কর বললে, "ওকে যেতে দিস না।" ওকে ধর।"

কার্তিক তখন বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটেছে। ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। কার্তিক আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দে। আজ আমি যার হাতে বন্দুক দেখব তাকেই শেষ করে দেব।"

ওদিকে তারিণীশঙ্কর রাখহরি দুজনেই তখন ছুটে এসেছে। রক্ত দেখে চমকে উঠেছে তারা। "কে করেছে? এ সর্বনাশ কে করলে শঙ্কর?"

ছেলেরা তখন তাকে আড়কোলা করে তুলেছে।

শঙ্কর বললে, "নামিয়ে দে, নামিয়ে দে, হেঁটে আমি যেতে পারব। সে শক্তি আমার আছে।"

আঙুল বাড়িয়ে শঙ্কর সেবা সদনটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ওইখানে নিয়ে চ।" রাখহরির দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, "আমিই আপনার সেবা সদনের প্রথম পেশেণ্ট। অপারেশন টেবিলটা কাজে লেগে গেল।"

সাজানো সেবা-সদনের গেট পেরিয়ে ছেলেরা নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে ভেতরে এল। তারপর সব-চেয়ে ভাল খাটটার উপর শুইয়ে দিলে। রাখহরি আর তারিণী-শঙ্কর পাশাপাশি এসে দাঁড়াল তার শিয়রের কাছে। "বল শঙ্কর, এ-কাজ কে করেছে বল।"

শঙ্কর বললে, "আমি—আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

রাখহরি বললে, "ওষুধপত্র এখানে সবই রয়েছে, অথচ ডাক্তার ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।"

রাখহরি আর তারিণীশঙ্কর তখন এক হয়ে গেছে।

শঙ্কর দেখলে। দেখে বড় তৃপ্তির হাসি হাসলে। হেসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা সব রাস্তায় যা। ডাক্তার-বাবু আসবেন। দ্যাখ।"

রাখহরি বললে, "আমি দেখি। আয় তোরা আমার সঙ্গে।"

ছেলেরা চলে যাচ্ছিল। তাদের ভিতর একজনকে ডেকে শঙ্কর বললে, "গৌর, শোন। তুই একবার চট্ করে যা ত ভাই, মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী ইন্দ্রাণীকে আর জয়াকে ডেকে আন। এ-সব কিছু বলিস না।"

তারিণীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "ওদের ডাকতে বললে কেন? চেঁচামেচি করবে।"

"হ্যাঁ, চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে। ইন্দ্রাণী খুব কাঁদবে। ইন্দ্রাণী কে জানেন কাকাবাবু? বলে নিই। পরে যদি বলবার সময় না পাই।"

তারিণীশঙ্কর তার শিয়রের কাছে এসে বসল।

শঙ্কর বললে, "ইন্দ্রাণী আপনার বৌমা। আমার বিয়ে-করা স্ত্রী।"

"এ-কথা এতদিন বলনি শঙ্কর?"

"না বলিনি। আমার মা বিয়ে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। আমরা মা কে জানেন? আপনার দাদার স্ত্রী—আপনার বৌদিদি। আমার মা মারা গেছেন।"

"তুমি কি তাহলে—"

"আপনার দাদা ভবানীশঙ্করের ছেলে—রবিশঙ্কর। রবিটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। এই আমার জন্মস্থান। তাই এ গ্রামটাকে আমি এত ভালবাসি। অনেক কিছু করবার ইচ্ছা ছিল। কিছুই করতে পারলাম না।"

এতক্ষণ পরে শঙ্করের চোখের কোণে জল দেখা গেল।

কার্তিককে ধরে নিয়ে এল দুজন ছেলে।

তারিণীশঙ্কর বলে উঠল, "ওরে শোন শোন কার্তিক, শঙ্কর কে জানিস? ও আমার দাদার ছেলে, তোর আপন জেঠতুতো ভাই।"

"আরে ধেৎ, আমার কিছু ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক্ ওর জন্মবৃত্তান্ত, ও আমার দাদা, আমার শঙ্করদা।"

বলেই সে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, "বলবে না ত? আচ্ছা—বোল না। কিন্তু এই আমি"—হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বললে, "এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে যে মেরেছে, সে যেখানেই থাক্, তাকে আমি বেঁচে থাকতে দেব না।"

"ওরে পাগল, শোন, এইখানে আয়!" শঙ্কর ডাকলে কার্তিককে।

"তোমার দিকে তাকাতে পারছি না আমি।" বলতে বলতে কার্তিক গিয়ে বসল শঙ্করের কাছে। শঙ্কর বললে, "কেউ আমাকে মারেনি। আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

"ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না।"

"তবে শোন, দেশকে ভালবাসবি, মানুষকে ভালবাসবি মিথ্যাচার করবি না। জানবি সত্যই ভগবান। মা বলেছিল, 'তোর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবি।' সেই সম্পত্তি উদ্ধার করতে আমি এসেছিলাম। সম্পত্তি উদ্ধার আমি করেছি। এই হাসপাতাল, এই বিদ্যামন্দির আর আমাদের জীবন দিয়ে গড়া এই পথ। আজ শহর আর গ্রাম এক হয়ে গেল। ওই পথের ওপর দিয়ে আজ প্রথম আসছে ডাক্তারের গাড়ি। এইটিই আমি চেয়েছিলাম। এই পথকে প্রণাম কর!"

কার্তিকের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। হাত দুটি তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

রাখহরি ঘরে ঢুকল। —"ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

কার্তিক উঠে দাঁড়াল। তারিণীশঙ্কর এগিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় দোরের কাছে জয়া ডাকলে, "বাবা!"

শঙ্কর বললে, "কার্তিক, তোর বৌদি এসেছে।"

কথাটা শুনে কার্তিক একটু হকচকিয়ে গেল। আবার বসল সে শঙ্করের পাশে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "বৌদি কে? জয়া?"

শঙ্কর বললে, "না, ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী আমার স্ত্রী।"

"হুঁ। তা এতদিন বলতে কি হয়েছিল?" বলে কার্তিক বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এসেছিলেন। তিনিও বোধ করি ডাক্তার। এক মুহূর্ত দেরি করলেন না তিনি। শঙ্করকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ক্লোরোফর্ম করে অপারেশনের আয়োজন ঠিক করে ফেললেন। গরম জলে নতুন কেনা ছুরি কাঁচি টগবগ করে ফুটতে লাগল।

অপারেশন করবার আগে কিন্তু একটা বড় অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল। শহরের সিভিল সার্জেন এসেছেন। এসেছেন বন্ধু মন্মথবাবুর অনুরোধে নতুন এই ডাক্তার-খানাটি দেখতে। এসেই কিন্তু বিপদে পড়ে গিয়েছেন। গুলি-খাওয়া পেসেণ্ট। অপারেশন করে গুলি বের করতেই হবে। সরকারী কর্মচারী হলেও সেবাব্রত তাঁর ধর্ম। জামা খুলে হাতে দস্তানা পরে তৈরি হলেন। কিন্তু তার আগে শঙ্করের মুখ থেকে তাঁর শোনা উচিত—কে মেরেছে তাকে। জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার বলুন, কে আপনাকে গুলি মেরেছে। পুলিসের কাজটা আমিই করি।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"বলুন!" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

শঙ্করের যন্ত্রণা হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সামলে নিয়ে বললে, "জানি না।"

"জানি না কি বলছেন? চেনেন না তাকে?"

জীবনে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে সে। আবার বললে।

"আজ্ঞে না। চিনি না।"

"লোকটা দেখতে কি রকম?"

শঙ্কর বললে, "ঠিক মানুষের মত।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি চেনেন তাকে, তবু বলছেন না।"

"যদি না বলি?" শঙ্কর বললে।

"ছুরি আমি ধরব না।"

"তাহলে কতক্ষণে মরব?"

"বেশি দেরি হবে না।"

শঙ্কর বললে, "ছুরি ধরে বুলেটটা বের করে দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না।"

"তা যখন পারছেন না, ছুরিটা তখন আর না-ই বা ধরলেন!"

ডাক্তারবাবু দেখলেন—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ-কথা যে বলতে পারে সে বড় সহজ মানুষ নয়। ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে এ্যাসিস্টেণ্টকে ক্লোরোফর্ম ধরতে বললেন। আর দেরি করা চলে না।

ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না সেখানে। আশ্চর্য নিপুণতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করলেন।

এতক্ষণ কাউকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেননি। দোর খুলতেই দেখলেন, সমস্ত গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। আবাল-বৃদ্ধবনিতার অশ্রুভারাক্রান্ত মুখগুলি দেখে অপ্রিয় কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে সহজে বেরুতে চাইলো না। জয়া আর ইন্দ্রাণীকে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন। সাবধান করে দিলেন—তারা যেন ওকে কোনও কথা বলাবার চেষ্টা না করে।

রাখহরি তারিণীশঙ্কর দুজনেই ছুটে এল ডাক্তারবাবুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলে, "বাঁচবে ত?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মনে হয় বাঁচবে।"

ইন্দ্রাণী আর জয়া—শঙ্করের বিছানার দুপাশে দুজন নীরবে চোখের জল ফেলছে।

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়েছিল তার পায়ের কাছে। জয়া তখনও কিছু জানতে পারেনি। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "অমন করিসনি হতভাগী লোকে দেখলে কী ভাববে?"

ইন্দ্রাণী সেকথার কোনও জবাব দেয়নি।

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় চোখ চেয়ে তাকালে শঙ্কর।

আশায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সকলে।

সুমুখেই ছিল ইন্দ্রাণী। চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করলে, "কষ্ট হচ্ছে?"

শঙ্কর বললে, "না।"

ইন্দ্রাণী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বললে। শঙ্করের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল সে যেন হাসলে একটুখানি।

জয়া এক মুহূর্তের জন্য কাছছাড়া হয়নি। বললে, "বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস তুই। কি বললি?"

আবার কানে কানে কথা! ইন্দ্রাণী জয়াকেও বললে। জয়া তার গায়ে এক ঠেলা মেরে দূরে সরে গেল। বললে, "কিছু আর বাকি রাখলি না তুই।"

শহর থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিভিল সার্জেন। আর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। শঙ্কর তখন ঘুমচ্ছে। ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন তাকে জাগাতে। পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট একবার দেখলেন শুধু। বুলেটটি নিলেন হাতে করে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন বাইরের ঘরে।

তাঁর প্রতীক্ষার আর শেষ হল না।

প্রহরের পর প্রহর চলে গেল। সারারাত কাটল উদগ্রীব উৎকণ্ঠায়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল শঙ্করের। ডাক্তারের কাছে খবর পেয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনার একটা ডিক্লারেশন নিতে এসেছি। কে আপনাকে মেরেছে বলুন।"

শঙ্কর বললে, "আমি নিজে।"

বলেই কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শঙ্কর চোখ বন্ধ করলে। তার পর সে চোখ আর খুলল না।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "শেষ হয়ে গেছে।"

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। বললে, "আমার পরিচয় দিয়ে গেলে না তুমি। বলে যাও আমি কে!"

কার্তিক দাঁড়িয়েছিল, জয়া দাঁড়িয়েছিল। রাখহরি, তারিণীশঙ্কর—সবাই।

কার্তিক বললে, "আমরা সবাই জানি বৌদি, শঙ্করদা বলেছে তোমার পরিচয়। ওঠ।"

ফুলেপাতায় সাজিয়ে শঙ্করের মৃতদেহ নতুন রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছেলেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শবাধার ছেলেদের চোখে জল। আশপাশের সমস্ত গ্রাম ভেঙে লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। দেখতে এসেছে তারা এই জীবনের জয়যাত্রা।

পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে ইন্দ্রাণী আর জয়া।

পাশাপাশি হাতে হাত দিয়ে চলেছে রাখহরি আর তারিণীশঙ্কর।

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট চলেছেন সবার আগে আগে মোটরবাইকে চড়ে। ডানহাতটি তাঁর কপালে তোলা—দুই চোখ ভরে এসেছে জলে। প্রণাম জানাচ্ছেন সেই মহাজীবনকে—যে-জীবন মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এমনি করেই যাত্রা করে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে।

মা কর। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!" হাত থেকে বিনোবাবুর তুলিটা পড়ে গেল। ত্রস্ত কাতর কণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুত কথা ক'টি বলে শেষ করলেন তিনি। যেমনভাবে অসম্বৃতবসনা মেয়ে কারুর সাড়া পেয়ে কাপড়খানা বুকে টেনে দেয়: ঘরের মধ্যে হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে উঠলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমনভাবে দুই হাতে কিছু দিয়ে সে-আগুন লোকে চাপা দেয়, তেমনিভাবে। তেমনি লজ্জার সঙ্গে, তেমনি ভয়ার্ত কাতরতার সঙ্গে। কিন্তু নীরা তেজস্বিনী মেয়ে—জীবনে বিদ্রোহই তার ধর্ম—এ নিয়ে তার অহংকারকে সে সচেতনভাবে উদ্ধত করে রাখে সদাসর্বদা। সে এ-লজ্জাকে চাবুক মেরে বলে উঠল—

—ক্ষমা? আপনার এ নির্লজ্জতা কি ক্ষমা করা যায়? ক্ষমার যোগ্য? আপনি না প্রবীণ: আজই আপনার পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন পালন করেছি আমরা। আপনি চিঠিতেও লিখেছেন। আপনি না সর্বত্যাগী দেশসেবক? আশ্রম করে বসে আছেন? সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন? আপনি না খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী? আজই আমি আপনাকে বরেণ্য ব্যক্তি বলে দশের সম্মুখে স্তুতি করেছি। কি ভেবে-ছিলেন আপনি? আপনার প্রেম-নিবেদন-করা পত্রখানি পেয়ে আমি বিগলিত হয়ে যাব? আমি আপনার প্রেমে পড়েই আছি? আপনার আমি আশ্রিত; আপনার আশ্রমে চাকরী দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন—

—আমাকে তুমি ক্ষমা কর!

—না। ক্ষমা করব না। আপনি নির্লজ্জের চেয়েও আরো বেশী—যার নাম আমি জানি না।

—নীরা!

—না-না। নীরা নয়। আমি নীরজা দেবী। নীরা বলে ডাকবেন না আপনি।

—বেশ! এতক্ষণে একটু বিষণ্ণ অপ্রতিভ হাসি হেসে বিনোবাবু বললেন, কিন্তু একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না, নীরজা? তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি আমার কাছে ছাত্রীর মত পড়েছ, তোমাকে আপনি বলতে পারছি না। কিন্তু এমন অপরাধ কি করেছি আমি?

এবার জ্বলে উঠল নীরা।—কেন? কেন? কেন এ পত্র লিখেছেন আপনি?

—পত্রেই লেখা আছে। তুমি অবিবাহিতা কুমারী—আমি অবিবাহিত, তোমাকে আমি চার বছর ধরে গড়ে তুলেছি। তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। ঘর চাই, সংসার চাই—

কথায় বাধা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল নীরা, আপনি চরিত্রহীন।

—নীরজা!

মহাশ্বেতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—হ্যাঁ। আপনি চরিত্রহীন। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওই বিধবা ভদ্র-মহিলাকে আপনি ভালবাসেন বলে এখানে এনেছেন আমার আগে। ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ও'র মুখ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। লোকে অনুমান করে, আমিও করছিলাম, এ প্রেম পবিত্র প্রেম। বিবাহ যদি করবেন, তবে ও'কে অবহেলা করে আমার কাছে নিবেদন কেন? আমি জানি ও'র বুকের মধ্যে কি ক্ষোভ! ও'কে চিঠিতে কি লিখেছিলেন? আমি দেখেছি চিঠি। ওঃ চরিত্রের সে কি বড়াই! কি নাটুকেপনা!

এবার বাঙ্গের সুরে চিঠির কথা বলে গেল—'আমাদের সম্পর্ক বিবাহের নয়, প্রতিমা: আত্মসম্বরণ করতে হবে, আর আমার জীবন তো জান! বিবাহ তো আমি করব না!' ভদ্রমহিলার চোখের জলে বুক ভাসছিল, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম, চিঠিখানা উনি দেখান নি, আমি দেখে ফেলে-ছিলাম।

এবার মাথা হেঁট করে বিনোবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেজানো দরজাটির আধখানা খুলে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল বিষণ্ণ প্রতিমা। দুটি চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে নেমে আসছিল অবিশ্রান্ত ধারায়। বাইরে অন্ধকার: রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা: বাংলা দেশের একটি মফস্বল শহরের উপকণ্ঠে নির্জন গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে একটি অনাথ-আশ্রম। এরই মধ্যে এখানে রাত্রির নিদ্রালু স্তব্ধতা নেমে আসে। ছেলেরা কিছু ঘুমোয়, কিছু ঢুলতে থাকে, দু চারজন পড়ে। শব্দ হয় রান্না ও খাবার জায়গায়: চাকরেরা পালাপড়া ছেলেদের নিয়ে অ্যালুমিনিয়মের গ্লাস সাজিয়ে যায়, তার শব্দ ওঠে; কেউ তাতে জল ভ'রে দেয়; এরই মধ্যে কখনও ওই নীরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লাইন সোজা কর।

অথবা—

—না—না। তাড়াতাড়ি করো না, তাড়াতাড়ি নয়। দেখছ না জল পড়ছে, ভিজছে বসবার জায়গা! তারপরই হয়তো—

—রমেন, তোমার শরীর বা মন কি আজ খারাপ আছে?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর শোনা যায় না, কিন্তু নীরার কথায় বোঝা যায় যে, ছেলেটি বলেছে, না তো!

নীরার কথা শোনা যায়, তবে মুখে বিরক্তি কেন? কাজ এমন দুমদাম্ করে করছো কেন?

এরই মধ্যে প্রায়ই ছেলেদের বোর্ডিং থেকে উচ্চ চিৎকার আসে, দিদিমণি গো, দুটোতে খুন হবে এবার!

নীরা সঙ্গে সঙ্গে ছোটে টর্চটা হাতে, সেটা তার হাতেই থাকে, বলতে বলতে যায়, বাপরে বাপরে! আর তো পারি নারে বাবা!

নতুন ইলেকট্রিক স্কীমে এখানে ইলেকট্রিক এসেছে অল্পদিন, কিন্তু তা এখন ঘরেই হয়েছে, আশ্রমটার বিস্তৃত পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যে বাইরে কেবল দুটো আলো: তাতে আলো আঁধারিরই সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি ঘটায়। টর্চটা না-হলে চলে না। গিয়ে দেখতে পায়, দুটো ছেলেতে নিঃশব্দে বা সশব্দে সরবে মল্লযুদ্ধ বা মুষ্টিযুদ্ধ লাগিয়েছে। নীরা গিয়েই দুটোকে আলাদা করে দেয়, ছাড়! ছাড়!

কিন্তু সে সহজ নয়, দুটোই দুটোকে ডেঁয়ো পিঁপড়ে কামড় দিয়ে ধরার মত ধরে থাকে। তবু নীরার কথায় ছাড়তে হয়। নীরার প্রভাব ওদের উপর অসাধারণ। ছাড়াবার পরই বিস্ফোরণ, কেন ও আমাকে—। সে ফোঁপাতে থাকে। দুজনেই অনাথ ছেলে—তাদের অভিমান ক্ষোভ সে বিচিত্র। ব্যাপ্তিতে বিশ্বজোড়া, উচ্চতায় বোধ করি আকাশ প্রমাণ। সে কথা নীরা অন্তর দিয়ে জানে। সে উপলব্ধি তার আছে। নিজের জীবনটাই যে তার এই জীবন। পাঁচ বছরে বাপ মরেছে, আট বছরে মা। বাপের লাইফ ইনসিওরের তিন হাজার টাকার মূলধনে, জ্যাঠা-জেঠীর সংসারের এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল। সেও তো এই জীবন। ক্ষোভ বিদ্রোহ যে তার ওই বিশ্বব্যাপী আকাশপ্রমাণ!

আজকের বিস্ফোরণটার মধ্যে সেই বিস্ফোরক ফেটেছে।

বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ হলে, মুহূর্তে আসে মৃত্যুযোগ। কত দেবতার মন্দির, রাজার প্রাসাদ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, দেবতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, রাজার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। সে রেহাই দেয় না কাউকে। নিজের উপর ফাটলে নিজেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডের টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হলেই বা বিনোদ, বিনোদ সেন, সর্বত্যাগী বলে পরিচিত, দেশমান্য, রাষ্ট্রের দরবারে সম্মানিতজন। বিস্ফোরকে তিনি আগুন দিয়েছেন, তার আঘাতে তাঁকে টুকরো টুকরো হতে হবে না?

ছেলেদের খাবার জায়গায় যাবার ঠিক আগেই ব্যাপারটা ঘটেছে। আশ্রমের এক-প্রান্তে বিনোদ সেনের নিজের ঘর। দুখানি ঘর, বারান্দা, একটি স্টুডিও, খানিকটা বাগান। ঠিক মাঝখানে স্কুল, তার পাশে বোর্ডিং, তার পাশে খাবার ঘর, এক লাইনে পাশাপাশি এগুলি, তারই ঠিক পিছনে, বিনোদ সেনের বাড়ি যে দিকে তার বিপরীত দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার। চল্লিশটি অনাথ ছেলে নিয়ে আশ্রম; সঙ্গে ইস্কুল, আগে ছিল—প্রাইমারী—এখন হয়েছে বেসিক, তার সঙ্গে সেকেণ্ডারি স্ট্যাণ্ডার্ডের তিনটি ক্লাস। তার জন্য আছেন দুজন বৃদ্ধ শিক্ষক; তাঁরা থাকেন বিনোদ সেনের বাড়ির লাইনে। এ লাইনে বিনোদ সেনের নিজের বাড়ির পিছনেই আর একটি কোয়ার্টার, তাতে থাকেন বিনোদ সেনের বিধবা বোন আর তার ছেলেরা। তারই একদিকে থাকে এই প্রতিমা। এখানে আশ্রম পত্তন হয়েছে ১৯৫০ সালে। আটটি ছেলে নিয়ে শুরু হয়েছিল আটচল্লিশ সালে। পঞ্চাশ সালে সরকারী সাহায্য পেয়ে যেবার আশ্রমের রূপ নিল, সেইবার নাকি বিনোদ সেন নিয়ে আসেন এই প্রতিমাকে। বিনোদ সেনের কোন বন্ধুর পত্নী, শুধু তাই নয়, বান্ধবীও, প্রিয় বান্ধবী বলেই সবাই জানে। তখনও নীরা আসে নি। সে এসে শুনেছে। তখনকার শিক্ষয়িত্রী একজন, তিনি মুখ টিপে হাসতেন। ছোট ছোট ছেলেদের ভার ছিল প্রতিমার উপর। তারা 'মা' বলত। এখনও ছেলেদের কাছে প্রতিমা 'মা-মণি।'

নীরার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে এসেছে সবাই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আসে নি শুধু সেনের বোন, সে পঙ্গু। তার ছেলেরা কলেজে পড়ে। কলকাতায় থাকে। একটি চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে, সে এই শহরের ইস্কুলে পড়ে, সেও বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। প্রতিমা দরজা আধখানা খুলে, বন্ধ পাটিটা ধরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। পাশের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বা অনুভব করা যাচ্ছে, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় কেউ যেন বলছেন, যাও। যাও। সব আপন আপন জায়গায় যাও। সাঁটে যাও। এই বিহারী, যাও না, খাবার ঘণ্টা দাও। যাও না!

মাথা হেঁট হয়ে গেল বিনো সেনের। প্রতিমার উপস্থিতি তাকে নির্বাক নতশির ক'রে দিল।

নীরা তবু ক্ষান্ত হল না। সে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল, সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, কোন্ মনুষ্যত্বের নিয়মে বা অধিকারে, এ'কে ভালবেসে এখানে নিয়ে এসেও এ'কে বিয়ে করবেন না? আপনি নিজে সেদিন বিধবা বিবাহ সমর্থন ক'রে একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছেন। যারা বিবাহ সত্ত্বেও আবার বিবাহ করে, মেয়েদের ভালবেসে প্রতারণা করে, বলেছেন, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক। এর পর আমাকে ভালবাসেন, আমাকে বিবাহ করতে চান বলে পত্র লিখলেন কি ক'রে আপনি?

প্রতিমা এবার কেঁদে যেন ভেঙে পড়ে গেল। দুই হাতে সেনের পা' জড়িয়ে ধরে সে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠে বললে, আমাকে আগে বললে না কেন? আমি যে বিষ খেতাম।

বিনো সেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

—কি, কথা বলেন না কেন?

বিনো সেন বললেন, আমার মাথায় বজ্রাঘাতই হোক নীরজা!

প্রতিমা আবার কেঁদে উঠল, না-না-না। নীরা বললে, ছি-ছি-ছি, আপনাকে ছি! বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে আবার ফিরে গেল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, কাল সকালেই আমি চলে যাব।

প্রতিমা তখনও কাঁদছে।

সে চলে গেল।

যেতে যেতে শুনতে পেলে বিনো সেনের কণ্ঠস্বর, আপনারা যান এবার। নাটক তো ফুরিয়ে গেছে! যান!

*

নির্লজ্জ কোথাকার।

মানুষ সাধু—মানুষ সর্বত্যাগী। ছদ্মবেশী ভণ্ডের দল! দেহধারী মানুষ, দেহজ কামনার আগুনে তার রোমকূপে-রোমকূপে; ছাই মেখে তার মুখ বন্ধ করে মানুষ সন্ন্যাসী সাজে! এদেশের মোহন্তদের ইতিহাসের কথা সে জানে। ইয়োরোপের সন্ন্যাসীদের ব্যভিচারের কথা সে পড়েছে। সে দেশে বিদ্রোহ হয়, বিপ্লব হয়; এদেশে হয় না। তাই একদিন যারা বিপ্লবী ছিল, তারা আজ অধিকার পেয়ে ভণ্ড ব্যভিচারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদেশের লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শ মাত্রেই যারা নুইয়ে পড়ে বলে, আমার এলায়িত দেহের ভঙ্গিতে আমার উত্তর নাও, মুখে বলতে কি পারি, সে তাদের দলের নয়। সে আদিম বিদ্রোহী।

ঘরের ভিতর বসে সে স্থির দৃপ্ত দৃষ্টিতে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে মনে যেন আউড়ে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে কড়া নড়ল। তিক্ত উষ্মার সঙ্গে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে সে দিকে তাকিয়ে সে বললে, কে?

—আমি দিদিমণি। ডাকছে ঠাকুর নটবর।

—কি চাই?

—ছেলেরা যে খেতে আসবে, ঘণ্টা দিচ্ছে।

—দাও গে। আমি যাব না।

—আজ যে মাছ মাংস মিষ্টি হয়েছে, লুচি আছে। ওরা যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করবে।

আজ বিনো সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছেলেদের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। করেছিল যারা তাদের মধ্যে সেই প্রধান! নিজের আচরণের জন্য অনুতাপ হচ্ছে তার, রূঢ় কণ্ঠে সে বললে, করুক। আমি যাব না। আমি এখানকার কেউ নই। অন্য কাউকে ডাক গিয়ে। নমিতাদি কি কমলাদি, যাকে হোক।

—আজ্ঞে?

—যা বলেছি শুনেছ। ও'রা না আসেন খোদ সেনবাবুকে বল গিয়ে। যাও! যাও! যাও!

সে উঠে গিয়ে দরজা একবার খুলে বললে, যাও বলছি! বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি বন্ধ করে দিলে। এখানকার সংশ্রবে সে আর একদণ্ড থাকতে চায় না। আজ রাত্রেই সে চলে যেতে চায়। হ্যাঁ। আজ রাত্রেই। কাল সকালে নয়।

রাত্রিকাল। দু পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। সামনে দামোদর। দামোদরের উপরে ডি ভি সি'র ব্যারাজে অবশ্য ব্রিজ আছে। ওপারে নতুন ডি-ভি-সি কলোনী। সঙ্গে যে আজ জিনিস অনেক! আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। একবস্ত্রে বিয়ের কনে সাজ খুলে, কপালের চন্দন, চোখের কাজল মুছে বেরিয়ে এসেছিল। বিবাহের রাত্রে। নাটক! নির্লজ্জ সেন বললেন, নাটক শেষ হয়ে গেছে! নাটক! সে নাটক করেছে। হ্যাঁ করেছে। নাটক করে কে? যে নাটক অভিনেতা অভিনেত্রীরা করে, সে তো নকল নাটক। আসল নাটক, জীবননাটক করে তারাই যাদের চরিত্র নিয়ে নাটক হয়। যারা বিদ্রোহী, যারা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; যারা নিজের জীবনে আগুন লাগিয়ে সংসার সমাজে আগুন ধরিয়ে তপ্ত শিকে ছেঁকা দেওয়ার যন্ত্রণার শোধ নেয়। তার জীবন নাটক, সত্যই নাটক। মনে পড়ছে সব ঘটনা। আশ্চর্যভাবে নাটকীয়। নাটকের আকারে সাজালেই হল।

॥ দুই ॥

শান্ত-সাধারণ বাঙালীর সংসারে নাটকের আরম্ভ। তবে পটভূমিকাটা শান্ত সাধারণ নয়। উনিশশো তিরিশ সাল। দেশ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। উনিশশো তিরিশ সালের পঁচিশে মার্চ তার জন্ম। ২৬শে জানুয়ারী বিদ্রোহের ধ্বজা উঠেছে।

এগুলো হয়তো কিছুই নয়। কারণ অনেক মানুষ জন্মেছে সে বছর, যত ছেলে তত মেয়ে, কিন্তু তাদের সবার জীবন তো এমন নয়। তারই জাঠতুতো বোন, তার জন্ম যে-রাত্রে চট্টগ্রামে আর্মারি রেইড হয়—সেই রাত্রে। কিন্তু সে তো সেই ম্যাট্রিক ফেল করে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছে. মার্চেন্ট আপিসের বড়বাবুর ছেলে, সেও চাকরে। একটি ছেলে তার কোলে দেখেহ এসেছে, এ ক'বছরে হয়তো আর গণ্ডা দেড়েক হয়েছে। চব্বিশ•ঘণ্টাই পান খায়, দোক্তা খায়, পুসি বেড়ালের মত আদরিণী নিরীহ। ধমক খেলেই কাঁদে। স্বামীর উপর নজর রাখত। সেই গল্প করে হেসে গড়িয়ে পড়ত। তারই কাছে গল্প করত। মনে আছে একটা গল্প। বলেছিল, জানিস, আপিস থেকে ফিরতে দেরি হলেই জিজ্ঞাসা করি, এত দেরি করলে যে?

বলে, দেরি কোথায়?

বলি, ঘড়ি দেখ, ন'টা বাজে।

বলে, ন'টা? তা হলে ঘড়ি দেখতে ভুল হয়েছে। এই বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করছিলুম আর কি!

কিন্তু মুখ দেখেই আমি ধরি। উঁ-হু বন্ধু নয়। তা রাগাতে তো পারিনে প্রমাণ নইলে। জামায় লম্বা চুল লেগে থাকে, দেখাই: বলে, ও তোমার চুল। একদিন পেলাম মাথার কাঁটা। বললাম, এইবার? একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর, কি চালাক, হি-হি করে হেসে উঠে বললে, তোমার সন্দেহের জন্য রাগাতে নিয়ে এসেছি ওটা।

তা, আমি ছাড়িনি; আমিও কম বাপের বেটী নই। কেঁদে কেটে তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দিলুম। তখন মুখোস খুলল। দাঁত বের করে বলে কি, বেশ করেছি, বাপের পয়সা আছে, নিজে রোজগার করি, তোমার বাপের পয়সায় করিনে।

আমিও বললাম, এত বড় কথা? আমার বাপের কাছে নগদ গুনে তিন হাজার টাকা নাওনি? জানিস, খুব চেঁচিয়ে বলেছিলুম। তখন বলে, আঃ অত চেঁচাও কেন? আমি তখন বুঝতে পেরেছি—এ চেঁচালে ভয় পায়। তখন আরও চেঁচাতে লাগলুম। তখন বলে, জোড়হাত করছি, থাম। আমি বললাম, দিব্যি কর তা হলে, আর যাবে না। তখন দিব্যি করলে। বাপকে খুব ভয় তো। শুধু তো বাপ নয়, আপিসের বড়বাবু। আর খুব কৃপণ। মাইনের টাকা তো হাতে দেয় না। তার উপর বাইরের রোজগারেরও হিসেব নেবে। বলবে, ওই ঠিকেদারের বিলের দরুণ কত নিয়েছিস, ওই পার্টির কণ্ট্রাক্টের দরুণ? হলে হবেকি, বাজার যে যুদ্ধের। দু হাতে রোজগার। ঘুষের টাকার হিসেব আছে, না ধরা যায়? এক একদিন চার পাঁচশো টাকার নোট পকেটে থাকে। তবে একশো দেড়শো, এই নিত্যি। ওদিকে, আপিসে মেয়ে কেরানী, সন্ধ্যার পর তো ধর্মতলায় মেয়েদের মাইফেল। করব কি? ওই করি আর কি! এবার বলেছি, যা করবে করগে যাও বাবু, ছোট নজর করো না, আর বাঁধা পড়ে না। তা পড়বে না। সেদিকে হুঁশিয়ার আছে। আর নজরও ছোট নয়, সে গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি। গায়ে একটা গন্ধ পাই। সেদিন বললাম, কি ব্যাপার কি বলতো? বলে, কি? বল না, কোথায় গিছলে। দিব্যি করে বলছি কিচ্ছু বলব না। গন্ধটা কেমন অচেনা লাগছে, মনে হচ্ছে। বললে, কি? শুনি? বললাম, মেট্রোতে গিয়ে মেমসাহেবদের পাশে বসলে এই রকম গন্ধ পাই। হেসে সারা। বলে, বাপ-রে। তুমি বাবা শার্লক হোমস! ঠিক ধরেছ। পার্ক স্ট্রীট এরিয়ার গন্ধ! বললাম, কত টাকা লাগল? বললে, ঈশ্বরের দিব্যি আমার নট-এ ফার্দিং, একটা পাঞ্জাবী ঠিকেদার, সে নিয়ে গিয়েছিল।

অনর্গল বলে যেত, কৌতুকভরে। জন্মের সময়গুণে যদি কিছু হত, তবে সে তার ওই স্বামীকে খুন করে কোর্টে গিয়ে বলত, আমার পাষণ্ড স্বামীকে আমি খুন করেছি।

সময়টা কিছু নয়। বাপ মায়ের প্রকৃতিতেও বিদ্রোহ বিপ্লব কিছু ছিল না। কারণ বিদ্রোহ বিপ্লবের কোন গল্প• তো শোনেনি নীরা। বরং উল্টোই শুনেছে। বাপ মারা গেছেন তার পাঁচ বছর বয়সে, মা গেছেন তার আট বছরে; তাঁদের কথা কিছু মনে নেই। জেঠীমা বলত, তাকে নয়, নিজের মেয়ে ওই হেনাকে। কোন কারণে হেনা কাঁদতে ধরলে দুর্দান্ত চিৎকার করত; তখন বলত, কেমন রাত্রে জন্ম দেখতে হবে তো! ঠিক নাম দেওয়া হয়েছিল, হানাহানি, তা আবার সভ্য করে করা হল 'হেনা'।

হেনাকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করতে গল্প করত সে কালের। ঠাণ্ডা হয়ে হেনাই জিজ্ঞাসা করত, সে বুঝি খুব মারামারি হানাহানি হয়েছিল?

—বাপ-রে। দেশসুদ্ধ, আমাদের এই গাঁয়েই হৈ চৈ! ছেলের দল চিৎকার করে; তোর বাপ আপিং খায় অনেক দিন থেকে। আপিংয়ের দোকানে যাবার জো নেই। আজ এখানে বোমা, ওখানে পিস্তল; রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উঠে তেড়ে সাহেব খুন। সাহেবরা ভয়ে ঝুড়ি মাথায় দিয়ে টেবিলের তলায় ঢোকে। মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে ঝাণ্ডা ঘোরায়, জেলে যায়। পুলিসে মাথা ফাটায়। আমরা দুই জা মিলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকি। সন্ধ্যে হলে বুক ঢিপ ঢিপ বাড়ে, মানুষ দুটি কখন ফিরবে! আমি ডাকি, ও ছোট বউ! রাত যে বেশ হল! ও বলে, তাই তো ভাবছি দিদি! তোর বাপের রেলের হেড আপিসে কাজ, নীরার বাপের রাইটার্স বিল্ডিংএ। তা হলে কি হবে, গায়ে তো লেখা থাকে না; ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেলে তখন কে কাকে চেনে। পুলিস লাঠি চালিয়ে দিলেই তো হল। সে বাবা বড় দুর্ভাবনার সময় গেছে।

বলতে বলতে হেসে উঠতেন, হেসে নিয়ে বলতেন, দুঃখের মধ্যে হাসি মা; তোর বাপের মাছের লোভ তো দেখেছিস? তোর খুড়োরও কম ছিল না। সে দিন শুনেছেন শেয়ালদায় খুব গোলমাল, লাঠি চার্জ হয়েছে, ট্রাম বন্ধ। তো দু ভাই ঠিক করেছে—দুই ভাই আপিস থেকে ওই সময়টায় বেরিয়ে একসঙ্গে হয়ে আসতেন—: ঠিক করেছে, শ্যামবাজারে এসে, ছোট লাইনে দমদম এসে, হেঁটে আসবেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে শুনেছেন, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ একেবারে অঢেল, খুব সস্তা, টাকায় এই বড় ইলিশটা দেড়সের, দুসের। দু ভাই আর লোভ সামলাতে পারেনি, গেছে, মাছও কিনেছে। এ একটা ও একটা ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে, আর ওদিক থেকে হল্লা। লোক ছুটছে, পালাও, পালাও, পুলিস। এদিক থেকে চিৎপুর ধরে, ওদিক থেকে বাগবাজার ধরে। বাস—দুই ভাই মাছ হাতে নিয়ে দৌড়। একেবারে খালের দিকে। হাতে মাছ, বগলে ছাতা, অন্য হাতে খাবারের কৌটো, আরও কি-কি, বোধ হয় দুজনে দুটো ফুড কিনেছিল। দুজনেই একটু থলথলে মানুষ: শেষ ছাতা ফেলে, ফুড ফেলে, কৌটো ফেলে দৌড়। দুই ভাই হেঁটে বাড়ি ফিরল ট্রাঙ্ক রোড ধরে, রাত্রি তখন দশটা। আমরা তো দুজনে মরে ভূত হয়ে গেছি। তোরা দুটোতে খিদের চাঁচাচ্ছিস। আর ধড়াধ্বড় পিটছি। মর মর! তোদের ফুড কিনতে গিয়েই মানুষ দুটো গেল! শেষে ঝগড়া হয়ে গেল, আমি একটু বেশী মেরেছিলুম তোকে। ককিয়ে গেছিস। ছোট বউ বললে, তুমি কি খেপলে দিদি? এমনি করে মারে? আমি বললুম, বেশ করেছি। নিজের মেয়ে মেরেছি, তোমার কি? সে বললে, খুব করে মার। মেরে ফেল। পুলিসে ধরবে, আমায় সাক্ষী দিতে বলবে, তাই বলছি।

বললুম, দিস না দিস। দেবে তো ফাঁসি, আর করবে কি? সে বললে, তাই যদি হয়, সেটা যদি এতই তুচ্ছ হয়, তবে ওকে না মেরে নিজেই গলায় দড়ি দাও না! আমি বললুম, কি বললি? বাস লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। ঠিক এই সময়ে দুই ভাই এলেন, গায়ের জামায় কাদা, কাপড় ছিঁড়েছে তোর বাপের, জুতোয় বেধে পড়ে গেছেন; হাঁটু ছড়েছে। তোর খুড়োর জুতো গেছে ছিঁড়ে, সে দুটো হাতে নিয়ে ঘর ফিরলেন—কিন্তু মাছ ছাড়েননি! দুজনের হাতে দুই মাছ।

জেঠীমা যত হাসতেন হেনা তত হাসত! সেও হাসত। কিন্তু হেনার মত নয়। এমন করে হেসে গড়িয়ে পড়তে তো পারে না। হাসলে, নিশ্চয়ই জেঠীমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলতেন, ও কি হাসি নীরা? ওই হেনাও তো হাসছে। তোমার যে বেহায়ার মত হাসি! অবশ্য সবটাই ওই নয়, নিশ্চয় তার প্রকৃতিতে কিছু ছিল, কিছু আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেন প্রকৃতিকে আপনার ছাঁচের মধ্যে পুরে তৈরী করতে চায়, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকৃতিও তার শক্তি অনুযায়ী ঠেলে উত্তাপ গলিয়ে ছাঁচকে বদলে অন্য রকম করে দেয়।

থাক সে কথা।

মনে না-পড়ুক, সে জেঠীমা জ্যাঠামশায়ের গল্পের মধ্য থেকে বেশ কল্পনা করে যে, শান্ত পরিবারটিতে অশান্তি ছিল না, বিদ্রোহ ছিল না, বিপ্লব কিছুই ছিল না। সেই উনিশশো তিরিশ সালেও ছিল না। বাবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিনান্সের কেরানী ছিলেন; সেখানে হিসেব কষতেন সারাদিন—ফাইল সারতেন, উপরিওলার সই করাতেন, ডিবে থেকে মধ্যে মধ্যে পান বের করে খেতেন, তার সঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে আরাম করতেন; দেশের স্বাধীনতা কামনা আদৌ ছিল কি না সে বলতে পারে না, কারণ জেঠীমা বলেন, দুই ভাইই যেদিন কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরতেন, সেদিন ঘরে বসে নেতাদের কটু কথা বলতেন। স্বাধীনতা-কামনা থাকলেও নিতান্ত সভয়ে মনের চোরকুঠরীতে এক কোণে নিষ্ঠুর পাওনা-দারের ভয়ে দেনদারের মত ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে লুকিয়ে থাকত।

যেদিন কষ্ট পেতেন না, সেদিন সকৌতুকে দুই পক্ষেরই ভীরু কর্মের গল্প করে উপভোগ করতেন।—বুঝেছ না। পুলিস তাড়া মেরেছে, আর সব চোঁ-চা দৌড়। সে কি দৌড়। একজনের কাছা খুলে গেছে তো তাই নিয়েই দৌড়ুচ্ছে। বাপরে বাপরে! আবার বলতেন সায়েববেটার ঘরে ঢুকেছি, একটু বেশী শব্দ হয়েছে দরজায়, বাস, বেটা চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করেছে, হু আর ইউ। আর্দালী, আর্দালী। সে কাঁপছে প্রায়। আমি বললাম, এক্সকিউজ মি সার। ক্যারিয়িং শো মেনি ফাইলস আই হ্যাড টু পুস দি ডোর উইথ মাই হেড। তার পর হয়তো বলতেন, ওদের আর হয়ে এসেছে। খট শব্দ শুনে যারা চমকে ওঠে প্রাণপক্ষী খাঁচার গায়ে ঝট-পটিয়ে মাথা ঠোকে, তাদের পালা খতম।

হয়তো এর পর তাকে নিয়ে আদর করতেন, নীরা হীরা জিরা ধীরা মীরা টিরা—। এমনি অর্থহীন শব্দের সমাবেশ। কিন্তু তার মধ্যে ছিল পরমাশ্চর্য মধু। হয়তো বলতেন—যা অর্থহীন নয়—নীরা হীরা মণি মানিক! নীরাকে আমি ইস্কুলে পড়াব, গান শেখাব,—

মা বলতেন, নাচও শিখিয়ো বাপু! আজকাল আবার ভাল করে নাচ জানার রেওয়াজ হয়েছে।

বাপ বলতেন, নিশ্চয় শেখাব। কুড়ি বছরের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না। ইন-সিওরটা কুড়ি বছরে ম্যাচিওর করবে।

মা বলতেন, তিন হাজারে ভাল ঘরে বিয়ে হবে ভাবছ?

—না হলে করব কি? আরও তো ছেলে-মেয়ে হবে। তাদেরও তো দায় আছে।

—তবে তোমার মাইনে বাড়বে।

—তা বাড়বে। প্রমোশন হবে। জান এবার সায়েব সার্ভিস বুকে খুব ভাল নোট দিয়েছে।

—তোমরা দুই ভাই নাকি জমি বেচছ?

—হ্যাঁ ভাল দর পাচ্ছি। নার্সারিওয়ালারা নেবে।

—টাকাটা যেন খরচ করে দিয়ো না।

—বাড়িটা মেরামত করাব। আর বাকীটা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনব।

—একটা কথা বলব?

—বল না, এত সঙ্কোচ কেন?

—নীরাকে একটা প্যারাম্বুলেটর কিনে দেবে?

—তা না হয় দিলাম। ঠেলবে কে?

—একটা ঝি রাখব। হেনার জন্যে একটা কিনেছেন বটঠাকুর, ও যা করে চড়বার জন্যে!

—দাদার মাইনে কত জান? আমার ডবল! আমার পঁচাশী টাকা, দাদার একশো ষাট টাকা।

—তা হোক। সে বাচ্চারা বোঝে না।

—বাচ্চার মা-রাও বোঝে না!

—বেশ বাপু দেবে না, দিয়ো না। এত কথা কেন? বাচ্চার মা নিজের জন্যে কোন দিন কিছু বলে? ওই তো দিদির গলার হার ভেঙে হার হল, আমি বলেছি তোমাকে আমারটাও হোক! দুই ভাইএর বিয়েতে তো টাকা একই নিয়েছ। বাবাকে বাজারদর দেখানো হয়েছিল। এবং বলা হয়েছিল—ছেলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে। বড় ছেলে রেলের চাকরে, পেনসন নেই। এর পেনসন আছে।

—বাপরে বাপ। বাচ্চার মা কথা বলে না বলে কম কথা বললে না।

—যাক আর বলব না। তবে কাল ওর দুটো ভাল জামা না-হলেই হবে না। ঝিটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে আর এক টাকা বেশী দিলে বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনবে; সে আমি ওই রদ্দি জামা পরিয়ে পাঠাব না।

পরের দিনই তার বাপ শুধু ভাল ফ্রকই আনেন নি, একটা সস্তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ঠেলাগাড়িও এনেছিলেন। একটা ব্ল্যাক জাপানও এনেছিলেন। নিজেই রঙ দিয়ে নতুনের খোলস পরাতে চেয়েছিলেন।

ছেলে বয়সে তার দুঃখ খুব ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহের কারণ ঘটেনি। সে ছিল বোধ হয় প্রকৃতিতে।

•

বাবা মারা গেলেন। মনে নেই। শুধু মনে আছে শবযাত্রাটা। একটা খাটিয়া, তাতে একটা মানুষ শোয়ানো। লোকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। তাও খুব অস্পষ্ট। কাঁধে তোলার সময়কার একটা একটুকরো ছবি

মাত্র। হয়তো মনের মধ্যে তার দরুণ সুগভীরে একটি বিন্দুর মত একটি ক্ষত আছে যার বেদনা সর্বক্ষণ নয়; যার বেদনা অকস্মাৎ কোন শবযাত্রা দেখলে মনের মধ্যে খচ করে বেজে ওঠে। কোন ছোট পিতৃহীন ছেলে বা মেয়েকে দেখলে তার স্বাভাবিক সচেতন বেদনার সঙ্গে ওই অবচেতনের বেদনাটি সংযুক্ত হয়ে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

মায়ের মৃত্যু তার জীবননাটকে প্রথম অঙ্কে শেষ দৃশ্যের দিকে আকস্মিক মোড় ফেরার মুহূর্ত। দু বছর কয়েক মাস ধরে একটি দৃশ্য। দৃশ্যের আরম্ভ বাবার মৃত্যুতে। শেষ মায়ের মৃত্যুতে। নির্মম পরিহাসের দৃশ্য তার পক্ষে। কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। বুঝবার বয়স হয়নি। বড় নির্মম নাট্যকারের রচনা। মায়ের হাতে টাকা এল। অনেক টাকা একসঙ্গে। এর মধ্যে মায়ের দুবার দুটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। দুটি ভাই হয়েছিল নীরার। ভাই দুটি মারা যাওয়ার অপরাধ কার. তা জানে না নীরা। বলতে পারবে না কোন্ ব্যাধি তার কারণ। তবে মা এর একটা দায় চাপিয়েছিলেন তার ওপর। বলতেন, ওর কোলের দোষ পিঠের দোষ। একা ভোগার অধিকার নিয়ে এসেছেন। শুনেছে বাবা না কি তাকে ঘিরে রাখতেন। না, বলো না, ওর কষ্ট হয়। বাচ্চা মেয়ে।

—বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যে যে রাক্ষসী।

—তোমার ভাগ্য নয়?

তারপর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় পরিবর্তন। মা তাকে অগাধ স্নেহ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হাতে টাকা অনেক। লাইফ ইনসিওরের টাকা। জমি বিক্রী করা টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট। সবসুদ্ধ বোধহয় হাজার ছয়েক। তা ছাড়াও যে জমিটুকু ছিল তাও বিক্রী করলেন। কে দেখবে? কে আদায় করবে ফসলের ভাগ? ভাসুর সব ঠকিয়ে পেটে পুরবেন না কে বললে? নীরাকে সাজাতে লাগলেন। খেলনা কিনে দিলেন। ডবল বেণী বেঁধে ইস্কুলে পাঠাতে লাগলেন। মাইল দুয়েক দূরে দমদমে ছিল মিশনারীদের ইস্কুল, সেখানে। মাইনে ছিল বেশী। হেনাকে জ্যাঠামশায় দেশী ইস্কুলে দিয়েছিলেন। হেনার বুদ্ধিও ছিল তার বেড়ালের মত নরম মোটা শরীরের মত। মেমসাহেব দেখে ভয়ও করত; তবুও আমার সেজেগুজে স্কুলের গাড়িতে যাওয়া দেখে প্রথম প্রথম কাঁদত। জেঠীমা মেয়েকে তিরস্কার করতেন, কখনও প্রহার করতেন, আর বলতেন, তোর তো এখনও বাপ মরেনি যে, তুই মেমসাহেব বনবি। আর মরলেই বা কি, ভাই যে এক গণ্ডা। তোর আগে দুটো, পরে দুটো।

আশ্চর্য, বাপকে মনে নেই, মায়ের মুখও ঝাপসা হয়ে গেছে; কিন্তু এই কথাগুলো

তার মনে আছে। তাই জীবনে অনাথ আশ্রমে এসে ছেলেদের কখনও কটু কথা বলেনি। বলে না সে কাউকেই। মধ্যে মধ্যে এখানে তার সহকর্মিণীরা কতদিন কঠোর হতে বলেছে, বলেছে, শাসন কর একটু, আমরা শাসন করি আর তুমি ওদের এমন নাই দাও যে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

সে তাতে হেসেছে। বলেছে, দিদি, খাদ্যের মধ্যে সেরা মিষ্টি নুন, আর দুনিয়ার সেরা মিষ্টি মধু নয়, মিষ্টি কথা! কটু কথা বলতে নেই, ও আমি পারিনে। বেশ তো শাসন তোমরা করো, ওটার ভার তোমাদের।

আজ সে কি করে এমন নির্মমভাবে কথাগুলো বলেছে, বলতে পারে না। না, পারে। মানুষের শুধু প্রাণই সব নয়, তার মান আছে। প্রাণের চেয়ে মান বড়। দুনিয়ার যে-সব ক্ষমতামত্ত প্রতিষ্ঠাবানেরা মানুষের অসম্মান করে, তাদের ক্ষমা সে করতে পারে না। না, পারে না। ক্ষমা করতে না-পারার জন্যেই সে আজ এই নীরা হয়েছে। নইলে—

থাক, আবার ঘুরে সেই আজকের কথায় এসেছে।

নাটকের দৃশ্যে পরম্পরা ভঙ্গ হচ্ছে। স্মৃতির প্রম্‌টার, স্মারক বলছে, ভুল বলছ। ও সব পরের পার্ট। বল, শোন, শুনে বল—।

জেঠীমার কথা শুনে মা বলতেন, কি বলছ দিদি? ছি!

জেঠীমা জ্বলে উঠে বলতেন, ছি কিসের? ছি! সত্যি বলছি। আর বলছি আমার মেয়েকে।

মা বলতেন, না, বলা হচ্ছে আমার মেয়েকে।

—না-না-না। বলিনি। তুমি বললেই হল? গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও? জেঠী তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠতেন।

মা দৃঢ়স্বরে বলতেন, ভাল, বটঠাকুর আসুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বলেন শুনি! না-হয় প্রতিবেশীদের বলব। তাতে প্রতিকার না-হয়, সব বেচেছি, বাড়ি বেচেও উঠে যাব।

মা জানতেন ওটি ব্রহ্মাস্ত্র। কারণ প্রতিবেশী কুন্ডুরা তখন ও অঞ্চলে রাহুর গ্রাস এবং শক্তি নিয়ে উঠেছেন। যত হাঁ—তত হজমশক্তি। জ্যাঠামশাই ওখানে টুক্‌টাক্ করে রেলের আপিসের পয়সায় একটি উপরাহু, কিংবা বাঘের পিছনে ফেউ নয়, নেকড়ে হয়ে উঠেছেন। মায়ের কাছে অবশিষ্ট ধানী জমি জ্যাঠামশায়ের মুখ থেকে তিনিই কেড়ে নিয়েছেন। বাড়িটির উপর খুব নজর। ওটি পেলে তাঁর বাড়ির কম্পাউন্ড প্রায় চৌকোশ হয়—অর্থাৎ বাদ থাকে শুধু জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। সুতরাং বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাব বললেই চমকে উঠতেন ও'রা। ভয় পেতেন।

চুপ করে যেতেন জেঠাইমা। জ্যাঠামশায় এসে বলতেন, তুমি বাড়ি বেচবে কেন বউমা। আমরাই বরং যাব। তুমি বেচলে আমাদের দেবে না, আমি কিন্তু তোমাদেরই দিতে চাই। নিয়ে নাও।

মা তাতে ভয় পেতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, জ্যাঠামশাই কখনও বেচতে পারবেন না। ছলনা যখন নকল নাটুকে হয়, তখন তাতে কেউ ভয় পায় না। এমন কি বিপরীত পক্ষ যে ভয়-পাওয়ার অভিনয় করে সেও না। দর্শকও না। জ্যাঠামশায়ের ছলনা একেবারে থিয়েটারী ছলনা হত। মা বলতেন, সে আপনার ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে আপনি বেচে দিয়ে সুখের জন্যে তো কলকাতায় যেতে পারেন। আমার তা নয়। আমার মেয়েকে আমি ভাল করে মানুষ করব, পড়াব, যাতে ভাল পাত্রে পড়ে বা বিয়ে না-হলে মাস্টারীটাস্টারী করেও খেতে পারে। আর বুদ্ধি ওর ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। ওকে এমন করে বলা আমার সহ্য হবে না। আমার তো মায়ের প্রাণ।

জেঠী-মা আর থাকতে পারতেন না—ফোঁস করে উঠতেন এবার, আর আমার রাক্ষসীর প্রাণ, না?

জ্যাঠামশায় এবার ধমক দিতেন, কি হচ্ছে কি? কি বলছ এ সব?

মা বলতেন, ওই শুনুন না।

জ্যাঠামশায় বলতেন, তুমি বড়। তোমাকে সহ্য করতে হবে।

নীরা কৌতুক অনুভব করত। ছবিগুলো ফটোগ্রাফ নয়, পাকা রঙে তুলিতে আঁকা ছবির মত আঁকা হয়ে গেছে। হয়তো বা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আঁকা ছবির যেটা তফাৎ, কালোর জায়গাটা ঘন কালো, আলোর জায়গাটা আর্টপেপারের মসৃণ অমলধবল শুভ্রতায় শুভ্র। কিন্তু বিষয়টা সত্য।

নীরা এর পর সোচ্চারে গভীর মনোযোগ সহকারে ইংরেজী পড়ত। ও ইস্কুলে প্রথম থেকেই ইংরেজী উচ্চারণ পর্যন্ত মেমসাহেবদের অনুকরণে আশ্চর্য রকমে সম্ভ্রান্ত।

Tell the man to come to me.

ও উচ্চারণ করত, "টেল দ্য ম্যান টু কম টু মি।" মানে—ও মনুষ্যটিকে বল আমার

টোপ

শিল্পীঃ শ্রীরণেন আয়ন দত্ত

কাছে আসিতে। উসকো বোলো মেরি পাশ আনেকো লিয়ে।

মা ওই কথাটা মিথ্যে বলেন নি; নীরার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল এবং ওই ইস্কুলের পড়ানোর গুণে পড়তেও ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে শিখেছিল আর একটা জিনিস। সেটা সাজপোশাক, পরিচ্ছন্নতা। বছর দুই যেতে-না-যেতে মায়ের মৃত্যুর ঠিক আগেটায় আর সে মায়ের সাজিয়ে দেওয়া নিত না। নিজেই সাজত। বলত, না। তুমি বড় লাউড করে দাও।

আশ্চর্য হয়ে মা বলতেন, - কি? কি করে দি?

—লাউড! লাউড মানে উচ্চ। মানে চড়া সাজ করে দাও।

মা গৌরবে হেসে সারা হতেন, ওরে বাপরে!

মা বেঁচে থাকতেই সে ওই ইস্কুলের তিন বছরের কোর্স শেষ করে সেকালের ইউ-পি পরীক্ষার মাসে তিন টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। হেনা সেবার ফেল করেছিল।

এরপর মেমসাহেব নিজে এসে মাকে বলেছিলেন, আপনার কন্যাকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া ডিবেন। উহার বিড্যা হইবে। বলেন টো আমি কোন মিশনের স্কুলে বলিয়া ডেখি। টাহারা ফ্রি করিয়া ডিবে। আমি বলিব। হাঁ। আমি বলিব।

মা আর ততটা সাহস করেননি। তিনি ওখানকার গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারা সমাদরের সঙ্গে তাকে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইস্কুলে এবং পাড়ায় নাম রটেছিল 'ব্রিলিয়াণ্ট গার্ল'।' কেউ কেউ বলতেন, হারাণ মুখুজ্জের মেয়েটি যদি মেয়ে না-হয়ে ছেলে হত!

মা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতেন, ওই আমার ছেলে। ছেলের চেয়েও বড়। ঠিক একদিন এমনি করে আদর করতে গিয়েই তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একি হল? বুকে যে—। তারপরই আঁ-আঁ শব্দ করে গড়িয়ে পড়লেন।

নীরা মা—মা বলে ডাকতে ডাকতে চিৎকার করে ডাকলে, মা গো! কি হল? মা—মা—মা!

তার চিৎকারেই জেঠীমা ওপাশ থেকে ডেকে বলেছিলেন, আরে এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? মা কি মরেছে?

—জানি না। কি হল দেখ! জেঠীমাগো!

জেঠী-মা এসে দেখে 'সর সর' বলে পাশে বসে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়ে, নেড়ে চেড়ে দেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—খেলে মা, মাকেও খেলে? ভাই খেয়ে ক্ষিদে মিটল না, বাপ খেয়ে মিটল না, শেষ মা—তাও খেলে?

নীরা বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত করে জেঠীমার দিকে তাকিয়েছিল। সে খেয়েছে মাকে? সে?

দৃশ্যটা শেষ হল। নাটক নয়? মায়ের অনাদরে দৃশ্যের আরম্ভ, বাপের মৃত্যুতে আকস্মিক পরিবর্তনে আশ্চর্য সমাদর, তার পরই হঠাৎ হার্টফেল করে মায়ের মৃত্যু এবং অন্তে জেঠীমার নিষ্ঠুর কঠিন নির্মম তিরস্কার—'মাকেও খেলে মা?'

যদি কেউ তার জীবন নিয়ে নাটক লেখে এবং বেশী নাটকীয় করতে ইচ্ছে করে তবে সে যেন যোগ করে দেয়—নীরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠেছিল—না-না-না-। আমি খাইনি, আমি খাইনি। তারপর আছড়ে পড়েছিল মায়ের বুকের উপর—মা-মা-মা।

॥ তিন ॥

আবার যবনিকা উঠলো।

সেটা নীরার জীবনে যবনিকা ওঠাই বটে।

মৃত্যুকে সে এমন করে দেখেনি। বয়সই বা কত, যে দেখবে। আট বছর। জীবনে তখন স্মৃতি সক্ষম হয়নি; শক্ত হয়নি; জীবনের জলময় সৃষ্টি থেকে তখনও স্মৃতির পৃথিবী তরল পলিমাটির মত সদ্য জাগছিল। বাপের মৃত্যুর স্মৃতির মধ্যে বাপ নেই, ভারী মানুষটা সে তরল পলির চোরাবালির মধ্যে কোথায় ডুবে গেছে। খুঁড়লে হয়তো একটা নরকঙ্কাল বা তার ছাপওয়ালা মাটি বেরুতে পারে; থাকবার মধ্যে আছে চওড়া হাল্কা খাটিয়াটার দাগ। কিন্তু আট বছর বয়সে তার চোখের উপর, তার প্রায় কোলের উপর মায়ের এই মৃত্যু তার শক্ত-হয়ে-আসা স্মৃতির পৃথিবীতে প্রথম নিষ্ঠুর আঘাত। সে যেন হত-চেতন হয়ে গেল। তাকেই মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। শ্রাদ্ধও করেছিল। সে সব আঘাতে সে কোন প্রতিঘাত দিতে পারেনি। শুধু দুর্বোধ্য বা অবোধ একটা অনিশ্চিতের ভয়ে শুধু কেঁদেই ছিল ক'দিন ধরে। শুধু একটা কথা মনে আছে। সেটা এই বিরতির মধ্যে

গ্রীনরুমে দ্বিতীয় অঙ্কের নাট্যপরিচালকের কঠিন নির্দেশ বলতে পার। শ্মশান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, আজ আর খেতে নেই কিছু। বিছানায় শুতে নেই। ওই কম্বলে শুয়ে পড়।

পরদিন সকালেই বলেছিলেন, ওগো মেম সায়েব, সকালে উঠেই তো চুল আঁচড়াও, মুখে হয়তো পাউডারও দাও। সে সব যেন করো না। করতে নেই।

সে নিশ্চয়ই সে সব করত না। শোকের একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য আছে, সুখের কথা সজ্জার কথা মনে থাকে না। কিন্তু জেঠীমা যেন পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমার মেক-আপ সব পাল্টাও। সর্বদা মনে রাখবে, তুমি দুঃখিনী।

যবনিকা উঠল—শ্রাদ্ধবাসরে? না, তারও পরে।

বারো চোদ্দ দিনেই রপ্ত হয়ে গেছে তখন মেক-আপ। মুখে তখন একটা ছাপ পড়ে গেছে ক্লিষ্ট মালিন্যের; না, ছোপ ধরে গেছে।

এখানেই শুরু হোক নতুন দৃশ্যের। সেদিন রবিবার, সকাল তখন ন'টা সাড়ে ন'টা। আমার ডাক পড়লো। বাইরে জেঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। আর এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

দরজার কড়া নড়ছে।

নীরার মনের মধ্যে জীবননাট্যের মানস-অভিনয়ে ছন্দ কাটল। ১৯৩৮ সাল থেকে এসে পড়ল ১৯৫৬ সালে। বিনো সেনকে নিষ্ঠুর আঘাতে বিপর্যস্ত করে বিজয়িনী হয়ে সে তৃতীয় অঙ্কে প্রবেশ করবে। বিরতির মধ্যে গ্রীনরুমে বসে ভাবছে, প্রথম অঙ্কের দৃশ্যগুলোর কথা। কে এসে তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে, ডাকছে। তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবে নাকি? কে ডাকছে? অনুতপ্ত বিনো সেন? বিখ্যাত প্রখ্যাত বিনো সেন নতশির হয়ে কি বলতে এসেছেন? অভিনয় চড়া হয়ে গেছে?

—নীরা! নীরা!

না, বিনো সেন নয়, অণিমাদি।

—নীরা!

—কি বলছেন? এখন মাফ করবেন আমাকে।

—তোমার খাবার এনেছি ভাই। খাবারটা নাও। খাও।

—মাফ করবেন আমাকে। এখানকার অন্ন আমার মুখে রুচবে না।

—ভাল। দরজা খোল। না খুললে, আমি যাব না এখান থেকে। কড়া নাড়ব, ডাকব।

—না, নাড়বেন না। ডাকবেন না।

—ডাকব। নাড়ব কড়া। আমি তোমাকে পত্র লিখিনি। আমাকে বলবে তুমি?

কি আপদ! দরজা খুলে সে পথ আগলে দাঁড়াল।

অণিমাদি'র বয়স হয়েছে। দু চারগাছা চুলও সাদা হয়েছে। তা তিনি সযত্নে ঢাকা দিয়ে রাখেন। বেশ একটু মোটাসোটা। তিনি প্রায় ঠেলে ঢুকলেন ঘরে। বললেন, ও মা! আমি ভাবছি, তুমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছ! এ যে সব যেমনকার তেমনি। বসে বসে কাঁদছিলে নাকি?

—কাঁদতে আমি জানিনে অণিমাদি জীবনে আট বছর বয়সে কান্না শেষ করেছি মরা মায়ের বুকের উপর পড়ে। তারপর আর কাঁদিনি।

হাসলে নীরা।

খাবারের থালাটা রেখে অণিমাদি বললেন, তাই তুমি এমন নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত লোকের সামনে এত বড় মানুষটাকে এমন করে বলতে পারলে। আমরা হলে পারতাম না।

—তার যোগ্যতা নেই আপনার।

—তা হবে। তবে—। একটু হাসলেন অণিমাদি।

—কি? অনুতাপ করতে হবে? নীরাও ব্যঙ্গভরে হাসল।

—অনুতাপ টনুতাপ বুঝিনে ভাই। তুমি বি-এ পাস করেছ, তাও আবার ডিস্টিংশনে। আমরা সে হিসেবে মুখ্যু মানুষ। আমি বুঝি কি জান? বুঝি, যে জীবনে কাঁদেনি, তাকে একদিন কাঁদতে হবেই।

—না। কঠিনভাবে ঘাড় নাড়লে নীরা।

—আচ্ছা। আমি চললাম। ইচ্ছে হয় খেয়ো না-হয় খেয়ো না। দিয়ে গেলাম।

চলে গেল অণিমাদি।

নীরা তখনও ঘাড় নাড়ছিল।—না।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় তার প্রতিবিম্ব ঘাড় নাড়ছে, না। মৃদুস্বরে সে বললে, সব কথা সব মানুষকে খাটে না অণিমাদি। আমি কাঁদিনি সেই দিন থেকে, কাঁদব না।

*

তোলো, জীবননাট্যের প্রথম বিরতির পর দৃশ্যপট তোলো। দেখ চরিত্র বিচার করে, সে কাঁদবে কি না। দৃশ্যপট বদল হয়েছে তখন। তাদের এবং জ্যাঠামশায়ের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিলটা ছিল সেটা ভাঙা হয়েছে। যেটা তাদের শোবার ঘর ছিল, রাস্তার দিকে, সেটা তখন বসবার ঘর হয়েছে। ছোটখাটো অনেক বদল। নীরাকে শুতে হয় হেনার সঙ্গে।

ডাক এল, সেই ঘরে জ্যাঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

নীরাকে জেঠীমা বললেন, একটা ফরসা ফ্রক পরে যাও বাবু। বললে, এর মধ্যে ঘুঁটে-কুড়ুনী করে তুলেছি।

ফ্রক পালটে, নীরা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী চুলে চিরুনি দিয়ে মুখে পাউডার বুলোবার জন্যে কৌটোটা খুলেছে, ওটা তার ওই মিশন ইস্কুলের শিক্ষা। হেনা বলে উঠেছিল, ও মা! তুই পাউডার মাখছিস? তোর না মা মরেছে?

হাতখানা আর নড়েনি। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর বলেছিল, কেন? এখন তো আবার মাছ খাচ্ছি, বিছানায় শুচ্ছি। জেঠীমা বললেন, পরিষ্কার হয়ে যেতে।

বলেই সে তার মনের পঙ্গুতা কাটিয়ে মুখে পাফটা বুলিয়ে নিয়েছিল।

জেঠীমা বারান্দাতেই ছিলেন; সব শুনেও ছিলেন; বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই তিনি বলেছিলেন, একটু গন্ধ মাখলিনে? একটু সেণ্ট? তোর তো আছে।

একটা তীক্ষ্মমুখ মোটা সূচ যেন তার বুকে বিঁধে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে, সে নিশ্চয় কাঁদত বা সভয়ে মুখের পাউডার মুছে ফেলত। কিন্তু সে কোনটাই করেনি। ভুরু কুঁচকে, বাল্যের মসৃণ ললাটে, সূক্ষ্ম তিক্ত রূক্ষ রেখা জেগে উঠেছিল।

অণিমাদি ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দুঃখকে যারা জয় করে, তারা কাঁদে না। ওই লড়াইয়ে কাঁদতে মানা গো। কাঁদলেই হারলে। তোমার চোখের জলেই তোমার পায়ের মাটি পিছল করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে। নীরা কখনও কাঁদবে না। জীবননাট্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রথম অঙ্ক তো তুমি জান না, জানলে ও কথা বলতে না। থাক।

নতুন ড্রয়িংরুম, হ্যাঁ, জ্যাঠামশায় তাদের শোবার ঘরখানাকে ড্রইংরুমই বলতে শুরু করেছেন তখন; ঘরে ঢুকতেই জ্যাঠামশায় বললেন, কাল থেকে তুমি ইস্কুলে যাবে, বুঝেছ। হেডমাস্টারমশায় নিজে এসেছেন।

নীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাগর চোখ দুটিতে তার বিভ্রান্তি এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

হেডমাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? বস!

সে বসল। জেঠামশায় বললেন, কি রে, তোকে আমরা ইস্কুলে যেতে বারণ করেছি?

তা তো মনে পড়ল না নীরার। সে ঘাড় নাড়লে, না।

কুন্ডুবাবু বললেন, তবে ইস্কুল যাচ্ছ না কেন?

চুপ করে বসে রইল নীরা। ভুরু দুটো আবার কুঁচকে উঠল। হেনা ইস্কুলে যায়, দশটায় জেঠীমা তাগিদ দেন, হেনা! দশটা বাজে যে। কই তাঁকে তো বলেন না। আর মা মরেছে, তাকে যেতে আছে?

হেডমাস্টার বললেন, ইস্কুলে যাবে কাল থেকে। আমরা আশা করি, তুমি ভালভাবে পাশ করবে। স্কলারশিপ পাবে। ইচ্ছে হলে আই-এ, বি-এ, এম-এ পড়বে। পাস করবে। কত মেয়ে করছে। চাকরী করছে। বুঝলে না?

নীরা বললে, আমাকে ইস্কুলে যেতে আছে? আমার মা মরেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়। অশৌচ চলে গেছে, আবার কি? কাল থেকেই যাবে তুমি, এই তো হেনা যায়। ওর ইস্কুল তো আমাদেরই প্রাইমারি সেকশন। একসঙ্গে যাবে।

নীরা বলে ফেললে, জেঠাইমা বকবেন না?

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, না-না। কেন বকবেন?

—উনি তো বকেন। সব তাতেই বকেন।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখোশ এবার খুলেছিল, বললেন, না, সব তাতেই বকেন না। অন্যায় করলেই বকেন এবং বকবেন। তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে গেছে আদর দিয়ে। যাক, ইস্কুলে যাবে তুমি, তাতে তিনি কখনই বকবেন না।

—ছি-ছি-ছি পরাণবাবু। ছি! বলে উঠলেন কুন্ডুবাবু।

জ্যাঠামশাই নীরাকে ধমক দিলেন, যাও তুমি, ভিতরে যাও। যাও। কাল থেকে ইস্কুলে যাবে, যাও।

নীরা চলে গেল ভেতরে, শীতল শান্ত কঠিন তার পদক্ষেপ, বড় বড় চোখে বন্য অর্থাৎ ভীত সতর্ক অথচ হিংস্র দৃষ্টি।

বাইরে জ্যাঠামশায় ফেটে পড়লেন এবার, কুণ্ডুমশাই, আমি প্রটেস্ট করছি, আপনি ধনী বলে, আমার ঘরে নাক গলাতে আসবেন না। সে আমি কখনও সহ্য করব না। নেভার।

—একশোবার করব। শুনুন পরাণবাবু, হারাণের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব ছিল—

—ছিল, খাদ্য আর খাদকের।

—সে জানা আছে। ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর লোভের কথা হারাণ জানত। সে যখন আমাকে প্রথম জমি বিক্রী করে, তখন সে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। আমার সে দলিল আছে।

—কুণ্ডুমশাই!

—শুনুন পরাণবাবু, হারাণের মেয়েকে ফাঁকি দিতে চাইলে তা পারবেন না। আমি সব হিসেব জানি, রাখছি। আমি দরখাস্ত করব পুলিশ কমিশনারের কাছে। জজ সাহেবের কাছে।

—করবেন।

এদিকে বাড়িতে জেঠীমা, হেনা, হেনার দুই বড় ভাই, হিংস্র কিন্তু স্তব্ধ নেকড়ের মত তাকিয়েছিল নীরার দিকে। বাইরে কুণ্ডু তখনও চীৎকার করছে। সে বাঘ।

নীরা সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে বারান্দার একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এইখানেই শেষ নয়। জীবন যেখানে দুর্ধর্ষ, সেখানে সে সংগ্রাম করে সরবে। যেখানে উত্তাপ বেশী সেখানে অল্পখানিকটা ধোঁয়ার ইঙ্গিতেই শেষ নয়; সেখানে জীবন টগবগ করে ফোটে।

এ-দৃশ্যের শেষ হল পরের দিন সকালে। সারাদিন কেউ নীরার সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। জ্যাঠামশায়ের কড়া হুকুম জারি হল, খবরদার, এই ভাবে চুনকালি আমার মুখে মাখিয়ো না।

জেঠীমা বলেছিলেন, মাখালাম আমরা, না, মাখালে তোমার ভাইঝি।

জ্যাঠামশায়ের কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। হাজার পাঁচ কি চার টাকা এবং বসত বাড়ি ও তার সংলগ্ন ভাগের জমিটা সে-জ্ঞানটাকে অহরহ বাজনা শুনিয়ে হিসেব দেখিয়ে জাগ্রত রেখেছে। তিনি বললেন, তার শাস্তি দেব না ভেবেছ? দেব। তার সময় আছে।

নীরা ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়েছিল। এতগুলি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সে একা, ঘরের কোণের বন্দী, বেড়ালের মত নখ যেন ঈষৎ বের করে দাঁড়িয়েছিল। চোখের পলক পড়ছিল না তার। রাত্রে ঘরে শুয়ে জেগেই ছিল, ঘুম আসেনি। আজ যেন তার অবস্থাটা সে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলে। মাতৃবিয়োগের সকাতর অসহায়তাটুকুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে তখন হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই যে উঠল বিদ্রোহের হিংস্রতায় উগ্র হয়ে তা আর তার গেল না। রাত্রে জেগে ছিল, ঘুম আসেনি; মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই সে এটুকু বুঝেছিল যে, ওরা সম্পর্কে নামে আপন হলেও ওরা আপন নয়, ওরা পর; মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আজকের ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত তার ওই ধারণাটাই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এসেছিল। এই ঘটনার পর বাড়ি ঢুকেই ওদের চোখেমুখে কঠিন আক্রোশ এবং হিংসা দেখে সে বুঝেছে এরা শুধু পর নয়, এরা তার শত্রু। পরের কাছে হয় সঙ্কোচ। শত্রুর কাছে হয় পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়, নয় দাঁত নখ বা যে অস্ত্রই তার থাকে, তাই উদ্যত করে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয়। নীরা ভীরু নয়। পায়ে লুটিয়ে সে পড়েনি। সে দাঁড়িয়েছিল প্রস্তুত হয়ে। এবং নিজের যুদ্ধকৌশল আপনিই তার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে। নীরব অথচ উদ্ধত সহিষ্ণুতা তার প্রধান ধর্ম। সেদিন রাত্রে হেনাকে জেঠীমা ওর ঘরে শুতে দেননি। ভেবেছিলেন ভয় পাবে। কিন্তু সে ভয় পায়নি। এমন কি একলা থাকার সুযোগেও সে কাঁদেনি। সে রাত্রিটি নীরার জীবনে অক্ষয় স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

পরদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় সে বইখাতা সমস্ত ঠিক করে স্নান করবার আগে এসে দাঁড়িয়েছিল জেঠীমার সামনে। জেঠীমার বাড়িতে সেই নতুন ঠাকুর এসেছে। মায়ের শ্রাদ্ধে এসেছিল, আর তাকে বিদায় করা হয়নি।

দাঁড়াবার মধ্যেই যেন কিছু বলা হয়েছিল। জেঠীমা তবু তাকে কথা বলেননি। বলেছিলেন ঠাকুরকে—ক্লাসের ফার্স্ট

মেয়েকে ঘণ্টাখানেক আগে ইস্কুলে যেতে হয় ঠাকুর। যা হয়েছে দিয়ে দাও।

এবার সে বলেছিল, আমি কি পরে ইস্কুল যাব? আমার সাদা ফ্রকটা সেদিন হেনা পরে ওদের ইস্কুলের ফাংশনে গিয়েছিল। সেই থেকেই সেটা ও পরছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল জেঠীমা। তার মুখের উদ্ধত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি ডেকেছিলেন, হেনা।

ও ঘরে হেনা তখন চুল আঁচড়াচ্ছে। বলেছিল, কি?

—নীরার ফ্রক নিয়েছ, দিয়ে দাও।

—না। তুমি সেদিন বের করে দিয়ে বলনি, এটা তুই পরিস।

তর্ক করো না, দাও।

—না, দেব না। আমাকে এমনি একটা সুন্দর ফ্রক না-দিলে আমি দেব না। কক্ষনো না।

—দাও।

—না।

—না? জেঠীমা গিয়ে ওকে দুমদাম শব্দে মেরেছিলেন, এবং ফ্রকটা কেড়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, ওই নাও।

নীরবেই সে কুড়িয়ে নিয়েছিল। এবং সেইটে পরেই ইস্কুল গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে পাট করে যত্নে তুলে রেখেছিল। পরদিন সকালে দেখেছিল সেটা ফালি ফালি করে ছেঁড়া। খানিকক্ষণ সেটাকে হাতে ধরে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। কিছু বলেনি।

এইটেই প্রথম দৃশ্যের শেষ।

•

দ্বিতীয় অঙ্ক সুদীর্ঘ। দশ বৎসর। প্রথম দৃশ্য চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা। তারপর একটি পাঁচ বৎসরের দৃশ্য। হেনারা ভাই-বোনে পাঁচজন, জ্যাঠামশায় জেঠীমা এবং সে—এই আটজনের সংসারে সে একা এবং ওরা সাতজন একদিকে। সেই ঘরের কোণের বন্দী বেড়ালের মত স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি, উদ্যত নখ কিন্তু আক্রমণ প্রতীক্ষায় নীরব স্থির। শুধু একটা পরিবর্তন উভয় পক্ষই অনুভব করেছে, সেটা হল এই যে, ঘরের কোণের বন্দী যে জীবটিকে বিড়াল মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি কিশোর চিতাবাঘিনীতে।

সত্যই তাই। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকারেও সে এমন লম্বা ঢেঙা হয়ে উঠেছিল যে জ্যাঠামশায়ের বেঁটেখাটো সংসারটিতে যে-কেউ এলেই একদৃষ্টিতে বুঝতে পারত, এ তাদের কেউ নয়!

গৌরাঙ্গী সে নয়, শ্যামাঙ্গী। কিন্তু বাল্যবয়সে একটা বড় কোমল লাবণ্য ছিল, শ্রী ছিল। চোদ্দ পনের বছর বয়সে সে ঢেঙা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হারিয়ে গেল। শুধু রইল ওই বড় বড় চোখ আর একপিঠ চুল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখে, নিজের উপরেই তার রাগ হত। কিন্তু কাঁদত না সে।

হেনা তখন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, নধর গড়ন, মুখে কোমল লাবণ্যই শুধু নয়, সে ততদিনে নারীসুলভ কটাক্ষও আয়ত্ত করেছে। নাটক নভেল অনেক পড়েছে। পড়ায় সে কাঁচা বরাবর, সেটা তখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, ওদিকে পাকার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়েছে। নীরা

তখন পড়ছে ক্লাস নাইনে, আর হেনা পড়ে আছে ক্লাস সিক্সে।

জেঠীমা বলতেন, ওমা, কি হবে মা? এ মেয়েকে পছন্দ করবে কে?

হেনা বলত, ও কি শুধু পুরুষদের সঙ্গে লেখাপড়ায় পাল্লা দেয়? ও যে টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলে স্কিপিং করে। লং জাম্প দেয়, পুরুষদের সঙ্গে বক্সিং করবে।

হি-হি করে হাসত।

সে চুপ করে থাকত।

জেদ করে সে সাজসজ্জা প্রসাধন ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আরও শ্রীহীনা করে তুলতে চেষ্টা করলে। একদিন জেঠীমাকে বললে, ভাববেন না। আমাকে কেউ পছন্দ করবে বলে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ভয় নেই, আমি কারুর গলগ্রহ হতেও জন্মাইনি। তা আমি হব না।

জেঠীমা বলেছিলেন, কি বললি? ক্লাসে ফার্স্ট হোস বলে এত অহংকার তোর?

সে বলেছিল, যার কেউ নেই, তার অহং না থাকলে সে বাঁচে কি করে, বলুন? অহং যার সর্বস্ব, তার অহংকার ছাড়া কি আছে সংসারে?

—তার মানে?

—তার মানে, অহং মানে আমি। আমার আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই, কিছু নেই। তাই অহংকার করেই বেঁচে আছি। নইলে হয় বিষ খেতে হয়, নয় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতে হয়।

আশ্চর্য। মানুষের যে কখন কি হয়, আর কিসে কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। ওই কথা কটি কিভাবে যে জেঠী-মার মনে গিয়ে বাজল, আর তার কণ্ঠস্বরেই বা সেদিন কি সুরে বেজেছিল তা নীরাও ধরতে পারেনি। তার কণ্ঠস্বর সেদিন কি মুহূর্তের জন্য তার অজ্ঞাতসারে কোমল করুণ হয়ে উঠেছিল? হয়তো উঠেছিল। নইলে সেদিন এমনটা হল কেন?

তখন জেঠীমা কিছু বলেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার ঘরে এসে জেঠীমা তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িতে হেনারা ছিল না। তারা ভাইবোনেরা মিলে গিয়ে-ছিল পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে। সে যায়নি। যেত না কখনও। পড়ছিল সে।

জেঠীমা ডেকেছিলেন, নীরা।

সে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, সুর শুনে বিস্মিত হয়েছিল।

জেঠীমা বলেছিলেন, তোর মনে হয় নীরা, আমরা কেউ তোকে একটু ভাল-বাসিনে, না?

নীরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। কথা বলেনি।

জেঠীমা বলেছিলেন, না। যতটা ভাবিস তা নয়। তোর নিজেরও দোষ আছে। ভেবে দেখিস। তুইও আমাদের আপনার ভাবতে পারিসনি। তবে হ্যাঁ, দায়িত্বটা আমাদের আগে। তুই সেই একদিন কুণ্ডুবাবুর কাছে আমার এমন কুৎসা করলি, যে—।

বলেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন, তা ছাড়া আমার ছেলেমেয়েতে পাঁচটা, তারা গুণে তোর চেয়ে এমন ছোটরে, যে তাদের জন্যে—

কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করতে পার-ছিলেন না। যেখানে সত্যকথা বলে নিজেকে খাটো করতে হয়, তার চেয়ে নিষ্ঠুরতর সত্য আর নেই। সে সত্যকে ভয় ওই বিনো সেনও করেন। জোড়হাত করে বলতে হয়,

আমি হাতজোড় করছি, আমাকে ক্ষমা কর। আঃ—আবার ক্রম ভুল হয়ে যাচ্ছে।

জেঠাইমা সেদিন কেঁদেছিলেন।

নীরা কাঁদেনি। খুশী মনে বড় আনন্দে হেসেছিল সে।

জেঠাইমা বলেছিলেন, পড় তুই ভাল করে, পড়। বিয়ে নাই করলি।

নীরা বলে ফেলেছিল, দেখবেন, স্কলারশিপ আমি নেবই।

পরের দিন স্কুল যাবার আগে জেঠাইমা ডেকেছিলেন, নীরা শোন!

—কি জেঠাইমা।

—বস তো। এক রাশ চুল, না করিস যত্ন, না সামনেটা একটু ফেরাস। বস!

নীরা খুশী মনে বসেনি, কারণ রূপের অভাবের জন্য প্রসাধনে তার তিক্ততা ছিল। তবুও সে কথা অমান্য করেনি। তিনি চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে সামনেটা সুশ্রী করে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে নীরাকে দেখে বলেছিলেন, কে বলে শ্রী নেই! তাই তো রে। মুখখানা একটু ভরলে যে বড় সুন্দর হবে।

হেনা বলেছিল, ও মা! আমি যাব কোথায়?

অর্থাৎ জেঠীমার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে।

কিছুটা দিন সুখেই গিয়েছিল। গোটা ক্লাস নাইনের বছরটাই। জেঠীমা সত্যই স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু নীরার জীবন যে নাটক। ব্যঙ্গ করলে কি হবে। হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল।

একদিন হেনার জন্য স্বেচ্ছায় আবার তীর বিষদৃষ্টিতে—সে বিষ মর্মান্তিক ঘৃণার বিষ—সেই বিষদৃষ্টিতে পড়ল নীরা। জেঠীমার স্নেহের স্পর্শে ঔদ্ধত্য তার বেড়েছে। অবশ্য ভঙ্গিটা একটু পাল্টেছে। আগে হাসত না। এখন হেসে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

জেঠাইমা গোপনে বলতেন, না। এমন করে অহংকার করে না।

নীরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, আচ্ছা আর করব না।

মধ্যে মধ্যে সে দিদিমণিদের ব্যঙ্গ করত বাড়িতে। বলত, বি টি পাস হলে কি হবে, উনি জানেন না কিছু। কখনও বড়লোকের মেয়েদের ব্যঙ্গ করত।

এরই মধ্যে হেনার হয়েছিল পরিবর্তন। তার চেয়ে বয়সে কয়েকদিনের ছোট হলেও—সে তখন কৈশোর অতিক্রম করেছে। মনে আগেই—নাটক নভেল পড়ে মন তার স্বপ্নরঙ্গীন হয়ে উঠেছে, এদিকে দেহেও তার জোয়ার আসছে তখন।

স্কুলে সে উচ্ছলা হয়ে উঠেছে। বড় মেয়েদের সঙ্গেই সঙ্গ, যারা এককালে তাদের সঙ্গে পড়ত; গান গাইত। সিনেমা দেখত। ওদিকে তখন তেতাল্লিশ সাল এসে গেছে; যুদ্ধের নোটের বাজার; জ্যাঠামশাই ধনী হয়ে উঠেছেন। দমদম এরোড্রোম বড় হচ্ছে, জমির দাম পেয়েছেন; রিটায়ার করে কণ্ট্রাক্টরী শুরু করেছেন। নিত্য নূতন শাড়ি পরে। সিল্কের নামে নিত্যনূতন ডিজাইনের শাড়ি ব্লাউসও উঠছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে একটা উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সুর। সে-সুর ওর মনের তারেও বাজে। নীরার জেঠাইমা যাই হোন—জীবনে এক জায়গায় ছিলেন অতি কঠিন। সেটি তাঁর হিন্দু নারীত্বের আদর্শ। ওই এক জায়গায় তিনি সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন জীবনের সব শুচিতা সব পবিত্রতা। মেয়ের এ চেহারা তাঁর চোখে পড়ে নি তা নয়, পড়েছিল এবং তিনি শাসন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু এইটে জানতেন না যে, নৌকোর পাল একটা শক্ত দড়িতে বাঁধা থাকে না; অন্য দড়িগুলো না থাকলে কি দুর্বল থাকলে শক্ত দড়িটাও ছিঁড়ে যায়। হেনার নৌকোর দড়ি ছিঁড়ি-ছিঁড়ি করছিল।

নীরাও এতটা জানত না। হঠাৎ সে-দিন ক্লাসের শেষে নীরা ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে হেনা তার জন্যে বসে আছে। ইস্কুলের ছুটির পর আধঘণ্টা চাল্লশ মিনিট নীরাকে এবং আরও দুজন মেয়েকে এক একদিন শিক্ষক এক একটা বিষয় পড়াতেন। নীরাকে স্কলারশিপের জন্য তৈরী করছিলেন হেডমাস্টার। নীরার সম্পর্কে কোন আশঙ্কাও তাদের ছিল না। সে একলাই চলে আসত।

সেদিন হেনাকে দেখে সবিস্ময়ে বলেছিল, তুই?

হেসে সে বলেছিল, তোর জন্যে। তোর সঙ্গেই যাব।

—জেঠীমা বলেছেন বুঝি?

—হাঁ।

কিন্তু খানিকটা আসতেই সে একটু বিস্মিত হয়ে হেনাকে প্রশ্ন করলে, কি?

হেনা তার গায়ে এসে লেগেছে। হেনা উত্তর না-দিয়ে বললে—মরণ।

আরও বিস্মিত হল সে। এবার হেনা থমকে দাঁড়াল। এবং নীরার চোখে পড়ল—এই মুহূর্তে যে সাইকেলে-চড়া ছেলেটি

তাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল—সে গাড়িটা ঘুরিয়ে মন্থরগতিতে ইচ্ছে করে সাইকেলটাকে এ'কিয়ে বে'কিয়ে একটা বিশ্রী হাসি হেসে এগিয়ে আসছে। নীরা ভুরু কু'চকে বললে, ও কে? তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?

হেনা বললে, ওই ওরই জন্যে। আমায় জ্বালিয়ে খেলে। ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যাই, ও -আমাকে যা-তা বলে।

—কিন্তু ও কে?

—ও মনা ঘোষ। থিয়েটার করে!

মনা ঘোষ তখন কাছে এসে গেছে। প্যাডেলে একটু একটু ধাক্কা মেরে অতি মন্থর গতিতে এসে হেসে বললে, কি? আজ এত দেরী যে?

নীরা বললে, কি চান আপনি?

—তোমাকে নয় মণি। ওই ওকে!

মুহূর্তে এক কাণ্ড করে বসল নীরা—সাইকেল-আরোহীর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই এক চড় কষিয়ে দিল। মনা ঘোষ সাইকেল ছেড়ে গালে হাত দিতে গিয়ে সাইকেলসুদ্ধ পড়ে গেল। নীরা চিৎকার করে উঠল, লম্পট কোথাকার!

১৯৪৩ সালের কলকাতার শহরতলী। লোক জমে গেল। কিন্তু তার আগেই মনা ঘোষ উঠে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল, বলে গেল—আচ্ছা আমিও চিঠি নিয়ে ফাঁস করে দেব।

হেনা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল। এ রাস্তায় ওরা দুজনেই, বিশেষ করে নীরা, বিশেষ পরিচিত। তার ঢেঙাপনা ও শ্রীহীনতার জন্যও বটে এবং ওর ভাল মেয়ে বলে সুখ্যাতির জন্যও বটে। সে বললে, পথ ছাড়ুন আমরা বাড়ি যাই। একটা কুকুরকে মেরেছি, তার জন্যে হৈ চৈ করছেন কেন? পথও সে করে নিয়েছিল। কিন্তু হেনা হাউহাউ করে কে'দে বলেছিল, আমি কি করব নীরা, মা যে আমাকে কেটে ফেলবে।

—কেন?

—ওরে আমি যে ওর সঙ্গে মজা করবার জন্যে ইয়ার্কি করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীরা। হেনা কে'দে উঠল, ওরে আমার যে বিয়ে হবে না এরপর। আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে। আমায় তুই বাঁচা নীরা! কোন উপায় কর। আঃ, তুই ওকে মারলি কেন?

জায়গাটা বাড়ির কাছেই এবং একটু নির্জন। হেনা হাউ হাউ করে কে'দে বসে পড়ল।

নীরা বললে, তুই বলবি, তুই কিছু জানিসনে। নীরা জানে।

—ও চিঠি লিখেছিল, আমি যে তার উত্তর দিয়েছি। মনা ঘোষকে জানিসনে। আমি কি করলাম, আমি কি করব?

—কিছু করবিনে, বাড়ি চল। আমি সব দোষ ঘাড় পেতে নেব।

—আমি যে চিঠি লিখেছি।

—চিঠি ও দেখাতে আসবে না। এত সাহস হবে না।

—হবে। ও মনা ঘোষ। তুই জানিস নে।

—বেশ, তাও বলব, আমি লিখেছি তোর নাম দিয়ে। তোর লেখা নকল করে। বলব, আমি ওকে একটু মজাই দেখাতে চেয়েছিলাম। পেছনে লাগে—তাই মারব বলে এই করেছি।

হেনা সকরুণ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, দিব্যি কর।

—করছি। ভগবানের দিব্যি।

—না। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর দিব্যি।

—হ্যাঁ তাই করছি। এবং তাই করেছিল। বাড়িতে এসেও তাই বলেছিল। কারণ বাড়িতে ততক্ষণে খবর পে'ছে গেছে। জেঠীমা দোরগোড়ায় থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

জেঠীমা বিশ্বাস কিছুতেই করেন নি। বলেছিলেন, পা-ছু'য়ে দিব্যি কর!

সে তাই করেছিল। নীরার কিশোর মনে যেন একটা আত্মত্যাগের নেশা লেগেছিল।

জেঠীমা পাগলের মত ওকে চুলের মুঠো ধরে মেরেছিলেন। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদেনি। জেঠীমা আশ্চর্য মানুষ! তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেননি যে, নীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে!

জ্যাঠামশায়ও বিশ্বাস করেছিলেন। তবে সন্দেহ হয়, কারণ তিনি মাস কয়েকের মধ্যেই হেনার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

জেঠীমাকে হারিয়ে সে পেয়েছিল হেনাকে।

হারিয়েছিল সে অনেক কিছু। ইস্কুলে আর তার ঠাঁই হল না। মনা ঘোষ চড়ের শোধ নিতে তার কথাটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিল।

বাড়িতে বন্দিনীর মত জীবন হল। চুপচাপ বসে ভাবত আর বই ওল্টাতো। ওইটে সে কোন দুঃখ-হতাশায় ছাড়তে পারেনি। অনুশোচনা করেনি। কিন্তু ভাবত, এ হল

কি? এতটা তো সে ভাবেনি। এরই মধ্যে একদিন হল জ্বর। তারপর চেতনা হারাল। তারই মধ্যে যখন খানিকটা চেতনা হয়েছে—তখনই দেখেছে পাশে বসে হেনা।

বত্রিশ দিন পর সে পথ্য পেয়েছিল। কঙ্কালসার দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, রঙ কালো ভূষোর মত—সে যেন প্রেতিনী। মাথার চুলগুলোও উঠে গেল। হেনার বিয়ের সময় সে বাসরে যায়নি। তখন কিছুটা শরীর সেরেছে—চুল গজাচ্ছে, তবুও যায়নি। জেঠীমা যেতে বারণ করেছিলেন। শ্বশুর-বাড়ি যাবার সময় হেনা এসে তার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। বলেছিল, তুই কেন এ করলি নীরা? তোর কি হবে?

হেসে নীরা বলেছিল, তুই ভাবিস নে। ভগবান থাকলে তিনি ভাবছেন—আর আমিই ভাবি আমার ভাবনা। তুই হাসি মুখে যা। তা না হলে আমাকে কাঁদতে হয়। আমি তো কাঁদিনে জানিস।

॥ চার ॥

নীরার জীবননাট্য যদি কেউ রচনা করে, তবে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের দৃশ্য-পট হবে অন্ধকার ঘর। হ্যাঁ, প্রায় অন্ধকার ঘর। বাড়ির ভিতর যে ঘরখানায় বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, একেবারে উঠানের দিকে, সেই ঘরে তার স্থান হয়েছিল। উঠানের দিকে একটি জানালা; একটি দরজা। একেবারে বাড়ির এককোণে। রুগ্ন দেহে সে সেই ঘরে চুপ করে বসে থাকত।

জেঠীমা কঠিন নিষ্ঠুর। তাঁর কাছে এ অপরাধের ক্ষমা ছিল না। অসুখের সময় বলতেন, ও মরে যাক। ও মরে যাক।

সে-কথা অসুখের ঘোরের মধ্যেও তার দু চারবার কানে গেছে। মনে আছে তার। রোগ সারলে বলতেন—জীবনে যার দুর্ভোগের জন্যে জন্ম, মরণও তার হয় না। যম নিতে আসে—ওই দুর্ভোগ তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, না—আমার শিকার তুমি পাবে না। দুর্ভোগের সহায় যে নিজে ভগবান। যমকে ফিরে যেতে হয়। সৌভাগ্য যাদের, সুখ যাদের, তাদের বেলা ভগবানের অন্য বিচার। আয়ু থাকতেও তারা মরে। সে মরণ তাদের মোক্ষ যে!

কখনও কখনও বলতেন, তুই যদি আমার পেটের মেয়ে হতিস, ওই হেনা যদি এই কাজ করত, তবে বিষ দিয়ে আমি মেরে দিতাম।

আবার বলতেন, ভাবতাম আমি হেনার জন্যে। ওর জন্যে তো ভাবনা হয় নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন, এ ওই কৃশ্চান ইস্কুলের শিক্ষার ফল।

ওদিকে ছেলেরা ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে। বড় ছেলে হেনার বড়, তারও বড়, সে আই এ ফেল করে বাপের সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছে। সে মদ খাচ্ছে। দ্বিতীয় ছেলে পড়া ছাড়েনি, কিন্তু ফিল্মের হিরো হবার জন্য চেহারা বাগাচ্ছে। জ্যাঠামশায় চিরদিনই সন্ধের পর মদ গেলাস মাপে মেপে খেয়ে থাকেন—মেপে দিতেন ওই জেঠীমা—এখন জ্যাঠা-মশায় নিজে ঢেলে খান। তাতে জেঠীমা আপত্তি তোলেন, কচিৎ কোনদিন কপালে হাতের চাপড় মেরে বলেন, কপাল। সেটা ঘটে যেদিন জ্যাঠামশাই বাইরে পার্টি সেরে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন—তাঁকে ধরে নামাতে হয় সেইদিন। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ থাকে না। জ্যাঠামশায় যখন বলেন—চোপরাও! মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। মিলিটারী সাহেব, তারা মদ খাওয়ালে খুশী হয় না তাদের সঙ্গে খেলে তবে হয়। ভাবে—ঘেন্না করছে। দমদমের ওপাশের জলো জমি কিনেছিলুম আড়াইশো টাকা বিঘে, ওরা দর ঠিক করেছিল দু হাজার টাকা বিঘে; পার্টি দিয়ে ওদের সঙ্গে ক' গেলাস খেয়ে আড়াই হাজার বিঘে করেছি। দশ বিঘে জমি, টেন ইনটু ফাইভ হান্ড্রেড—ফাইভ থাউজ্যাণ্ড।

হিসেব শুনে চুপ করতেন জেঠীমা।

নীরা ঘরে বসে চুপ করে শুনত। হাসতও না। সে জানত—জেঠীমা কতবার বলেছেন—বেটাছেলের কাছে হিসেব নিয়ো না। কাজ ওদের—ধর্ম মেয়ের। ভগবানে ভক্তি আর মেয়েধর্ম—এই দুয়ে সংসারের ভাল মন্দ; পৃথিবী ওতেই শীতল—বাসুকি ওতেই স্থির। পুরুষে টাকা আনে—জিজ্ঞেস করো না—কোথা থেকে আনলে?

বলতেন মেয়েকে—হেনাকে। হেনা মধ্যে মধ্যে এসে শুধু তাকেই স্বামীর কীর্তির কথা বলত না—মাকেও বলত। মা ওই উপদেশ দিতেন। শেষে কোটেশন তুলতেন রামায়ণ থেকে, রামায়ণ পড়ে দেখ। ব্রাহ্মণের ছেলে রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। একদিন নারদ আর ব্রহ্মা এলেন, তাকে বাল্মীকি ঋষি করতে হবে। রত্নাকরকে বললেন—ভাল, তুমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করছ, এর পাপের কথা ভেবেছ? রত্নাকর বললেন—ঠাকুর এ পাপের ফল আমরা গোটা সংসার মিলে ভোগ করব। এক সঙ্গে থাকব যেখানেই থাকি। ভাবনা কি? ব্রহ্মা বললেন—উঁহু, তুমি জিজ্ঞাসা করে এস

তোমার সংসারকে। রত্নাকর নারদ আর ব্রহ্মাকে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করে টাকা আনি, সোনা আনি, নানা জিনিস আনি, এর যে পাপ, তার অংশ তোমরা নেবে তো? স্ত্রী-বাপ-মা-বোন-ছেলে সবাই বললে, না। তুমি কোথা থেকে কি করে উপার্জন কর তা আমাদের দেখার কথা নয়। সে দায় তোমার। স্ত্রী বললেন, আমি তোমার সেবা করি, সুখী করি তোমাকে, তোমার সন্তান গর্ভে ধরি—সেই দায় শুধু আমার। বাপ-মা বলেন—বাল্যকালে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, আমাদের দায় চুকে গেছে। ছেলে বললে—তুমি বুড়ো হলে তোমাকে খাওয়াবার দায় আমার। তোমার দায় তোমার, তার জন্যে কোন প্রশ্নও নেই, তার পাপ পুণ্য কিছুর ভাগই আমরা নেব না। বুঝলে মা, এই হল ধর্মের শিক্ষা। ভুলো না। তোমার বাপ আজকাল মদ খেয়ে বেসামাল হয় কখনও কখনও, কিছু বলিনে। শুধু সংসারের মধ্যে মেয়েদের ভার আমার। আমি তাই নিয়ে আছি। তোর দাদাও মদ খায়। বলি নে কিছু। হয়তো আরও দোষ ঘটেছে। বিয়ে করতে বলি, করতে চায় না। বুঝি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—আমার জোর করা উচিত বুঝি। কিন্তু—। সাপের মত গর্জে উঠে বলেছিলেন—ওই পাপ ঘরে থাকতে—। না। ওকে নিয়ে যে কি করব, বুঝতে পারিনে।

প্রায় এক বছর পর, একবার এসে হঠাৎ একদিন এমনি কথার উত্তরে হেনা বলেছিল, মা! এর কি ক্ষমা নেই মা?

—না।

—ওকে তুমি ক্ষমা কর মা।

—না।

চুপ করে গিয়েছিল হেনা। মাসখানেক পর চলে গেল। দুপুরবেলা যাবার সময় বলে গেল নীরাকে—নীরা।

নীরা বলেছিল, তুই যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। আবার আসব মাস দুই পর।

—কোন মাসে ছেলে হবে তোর?

—দু মাস পর সাত মাস। সাধের পর আসব।

বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলতে চেয়েও পারেনি। হঠাৎ বলেছিল, আসি তা হলে। বলেই যেন হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

আবার দু মাস নিরম্বু সঙ্গীহীন জীবন। হেনা এলে তবু তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটে। পায়রার মত বকবক করে আপন মনে, আপনার কথাই বলে যায়। তার সঙ্গে সিনেমার কথা। প্রেমের গল্প। সে শুধু শুনেই যায়।

হেনা চলে গেল। গাড়ির শব্দ পেলে, মোটরের হর্ণ। হেনার শ্বশুর একখানা গাড়ি কিনেছে। নীরা একখানা বই ওলটালে। হঠাৎ জেঠীমা ঘরে ঢুকলেন।

—নীরা।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল নীরা। সে কি ক্রোধ তাঁর কণ্ঠস্বরে।

একখানা পত্র বাড়িয়ে দিলেন।—হেনা দিয়ে গেল। এ সত্যি?

হেনা সব অকপটে স্বীকার করে পত্র লিখেছে। মুখে বলতে পারেনি, পত্রে স্বীকার করে লিখেছে, আর ওর কষ্ট দেখতে পারলাম না, লিখলাম। তুমি ওকে এমন করে কষ্ট দিয়ো না।

চুপ করে রইল নীরা।

—নীরা! বল!

—কি বলব?

—এ সত্যি?

—হেনা নিজে যখন স্বীকার করেছে—তখন আর আমার না বলে লাভ কি বলুন। হেসেছিল একটু!

স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিলেন জেঠীমা। তারপর কঠিন ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, তোর পাপ হেনার চেয়ে বড়। সে মতিভ্রষ্ট হয়ে ভুল করে করেছিল, আর তুই মতিস্থির করে করেছিস। কলঙ্কের কাজ করে ভয় পেয়ে মিথ্যে বলে সে-কলঙ্ক ঢাকতে যাওয়ার চেয়ে পাপ না করে পাপের কলঙ্ক মাথায় নেয়—তারা তো সব পারে। হেনার উপর যত ঘেন্না হল আমার, তার চেয়ে বেশী ঘেন্না হল তোর উপর!

অদ্ভুত নিষ্ঠুর সে-ঘৃণার অভিব্যক্তি তাঁর। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে নীরা। তিনি আবার বলেছিলেন, তার মানে পাপে কলঙ্কে তোর ঘেন্না নেই, লজ্জা নেই। তা হলে তো তুই সব পারিস!

বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল নীরা। আপনা-আপনি যেন অকস্মাৎ বন্ধন-মুক্ত জীবের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধন কেটে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দরজাটা দেবেন না।

এসে দরজাটা চেপে ধরেছিল। জেঠীমা এই এক বৎসর তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতেন, রাত্রে তার ঘরে ঝিটা শুতো, বাইরে থেকে তালা দিতেন।

জেঠাইমা খুব জোর করেন নি। ছেড়েই দিয়েছিলেন। নীরা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে, জেঠাইমার মুখের দিকে—সেই পুরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—শুনুন, সব যখন জেনেছেন, তখন আজ থেকে আমি বাইরে বেরুলাম। কাল থেকে আমি আবার ইস্কুলে যাব।

জেঠাইমা বললেন, না। তা আমি তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

—কেন?

—একথা প্রকাশ হবে, হেনার শ্বশুর বাড়ি যাবে। তা ছাড়া, তোমাকে বিশ্বাস কি?

—না, আমি সে-কথা প্রকাশ কখনও করব না।

—সে বিশ্বাস করলাম। তা আমি বলি নি। তোমার নিজের কথা বলছি—কলঙ্ককে যার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, তাকে বিশ্বাস আমি করিনে। মনা মরেনি, বেঁচে আছে। শুনছি সে এখন গরিব গেরস্ত-বাড়ির মেয়েদের নিয়ে যুদ্ধের বাজারে দালালী করছে। এ বাড়ির বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না আমি। আর ইস্কুলেই বা বলবে কি, হেনার কথা প্রকাশ না করলে।

—বেশ। ইস্কুলে আমি যাব না, কিন্তু এবারেই আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব প্রাইভেটে।

—যে লেখাপড়া শিখে মিথ্যে পাপের বোঝা মাথায় করে নিজের আত্মানারায়ণের এত বড় অপমান করলে—তা শিখে হবে কি?

—পেটের ভাত হবে। আপনাদের হাত থেকে মুক্তি পাব।

একটু চুপ করে থেকে জেঠীমা বলেছিলেন, তাই দেবে। তোমার জ্যাঠাকে বলব।

সেদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে ঘাতে সংঘাতে নয়—নিজেকে দেখে নিজের মনের মধ্যে সেটা জেগেছিল—সে যুদ্ধ যেন নিজের সঙ্গে।

বাইরে বাড়িটার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ভাঙাগড়া অনেক হয়েছে। জ্যাঠামশায় আজকাল মধ্যে মধ্যে স্যুট পরেন, আপিসের বড়বাবুদের মত ঢলঢলে পেণ্টুলান আর গলাবন্ধ কোট নয়। দস্তুর মত স্যুট। তবে অর্ডারী নয়, রেডিমেড। বাড়ির চেহারাটা তাই হয়েছে। বাড়ির বাইরে দরজার পাশে পিতলের নেমপ্লেট বসেছে। শ্রীপরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নয়, Mr. P. C. Mukerjee Contractor. বাড়িটার চেহারাও ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়েছে। নতুন ফার্নিচার হয়েছে। অবশ্য সেখানে ওই অসামঞ্জস্য নেই, সব নতুন এবং অত্যন্ত মডার্ন।

বাইরে অর্থাৎ উঠানের সামনে, বারান্দাটা চমৎকার হয়েছে। সেই বারান্দায় অভিজাত রুচি অনুযায়ী হ্যাট-র‍্যাক সমেত একটি সুন্দর খাড়া করা আলনা; তার নীচে জুতো রাখবার বাক্স, আর প্রায় গোটা মানুষের মাপের একটা ষ্ট্যাণ্ডিং মিরার। সেই আয়নার মধ্যে ফুটে উঠেছে—রৌদ্রালোকে আলোকিত নীরার প্রতিবিম্ব।

শিউরে উঠল সে। ভয়ে চোখ বুজল।

[শেষাংশ ২৬৯ পৃষ্ঠায়]

নর্তকী
শিল্পী ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

বেহুলা

বনফুল

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিনী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে নয়, কম-বয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কী যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতি-হিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর চোখে মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব-ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই। রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্প-শিশু যেন জড়াজড়ি করে ফণা তুলে আছে। অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি।

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে"

তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে এক-জিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা করে দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার করে তলার ঘা-টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চুলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধ হয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে গেল।

চার-পাঁচ দিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি রাস্তাটা খুব খারাপ, আশে পাশে ঝোপঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়ে-ঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিলে।

বললাম, "ওই ভাঙা ঘরে থাক কী করে?"

কোন উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমনি স্থির হয়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা?"

চুপ করে রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। ভাবটা—আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ করে থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা?"

"আমদাবাদের কাছে।"

"কোন্ জেলা?"

"পূর্ণিয়া।"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে?"

"রোজ লাগাই।"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি!"

চুপ করে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভাল করে দেখব। ঠিক সিঁদুর পরবার জায়গায় একজিমা হল কী করে? আশ্চর্য তা! চুলকোচ্ছিলে নাকি? রক্ত পড়ছে।"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হল রক্তটাই সিন্দুরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধ হয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসঙ্কোচে দখল করেছে। যদিও মেয়েটির চোখে মুখে একটা বিরুদ্ধভাব সজাগ হয়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কী জাত? জেলে না কি?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে।"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসেনি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে

অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথার ঘা-টা দগদগে হয়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা করে দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফাণ্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনবার টাকা নেই।"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে দুটি ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমিও ছিলাম সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছানাপত্র কিছু নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলি শুধু ঝুলছে চাল থেকে।"

"আর কিছু নেই?"

"না।"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হতে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধ হয় বাঁচবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কী করে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয় সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল সাপের লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে।

মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারিনি। বিষদাঁত উঠেছে ওর।"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়েনি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়িনি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

"সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না।"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হল। সাপটারও হল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

পসরা — আলোকচিত্রী: বিনয়ভূষণ দাস

জানলা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রণ শব্দে জানলাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ঝড় উঠেছে নাকি?

না, ঝড় কোথায়? দিব্যি মোলায়েম চুপচাপ চারদিকে। তেমন একটা ভারী গাড়িটাড়িও তো যায়নি রাস্তা দিয়ে। একটা বোমা-টোমা ফাটবার মতও কিছু হয়নি।

এ ঠিক জানলা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, এ সজোরে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া। ওপার থেকে জানলার পাল্লা দুটো এপারের দিকে ছুঁড়ে মারা। একটা বন্দুক ছুঁড়তে পারেনি বলেই যেন জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে।

জানলার কাঠ দুটো ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মাঝখানে একটা ফাঁক রেখে দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে। যদি জানলা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হত, তা হলে এখনকার এই ফাঁকটা রাখত না জাঁইয়ে।

এ বেন একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মারা।

যুথিকা গম্ভীর হয়ে গেল।

উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরে জয়ার কাণ্ড। রণদীপ্ত মুখে রাগ যেন গরগর করছে। জানলাটা ছুঁড়ে দিয়েই সরে গেছে আলগা হয়ে।

যেন, তোমার মুখ দেখব না, তোমার মুখ দেখাও পাপ, এই রকম বলা ধমক দিয়ে। তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া উচিত, যেন এমনি একটা রূঢ় তর্জন।

তার উপর এই নিক্ষেপ?

যুথিকা তাকিয়ে দেখল, চেয়ারে-বসা বিভাস কি-একটা বই দেখছে নিচু চোখে। নির্লিপ্ত শৈথিল্যে।

যেন এত বড় সশব্দ অভদ্রতা চোখ তুলে চেয়ে দেখবার মত নয়। রাস্তায় হামেশা কত ঠোকাঠুকির শব্দ হয়, মোটরের কত টায়ার ফাটে, এ যেন তেমনি। ত্রস্তব্যস্ত হবার কিছু নেই।

এই তো সবে এরা পা দিয়েছে এ বাড়িতে, ও-পাশের ঘরে মেসোমশায়ের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে বিস্তৃত হয়ে বসেছে এ-ঘরে, এখনো প্রচলিত অতিথি সৎকার হয়নি, মাসিমা হয়তো তাই জোগাড় করছেন রান্নাঘরে, জয়ারই তাতে হাত লাগানো উচিত, কিন্তু, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ছুটে এসে মুখোমুখি উল্টো ঘর থেকে এমনি প্রচণ্ড শব্দে জানলা ছুঁড়ে মারার মানে কি?

বুকের ভিতরটা কালো হয়ে উঠল যুথিকার।

বিভাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার যাবে?'

বইয়ের থেকে চমকে উঠল বিভাস। বললে, 'মন্দ কি?'

ও-ঘর থেকে সুশীলবাবু তেড়ে এলেন:

'সে কি কথা! এইতো এলে সবে—'

রান্নাঘর থেকে মাসিমা বলে উঠল: 'যাসনে, আমি চা করে আনছি।'

জয়া একটাও কথা বললে না।

হাসিতে-খুশিতে ঝলমল মেয়েটা। এ সময় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে তার পথ আটকাবার কথা। কিন্তু কেমন যেন অন্য রকম। গম্ভীর-গম্ভীর। প্রায় বিখণ্ডিনী মূর্তি।

কালই তো তাদের বাড়ি গিয়েছিল জয়া। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত হৈচৈ করেছে, ছাদে-বারান্দায় কত শিথিল সরল ছুটোছুটি। নবীন নিবিড় মেয়েটা, জল-ভরা ঘট, কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে একদিনে। শরীরের খেলায় যে খোলা ছুরির ঝলক ছিল, তা যেন লোপাট হয়ে গিয়েছে। চোখে কালো জানালার ধার।

একদিনে কী এমন হতে পারে ব্যাপার?

কাল জয়াকে বাড়ি ফিরিয়ে দেবার সময় বিভাস কি ছিল গাড়িতে?

সমস্ত ভাবনা জুড়ে মেঘ করে এল যুথিকার।

কাল শনিবার ছিল। যুথিকা ফিরেছিল বিকেল তিনটেয়। বিভাস পাঁচটায়। জয়ারা এসেছিল সন্ধের দিকে। না, জয়ারা কোথায় —জয়া একাই এসেছিল—ও এখন বেশ একা-একা চলতে-ফিরতে পারে—কিন্তু দাঁড়াও, গেল কখন?

কি আশ্চর্য, কালকের মাত্র ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, অথচ ঠিক-ঠিক কিছু মনে করতে পারছে না যুথিকা। আজকাল কিছুই সে তেমন মনে রাখতে পারে না। সব ঢালা-উপুড় হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স বাড়ছে। সে বুড়ো হচ্ছে।

দাঁড়াও, হ্যাঁ, উনি বাড়ি ছিলেন যখন জয়া এল।

কিন্তু, যখন গেল? হ্যাঁ, গাড়ি বেরুল গারাজ থেকে। জয়া উঠল, ঠিকই তো উনিও উঠলেন। হ্যাঁ, না, ঠিক, উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসলেন না, ভিতরেই বসলেন।

বুকটা দুরদুর করতে লাগল যুথিকার।

তারপর গাড়িটা ছাড়ল।

না, না, ছাড়বে কি! যুথিকা যাবে না? ও অমনি ছেড়ে দেবে?

হ্যাঁ, যুথিকাও উঠল। জয়া ওঠবার পরেই যুথিকা। যুথিকা বসল মাঝখানে, বিভাস আর জয়াকে বিভক্ত করে।

উনি ড্রাইভারের পাশে বসলেন না কেন মেয়েদের একলা ছেড়ে দিয়ে?

ও! ড্রাইভারের পাশে চাকর বসেছিল।

হ্যাঁ, জয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল বাজার করতে। বলে গেল, কাল যাব তোমাদের বাড়ি। কই, না করল না তো!

না, গাড়িতে কিছু হয়নি।

তবে, বাড়িতে? বাড়িতেই বা সময় কতটুকু? তেমন ফাঁক কোথায়? কোথায় তেমন নিরিবিলি?

তবে কি কালকের আগের কোনো ঘটনা?

আগের ঘটনা হলে কাল ও যায় কেন? সারাক্ষণ কেন উল্লাস-বিলাসের ঢেউ তোলে? সোনার পাখা মেলে কেন ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়?

কই, কাল তো ছিল না এমন রুক্ষরোষের চেহারা। বরং ফুল্লমল্লিকার মুখ করে ছিল!

চা আর মিষ্টি নিয়ে এল মাসিমা।

তবু তাই নিয়ে বিভাসকে ব্যাপৃত রাখতে পেরে যুথিকা একটু নিশ্চিন্ত হল।

কই, জয়া কোথায়, এত আমি খাব কি করে? বলতে-বলতে জয়ার সন্ধানে এগুলো।

দু' পা দূরেই এক চিলতে রান্নাঘর।

দেখল জয়া গুম হয়ে বসে আছে এক-কোণে।

'এই যে তুমি এখানে। আমি এত খাব কি! এস তুমিও একটু হাত লাগাও।'

উঠে দাঁড়াল জয়া। একবার একটু-বা দেখল সজাগ হয়ে পিছনে তার কেউ আছে কিনা। না, আর কেউ নেই। স্বস্তিতে হাসল জয়া। বললে, 'সামান্য জিনিস, এর আবার ভাগাভাগি কি।'

পীড়াপীড়ি করল না যূথিকা। একটু ঘে'ষে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, 'শরীর কেমন আছে?'

'ভালো।'

'মন-মেজাজ?'

'ভালো নয়।'

'কেন কী হয়েছে?' স্বর নামিয়ে কাছে একটু টানতে চাইল যূথিকা।

'জানি না।' জয়া চোখ নিচু করল। পরে কী ভেবে মুখে একটু শীর্ণ হাসি টেনে বললে, 'মেজাজের কি কিছু ঠিক আছে?'

যূথিকা স্বর এবার গোপনের ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'তখন জানলাটা আমাদের মুখের উপর অমন ছুঁড়ে মেরে বন্ধ করলে কেন?'

'আপনাদের মুখের উপর? কই, কখন?' ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল জয়া। এর আবার মোকাবিলা হয় নাকি?

'সেকি, এই তো খানিক আগে। আমরা, আমি আর উনি, ওদিকের ঘরটায় বসে, আর তুমি মুখোমুখি ঘরটাতে দাঁড়িয়ে। জানলার পাল্লা তোমার দিকে। হঠাৎ তুমি তোমার দিক থেকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে জানলাটা—'

একটু জোরে হাসতে চেষ্টা করল জয়া। বললে, 'শব্দ করে বন্ধ করলাম।'

'হ্যাঁ, তাই। তাই-বা কেন?'

'বাঃ, জানলার উপরে দেয়ালে একটা টিকটিকি ছিল, সেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' হাসির ঢল নামাতে চাইল জয়া। কিন্তু কোথায় কোন কুণ্ঠা না কষ্টের পাথরে আটকে গেল জল।

যূথিকার মন খোলসা হল না।

দুজনে চলে যাচ্ছে, সুশীলবাবু আবার কেঁদে পড়লেন। যদি মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারো। তোমাদের কাছে আর নতুন কী বলব। পেনসন নিয়েছি, মাইনের আদ্ধেকের চেয়েও কম। শাঁসালো বড় ছেলেটা মারা গেল, ছোট দুটো সামান্য তেলে টিমটিম করছে। বাপ-মরা ভাইঝিটা ছিল আমাদের কাছে, মফঃস্বলে। দু-দুবার আই-এ ফেল করল, মা চোখ বুজল, মামারা সুযোগ বুঝে বললে, আর টানতে পারব না জের, বিয়ে দিয়ে দিন। এখানে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। বিয়ে যেন হাতের মোয়া।

চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা—গায়ের রঙখানা তো দেখেছ। একটা কোথাও যদি তাই চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো। মেয়েও গোঁ ধরেছে, চাকরি করবে, দাঁড়াবে নিজের পায়ে। ফেল-করার লজ্জা, অমনোনীত হবার লজ্জা, মুছে ফেলবে রোজগার দিয়ে। তোমরা দুজন আছ, তোমরা যদি কোথাও না ব্যবস্থা করে দাও—

'স্টেনোগ্রাফি তো শিখছে।' বললে যূথিকা।

'তা শিখছে। কিন্তু কত দিনে তৈরি হবে, তা কে বলবে। শিখছে শিখুক, ততদিন সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা চাকরি। ছোট-খাটো, যেমন-তেমন—কোনো আফিস-টাফিস—কত তো তোমাদের চেনা।'

'দেখি।' যূথিকা আবার এক-নজর দেখল জয়াকে।

রঙ কালো বটে, কিন্তু কেমন একটা আলো-আলো ভাব। যেন নতুন ধানের থোরে শরতের সোনা ভরা। সবুজ-সজীব।

কয়েক মাস পিচের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর একটু শুকনো-শুকনো হয়েছে কিন্তু টান-টান তাজা ভাবটা একটুও ঝিমিয়ে পড়েনি। যে নীল-নীল আকাশভরা নরম রোদ এনেছিল গাঁ থেকে তার আভাস এখনো গায়ে মাখা আছে।

'দেখি, চেষ্টা ত করছি।' নতুন আশ্বাস দিল বিভাস।

'মেয়েদের চাকরি! শুনতেই সুন্দর, নইলে একশো গণ্ডা ঝামেলা।' যূথিকা বিরক্তির ঝাঁজ আনল গলায় : 'ট্রামে-বাসে ওঠা মানে নরককুণ্ডে ঝাঁপ মারা। তার পর আফিস ত নয়, পশুশালা। অন্যমনস্ক হয়ে, একটু নিজের মনে বসে কাজ করবার জো আছে? তার পর একেকজন বস্ যা আছেন—'

'উপায় কি।' বললেন সুশীলবাবু, 'যুগের সঙ্গে চলতে হবে মানিয়ে। যেমন গলি তেমন চলি—'

বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে একলা পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যূথিকা : 'মেয়েটা কি-রকম বেয়াদব দেখেছ?'

কোন্ মেয়েটা জানবার দরকার নেই, তবু গোড়াতেই একেবারে লাফিয়ে ওঠা যায় না, তাই ঠাণ্ডা চোখে বিভাস বললে, 'কেন, কী করল?'

'ন্যাকামি করো না। ঐ যে তখন আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিল জানলাটা!'

'মেয়েরা কখন কী করবে, হাসবে না কাঁদবে, কেউ বলতে পারে খড়ি পেতে?'

'বলল কিনা, একটা টিকটিকি ছিল, তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' চোখে চোখ রাখল যূথিকা : 'তুমি কি টিকটিকি?'

'বা, আমি টিকটিকি হতে যাব কেন?' আকাশপড়া ফ্যাকাশে মুখ করল বিভাস।

'তুমি ছাড়া আর কে। তোমাকে লক্ষ্য করেই ও জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে। তাতে আর সন্দেহ কি।' চোখের কোণে ক্রুদ্ধ শর পুরল যূথিকা : 'ওর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেছ?'

'তার মানে?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবার মতন করে বললে বিভাস।

'তার মানে, কোনো দুশ্চেষ্টা—'

'ও কিছু বলেছে?'

'জিগগেস করিনি এখনো।'

'জিগগেস করলেই পার।'

'নইলে ওর অত চটবার কারণ কি। বলা যায় না কখন কি খেয়ালের বশে কী করে ফেল আচমকা। সন্ন্যেসী আছ, কি দেখে ফট্ করে হঠাৎ বিলাসী হয়ে ওঠ।'

'তোমার রাজত্বে বাস করে কি আর বিলাসী হবার জো আছে!' একটা ম্লান শ্বাস বেরিয়ে এল বিভাসের মুখ দিয়ে।

আলোতে কপালের কাছেকার দুটো পাকা চুল যেন আরো চকচক করে উঠেছে। যূথিকা কাছে গিয়ে চুল দুটো তুলে ফেলল। আর, একবার কটা তুললে আরো কটার জন্যে আঙুল নিসপিস করে।

সন্দেহ কি, স্বামীকে যূথিকা কড়া শাসনে সন্ন্যেসী করে রেখেছে। নইলে আর শান্তিতে সংসার করতে হত না। যে জানলায় প্রতিবেশী আছে সে জানলায় দাঁড়াতে পায় না। রাস্তায় বেরুলে ছাড়পত্র নেই কোনো চলন্ত দীপশিখার উপর দৃষ্টিটা স্থির করে। না, বিভাসের একটাও কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে একটু শ্রীমান হয়ে বসতে পারে, নিজের কানে শোনেনি এমনি মোলায়েম সুরে বলতে পারে কথা। যা দু-একজন অনাত্মীয় আলাপী মেয়ে আছে, তাও ক্লাবের মেম্বর হয়ে, আর সেই ক্লাবে যূথিকাও তার সহযাত্রী। এমন কেউ নেই যে, কাগজে-কালিতে না হোক, রঙিন ভাষায় একটা আধটা চিঠি লেখে—তেমন যদি নাকের ডগায় গন্ধ লাগে, নিজেই চিঠির মোড়ক খুলে ফেলে যূথিকা। যদি তেমন কেউ বাড়িতে দেখা করতে আসে, যূথিকাই গায়ে পড়ে আগে থেকে তার ভার নেয়। আলাপের পরিধি-পরিমিতি তদারক করে। মোট কথা, সঙ্গে-রঙ্গে, প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, অনৈক্যে-আধিক্যে, নিজেকেই সে করে রেখেছে একচ্ছত্রী। এই ত ভদ্র, প্রৌঢ় জীবনের নিয়ম-নিয়তি। নিজের কক্ষে সুষম ছন্দে এখন শুধু পাক-খাওয়া। যজ্ঞের ষাঁড় আর এখন হাল টানবে কি!

বিভাসের জীবন দেয়াল দিয়ে নিরেট গেঁথে দিয়েছে যূথিকা, জানলা খুলে রাখেনি একটাও। গানের মধ্যে রাখেনি একটুও মিশ্ররাগের অবকাশ। তুমি এখন সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীন থাকো আর আমি ধাত্রীভাবে দেখি-শুনি তোমাকে।

এই এখন শান্ত শালীন সুস্থ অবস্থান।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ল যূথিকার। মনে হল আগন্তুক কে এক মহিলা বিনানুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চমকে উঠবে কি না ভাবছিল, কিন্তু, না, এ ত সে নিজে। সে নিজে? তা ছাড়া আর কে। বিভাসের জীবনের রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী। আনন্দের মূলস্পন্দ।

মাথার চুল উঠে গিয়ে টাক-পড়ার মত হয়েছে। কটা দাঁত নড়তে-নড়তে এগিয়ে এসেছে মাড়ি ছেড়ে। গাল দুটো ভেঙে গিয়ে মুখের মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছে। থলে জাগছে চোখের কোলে। দেহের উপরে-নিচে কোথাও আর নেই বৃত্তাভাস।

কিন্তু বিভাস পঞ্চাশ পেরোলেও এখনো কেমন ঋজু ও প্রশস্ত। বর্ণ ও বল, সুর ও ছন্দ, গতি ও যতি সমান প্রস্ফুট। কোথাও বিরূপ বক্রতা নেই, দৌর্বল্যশৈথিল্য নেই। তবু সব ফুরিয়ে-ফেলা নিঃস্বের মত বসে আছে দেখাচ্ছে। চলে যাচ্ছে যাক এমনি স্পৃহাহীন স্বাদহীন তরঙ্গহীন স্রোতে গা ভাসিয়েছে। জীবনে গাঢ়তা ও গূঢ়তা যে রস দিতে পারে, যূথিকার সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে তাই যেন খুইয়ে এসেছে। শুধু শমিত নয়, স্তিমিত। রাত্রি যূথিকার কাছে একতাল কালো ঘুম, কিন্তু বিভাসের কাছে এখনো হয়ত রহস্য-হংসী। সে হাঁস আর বুঝি ডিম দেয় না।

কেমন ক্ষীণশ্বাস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে বিভাসকে।

'যাই বল, মেয়েটার কী স্পর্ধা, গুরুজন বলে একটুও মান্য নেই।' রাগে রি-রি করে উঠল যূথিকা।

'মেয়েদের মতিগতির মাথামুণ্ডু কিছু আছে নাকি?' সহজে নিশ্বাস ফেলল বিভাস।

'সাদামাঠা মেয়ে, দুরবস্থার সংসারে এসে উঠেছিস—' আক্ষেপের সুরে বলতে লাগল যূথিকা : 'আমরা তোর মুরুব্বি, একটা সুরাহা কোথাও করতে পারি কি না তাই দেখছি, আর তুই কি না আমাদেরই মুখের উপর—'

'মেয়েদের রাস্তায় কোনো ট্রাফিক-লাইট নেই, লেফট-রাইট নেই। কখন গলবে কখন জ্বলবে, দেবতা দূরের কথা, দানবেও বলতে পারে না।'

গলতে-গলতে যূথিকাই হঠাৎ জ্বলে উঠল : 'কিন্তু, সত্যি বলো না কী হয়েছে!'

'বা, কিছু হলে ত বলব!'

'নইলে শুধু-শুধু জানলা ছোঁড়ে?' কটাক্ষ আবার সূক্ষ্ম করল যূথিকা।

'স্থলে-জলে-আকাশে কত কি ছুঁড়ছে মানুষে—চুপ করে যাও।' কাগজ তুলে নিল বিভাস। মুখ ঢাকল।

মুখ ঢেকে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয় যূথিকা। পরদিন সকাল-সকাল ফিরল আফিস থেকে। বাড়ি না গিয়ে গেল মাসিমাদের ওখানে।

জয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, তাকে নিয়ে এল নিভৃতিতে। দরজা বন্ধ করে দিল।

কী হয়েছিল সত্যি করে আমাকে বল।

জয়ার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

হ্যাঁ, আমার সব জানা দরকার। যদি

কোথাও কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত হয়ে থাকে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতেই হবে। তুমি কুমারী মেয়ে, কোনো বিপদের ঝুঁকি তুমি নিতে পার না। বললে আমার সংসারে কোনো ভাঙন ধরবে এ ভয় তুমি করো না। বরং বাড়তে-বাড়তে পাপ যদি প্রলয়ের মূর্তি ধরে, তখন দশ দিকের কোনো দিকই সমালানো যাবে না। তোমাকে বলছি, কাপড় দিয়ে আগুন ঢেকে রাখা যায় না, অধর্ম বা অন্যায় কিছুই গোপন করবার নয়।

ঘেমে নেয়ে উঠল জয়া। যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, বল, ভয় নেই।'

'কত দিনই ত গিয়েছি, সেদিনও গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়ি, সন্ধেবেলা, একলা—' বলতে লাগল জয়া, 'ছাদে রেলিঙ ধরে নিরালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপচাপ—'

'আমি ছিলুম কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'হ্যাঁ—তার পর?'

'উনি হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন।'

'উনি মানে—'

'বিভাসবাবু।'

'হ্যাঁ, দাঁড়ালেন—'

'হ্যাঁ, গা ঘেঁষে। আমার হাত ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে—'

'কি, চুমু খেলেন?'

এত যন্ত্রণায়ও হাসল জয়া। বললে, 'না। অতদূর নয়। শুধু তাঁর নিশ্বাসটা আমার গালের উপর পড়ল।'

'শুধু নিশ্বাসটা?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার কখনো করবে আমাকে? কি, করবে?'

'তা তুমি কী বললে?'

'আমি একটা ঝটকা মেরে তাঁর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, ছিঃ, আপনি সম্ভ্রান্ত বিবাহিত পুরুষ, এ আপনার কী ব্যবহার! পালিয়ে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে।'

যূথিকার মুখে কথা নেই। তাকে চুপ করে যেতে দেখে ভয় পেল জয়া। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বলে খুব অন্যায় করলাম। তাই না? কী দরকার ছিল বলবার! আপনি এত পীড়াপীড়ি করছিলেন—'

'না, বলে ভাল করেছ। শোন—' যূথিকা অভিভাবিকার সুরে বললে, 'তুমি আর আমাদের বাড়ি যেও না।'

'যাব না।' মুখ নিচু করল জয়া।

'আর ওঁকেও বারণ করে দেব যেন এ বাড়ি না আসেন।'

'উনি আর আসেন কই?'

'বলা যায় না। দগ্ধ মাঠ হয়ে গিয়েছেন ত, একটা সবুজ ঘাসের ডগার জন্যে আঁকুপাঁকু করছেন—'

'বেশ ত বারণ করে দেবেন।' পরে আকুল মিনতিমাখা সুরে বললে, 'কিন্তু আমাকে যাহোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, যূথিকাদি। একটা চাকরি পেলেই আমি বেঁচে যাই, ছাড়া পেয়ে যাই—'

'দেখি।' গম্ভীরমুখে যূথিকা বললে.

'তোমাকে শুধু ভালবাসতে ইচ্ছা করে"

'আমাদের ড্রাফটিং ডিপার্টমেণ্টে কজন কপিস্ট নেবে। তুমি একটা দরখাস্ত করে দিও। কপিইংয়ের কাজ করতে পারবে নিশ্চয়—'

'খুব পারব।' উৎসাহে নেচে উঠল জয়া। 'তার পর চাকরি করতে করতে স্টেনোগ্রাফিটা পাশ করে নিতে পারলে—'

'তখন ত লেডি-টাইপিস্ট থোদ বস্-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি—'

কি বুঝল কে জানে, হাসল জয়া।

চাকরি জোগাড় করে আনল যূথিকা। গোড়ায় মাইনে কম, তা হোক—এই দেখ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। পড়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জয়া। ছোটখাট একটা

ইণ্টারভিয়ুও হল না? কম্পিস্টের আবার ইণ্টারভিয়ু! দরখাস্তের হাতের লেখা দেখেই নির্বাচন। সস্ত্রীক সুশীলবাবু আশীর্বাদ করতে লাগলেন যূথিকাকে। জয়া সমস্ত শরীরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল।

এর আর ইণ্টারভিয়ু হয় না। ডিপার্টমেণ্টের বস্‌এর সঙ্গে দেখা করে ডিউটি বুঝে নিয়ে কাজে লেগে গেলেই হল।

'আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।' আবদেরে গলায় বললে জয়া।

'হ্যাঁ, আমিই ত নিয়ে যাব। আর শোন,' একটু ঘন হল যূথিকা : 'বেশ ছিমছাম ফিটফাট থাকবে। ঝিকমিক ঝিকমিক করবে। চট করে বস্‌এর যাতে সুনজরে পড়ে যাও। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যেমন রেওয়াজ তেমনি আওয়াজ। চাকরি করতে আসাই উন্নতির জন্যে। আর উন্নতি মানেই উপরওয়ালার নেকনজর।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমত। এ সব আফিসের এটিকেটই অন্যরকম। বস্‌এর সঙ্গে ফ্রেণ্ডলি হওয়া দরকার।'

'ফ্রেণ্ডলি?' ভুরু কুঁচকাল জয়া।

'হ্যাঁ, হয়ত একটু মোটরে করে বেড়ানো, বাইরে কোথাও একটু খাওয়া, সিনেমা দেখা, কেনাকাটা করা, ছোটখাট প্রেজেণ্ট নেওয়া—এই একটু সাহচর্য, একটু বা প্রেম-প্রেম খেলা—'

'এই বুঝি রীতি?'

'হ্যাঁ, যেমন রতে যেমন কথা। তা না হলে দেখবে নীচের লোক প্রমোশান পেয়ে গেছে আর তুমি পিছনে পড়ে আছ।'

'আপনাকেও অমনি করতে হয়েছে উন্নতির জন্যে?' দ্বিধা করল না জয়া।

'নিশ্চয়। এবং আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ হয়ত বেশি। পুরুষ মানেই ক্লান্ত, অপূর্ণ, বাড়ির বাইরে একটু বাগান চায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটু বা চুটকি রচনা। ঠিক উড়তে না চাইলে হয়ত বা একটু ফুরফুর করতে চায়। তারই জন্যে এক চিলতে আকাশ হওয়া, একফালি মাঠ হওয়া—'

'বুঝেছি।' অচঞ্চল চোখে বললে জয়া। 'দরকার হলে শিখে নেব, জেনে নেব আপনার কাছে।'

'এ আর শেখবার-জানবার কি। মানে আর কিছু নয়, চালাক হওয়া। ইংরিজীতে যাকে বলে ট্যাক্টফুল হওয়া। বিতরণ নয়, একটু বিকিরণ করা। আটসাট কঞ্জুস সংস্কারগুলো একটু ঢিলে করে দেওয়া।' যেন মাস্টার উপদেশ দিচ্ছে এমনি ভাব যূথিকার : 'জল একটু ছুঁক ক্ষতি নেই, মাছ ধরতে না চাইলেই হল—'

চালাক-চালাক চোখে তাকাল জয়া। বললে, 'কিন্তু যদি মাছ ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়?'

'তোমার জানলা নেই? পেপার-ওয়েট নেই? হাতের কব্জি নেই? আর আমি? আমি নেই?'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়া।

'নিজে সাবধান থাকলেই জগৎ সাবধান। তারই মধ্যে যদি হালকা কটা তুলির টানে একটা মরা রঙকে জাগিয়ে দিতে পারি ত মন্দ কি।'

এখানে লিফট ওখানে সিঁড়ি, ঘরে-বারান্দায় প্রকাণ্ড আফিস। জয়াকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল যূথিকা। এখানে-ওখানে কয়েকটা মেয়ে বসেছে কাজ করতে। মাত্রার উপরে রেফের মত দু-একটা বা হাটছে বারান্দায়।

ডিপার্টমেণ্টের বস্‌এর আফিসরুমের বাইরে দাঁড়াল দুজন। জয়ার বুক দুরদুর করতে লাগল।

যূথিকা বললে, 'ভয় কি। ঢুকে পড়। একটু মিষ্টি হেসে নিজেকে ইণ্ট্রডিউস কর, তার পর কি ডিউটি আজ এসাইন করলেন জেনে নাও। যদি একটু বা আলাপ করতে চান একটু অপেক্ষা ক'রো।'

সাহসে ভর করে ঢুকে পড়ল জয়া।

'বসো।' বিভাস বললে।

জয়া ধুলোপড়া সাপের মত স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পরে বসল আচ্ছন্নের মত। একপাশে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

'গোড়ায় এই কটা চিঠি নকল করতে হবে। পর-পর সাজান আছে ফাইলে। হালকা কাজ। হ্যাঁ, শুরুতেই আগে জিগগেস করে নি।' মুখ তুলে পষ্টাপষ্টি তাকাল বিভাস : 'কি, কাজ করবে ত এখানে?'

যে রাত্রি সেই আবার মুখ ফিরিয়ে দিন। মুখ ফেরাল জয়া। হাসিমুখে বললে, 'করব।'

অরণ্যে — শিল্পী : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

সুলোচনার নাম ভদ্রসমাজে পরিচিত হইবার কথা নয়। তবে ভদ্রসমাজে থাকিয়াও যাহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সন্দেহজনক গলিঘুঁজিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহার নাম জানেন। আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার, সুলোচনার মৃত্যুকালে তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কঠিন ব্যাধিতে কয়েক মাস ভুগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স আটত্রিশ কি ঊনচল্লিশ হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি পুরু খাম আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, "ডাক্তার-বাবু, আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আর বড় জোর দু-চার দিন। এটা রাখুন, আমার মৃত্যুর পর খুলে পড়বেন।"

খামের মধ্যে একটি উইল ও একটি দীর্ঘ চিঠি ছিল। উইলে সুলোচনা আমাকে তাহার যথাসর্বস্ব, আন্দাজ ত্রিশ হাজার টাকা, নিঃশর্তে দান করিয়াছে। চিঠিখানা তাহার আত্মকথা। এদেশে পতিতার আত্ম-কথা জাতীয় যে-সব লেখা বাহির হইয়াছে ইহা সে-ধরনের নয়। মানুষের জীবনধারা কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় এই কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। নোংরামিও ইহাতে কিছু নাই। তাই নির্ভয়ে ছাপিতে দিলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে আমি অনেক পুরুষের সংসর্গে এসেছি। সবাই মন্দ লোক নয়, অনেকে দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দু-একজন সত্যিকার সজ্জন ব্যক্তিও দেখেছি। আপনি ডাক্তার, এতে আশ্চর্য হবেন না। কোনও মানুষই নিখুঁত নয়, সত্যিকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরও দোষ-দুর্বলতা থাকে।

আপনি যেদিন প্রথম আমার চিকিৎসা করতে আসেন, সেদিন আপনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি কঠিন ব্যবহার। আপনি কী করে এতবড় ডাক্তার হলেন ভেবে অবাক হলুম। এখন জানি, আপনার কঠিনতার আড়ালে একটি করুণ সদয় হৃদয় আছে, আর আছে রোগ সারাবার অসামান্য ক্ষমতা। আমার রোগ আপনি সারাতে পারেননি, সে দোষ আপনার নয়। প্রথম দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনার মুখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম এ-রোগ সারবার নয়। আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, বলেছিলেন, 'যন্ত্রণার উপশম করতে পারি। তার বেশী কিছু হবে না।'

আপনার কথা মেনে নিয়েছিলুম। আপনি অন্য ডাক্তারকে দেখাতে বলেছিলেন, আমি দেখাইনি। কেন দেখাইনি জানেন? আপনার স্পষ্টবাদিতা ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলুম যদি মরতেই হয় আপনার হাতেই মরব। আপনাকে ভাল লাগার আর-একটা কারণ, আপনাকে দেখে আর-একজনকে মনে পড়ে গিয়েছিল, যিনি ছিলেন আপনার মতই কঠিন আর কঠোর। তাঁর হাতে একবার

মরেছি, এবার শেষ মরা আপনার হাতে মরব।

আমার ঘরের দেয়ালে পাশাপাশি দুটি ছবি টাঙানো আছে। দুটি যুবাপুরুষ। বিশ বছর আগে ও'রা যুবাপুরুষই ছিলেন; একজনের মুখ ফুলের মত নরম, অন্যজনের মুখ পাথরের মত শক্ত। অপরিচিত নগণ্য মানুষ নয়, দেশ-জোড়া ও'দের নাম। দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব; স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ও'রা লড়েছিলেন।

যেদিন প্রথম আপনার দৃষ্টি ওই ছবি-দুটির ওপর পড়ল সেদিন আপনি ভুরু তুলে আমার পানে চেয়েছিলেন। আপনার ভুরু-তোলা প্রশ্নের জবাব তখন দিইনি। আজ এই চিঠিতে জবাব দিচ্ছি। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার এই পাপ-জীবনের সঙ্গে ওই দুটি মহাপ্রাণ দেশ-নেতার কী সম্বন্ধ।

মরবার আগে আমি আমার জীবনের কাহিনী একজন কাউকে শুনিয়ে যেতে চাই। অন্য কাউকে শোনাতে গেলে সে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে, হয়ত ও'দের দুজনের নামে মিথ্যে রটনা করবে। কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি বুঝবেন। ওই বোঝা-টুকুই আমার দরকার।

আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়। বাবা ছিলেন বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানায় এক শহরে উকিল। শুধু উকিল নয়, একজন স্থানীয় জননায়ক। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে-ছিলেন। ওকালতি করার সময় পেতেন না, তাই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সুনাম ছিল দেশজোড়া। বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন, কিন্তু জেলার লোক তাঁর নাম এখনও ভোলেনি।

আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলেজে পড়িনি। বাড়িতে সৎমা ছিলেন। তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না বলেই বোধ হয় আমার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বাবা আমাকে স্নেহ করতেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, তিনি সর্বদা রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকতেন।

ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। সৎমা পাত্র যোগাড় করেছিলেন। বাবা একটু খুঁত-খুঁত করলেন; কিন্তু নিজে ভাল পাত্র খুঁজে বার করার সময় নেই তাঁর। তিনি খুঁতখুঁত করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের মাস তিন-চার পরে স্বামী মারা গেলেন। তাঁর চালচুলো ছিল না, ছিল গুপ্ত ক্যান্সার রোগ; বিয়ের পর ধরা পড়ল। সৎমা নিশ্চয় রোগের কথা জানতেন না, জানলে যত আক্রোশই থাক, বিয়ে দিতেন না। আমাকে বিদেয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু চার মাস পরে বিধবা হয়ে আমি আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলুম। সংসারের হাওয়া বিষিয়ে উঠল।

সংসারের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল আমার। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে শহরে প্রায়ই সভা-সমিতি হত। ছেলেবেলা থেকেই আমি সভা-সমিতির অধিবেশনে গান গাইতুম। আমার গলা ভাল ছিল, সবাই প্রশংসা করতেন। বিধবা হবার পরও আমার সভায় গান গাওয়া বন্ধ হল না। থান পরে যেতুম, গান গাইতুম। বাবা বলতেন, 'দেশের কাজে নিজের দুঃখ ভুলে যাও।' তিনি নিজে আমার অকাল-বৈধব্যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই আমাকে এবং নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করতেন।

আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি। বাবার উপদেশ আমার কানে যেত, কিন্তু মন পর্যন্ত পেঁছুত না। রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁদের দেখতাম, মনটা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু আমি বিধবা; তাঁরা আমার পানে উৎসুক চোখে তাকালেও কেউ এগিয়ে আসতেন না।

এইভাবে বছর দেড়েক কাটল। তার পর দুজন যুবাপুরুষ এলেন আমাদের শহরে। তরুণ বয়স, কিন্তু দেশজোড়া নাম। দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাঁদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে; তাঁরা হাত পাতলে মেয়েরা হাজার হাজার টাকার গয়না গা থেকে খুলে দেয়। তাঁরা দুজন যেন জোড়ের পাখি; একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে কাজ করেন; অনেকবার একসঙ্গে জেল খেটেছেন। লোকে বলত, মাণিকজোড়। কেউ বলত, রাম-লক্ষ্মণ। কেউ বলত, কানাই-বলাই।

আমি তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলব। দুজনের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। রাম ছিলেন নরম-সরম, নবজলধর কান্তি; ভারি মিষ্টি চেহারা। আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন; টকটকে রঙ, লম্বাচওড়া কঠিন দেহ; মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

আমি দুজনকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। একথা সাধারণ লোক হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আমার মনের কৌমার্য তখনও নষ্ট হয়নি, হৃদয় ভালবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাই এ'রা দুজন যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন বাছ-বিচার করতে পারলুম না, দুজনের পায়ের কাছেই আমার হৃদয়-মন ঢেলে দিলাম। যিনি আমাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নেবেন আমি তাঁরই।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলবে; দেশের গণ্যমান্য সব নেতাই এসেছেন। স্থানীয় দেশ-সেবকদের বাড়িতে নেতাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে; কারুর বাড়িতে দুজন, কারুর বাড়িতে তিনজন। আমাদের বাড়িতে উঠেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। বাইরের একটা ঘর ও'দের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি। সারাক্ষণ তাঁদের সেবা করছি। আমার সৎমা ছিলেন গোঁড়াপ্রকৃতির মানুষ, পর্দার আড়াল ছাড়েননি; স্বাধীনতা-আন্দোলনেও বেশী সহানুভূতি ছিল না। তাই আমিই অষ্টপ্রহর অন্দর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতুম। যত-ক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ বাড়িতে থাকতেন আমি তাঁদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতুম। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা, স্নানের আয়োজন, মাথার তেল, আয়না চিরুনি, বিছানা পাতা, বিছানা তোলা—সব আমি করতুম। শরীরে ক্লান্তি আসত না, মনে হত ধন্য হয়ে গেলুম।

রাম-লক্ষ্মণ কেবল আমার সেবা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমার সভায় যাবার অবকাশ ছিল না, তাই তাঁরা আমায় সভার গল্প করতেন। লক্ষ্মণ ভারি গম্ভীর মানুষ, তিনি বেশী কথা বলতেন না; কিন্তু রাম বলতেন। ভারি মজার কথা বলতেন তিনি, মনটা ছিল রঙ্গরসে ভরপুর। সভায় কে কত গরম বক্তৃতা দিলে, কার ওপর পুলিসের নজর বেশী, এই সব কথা বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। আমার সঙ্গেও রঙ্গ-রসিকতা করতেন। বলতেন, 'সুলোচনা, তুমি আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে যে-রকম-তাজা করে রেখেছ তোমাকেই আগে পুলিসে ধরবে; ক্যাঁক করে ধরে হাজতে পুরবে।'

লক্ষ্মণ ঠাট্টা-তামাসা করতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি সর্বদা আমাকে লক্ষ্য করত, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করত। আমার বুক গুরগুর করতে থাকত। কাকে যে বেশী ভাল লাগে, বুঝে উঠতে পারতুম না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা রাম হঠাৎ সভা থেকে ফিরে এলেন। আমি তখন ও'দের ঘরেই ছিলাম, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা কর-ছিলুম; তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি ক্লান্তভাবে বিছানায় বসে বললেন, 'সুলোচনা, আজ ঝাড়া দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারবে?'

আমি ছুটে গিয়ে চা তৈরি করে আনলুম। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন, উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এক চুমুক চা খেয়ে করুণ চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনের সদর-মহলে পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল। অন্দর-মহলের খবর নেওয়া হল না।'

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।
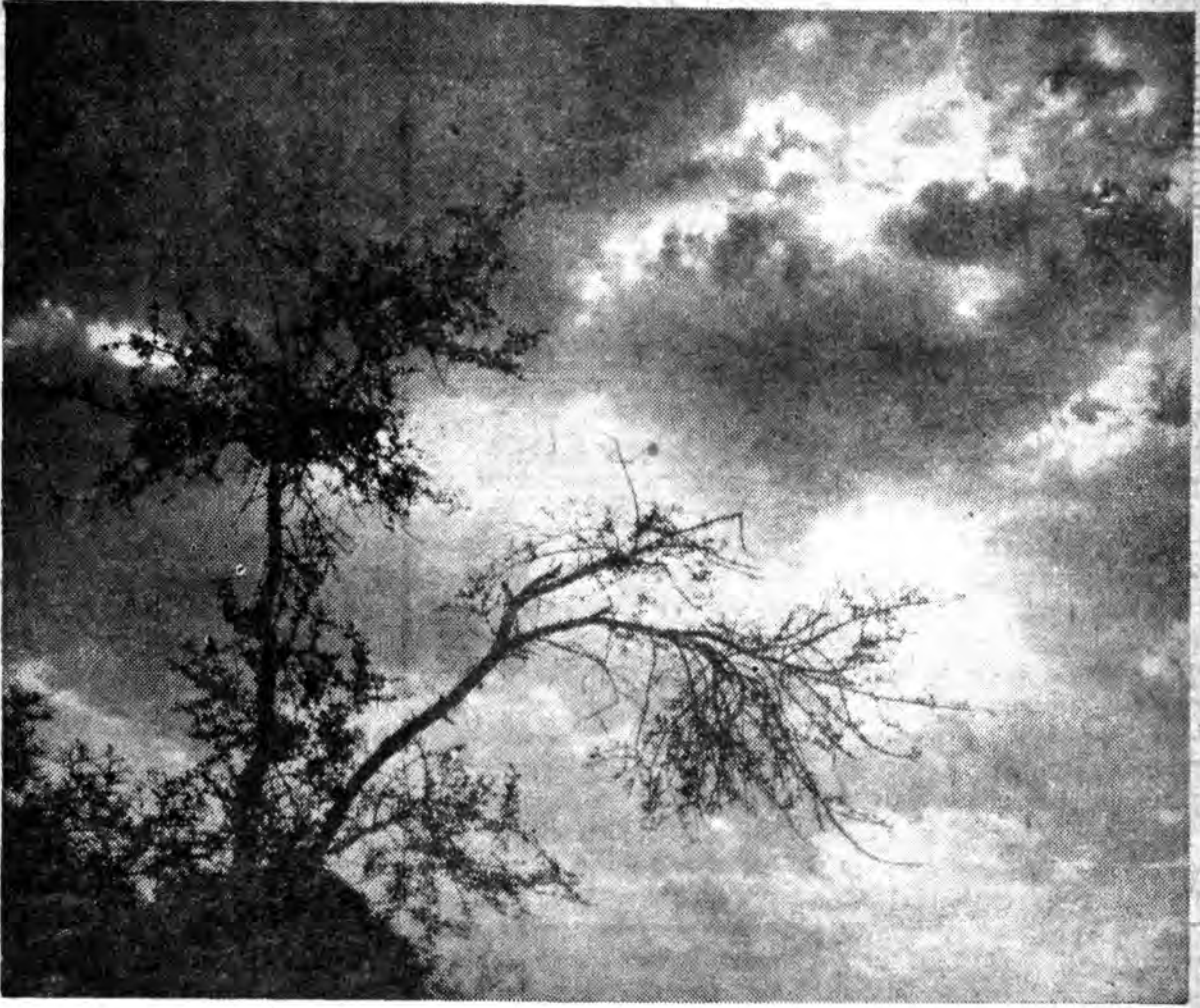
মেঘের পরে মেঘ আলোকচিত্রী ঃ আনন্দ মুখোপাধ্যায়

তিনি আবার বললেন, 'অন্দর-মহলে যে এত মিষ্টি জিনিস আছে তা আগে জানলে হয়ত সদর-মহলে আসাই হত না।'

এই সময় আমার সৎমা দরজার বাইরে থেকে খাটো গলায় ডাকলেন, 'সুলোচনা, এদিকে শুনে যাও।'

বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল; সেই সঙ্গে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। কোনও রকমে ঘরের বাইরে এলুম। সৎমা আমাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার প্যানে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, 'ভুলে যেও না তুমি বিধবা।'

এইটুকু বলে তিনি চলে গেলেন; আমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিধবা।

শুয়ে শুয়ে মন বিদ্রোহ করল। বিধবা ত কী? আমার রূপ আমার যৌবন আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এ-সবের? আমি কি কাগজের ফুল, চীনে-মাটির পুতুল? না, আমি চীনে-মাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই, সম্ভ্রম চাই—

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি। সৎমা'র গলা শুনতে পেলাম—'বিছানায় শুয়ে থাকলে সংসার চলে না। তোমার বাপ সভা থেকে ফিরে এসেছেন, আরও সবাই এসেছেন। তাঁদের চা-জলখাবার দিতে হবে।'

বাইরের ঘরে আট-দশ জন দেশনেতা জমা হয়েছেন। বেশীর ভাগই প্রবীণ; রাম-লক্ষ্মণও আছেন। রাজনীতির তীব্র আলোচনা হচ্ছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সকলকে চা-জলখাবার দিলুম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করলেন না, এমন কি রামও না। কেবল লক্ষ্মণের ধারাল চোখ দুটি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল।

অনেক রাত্রে বৈঠক ভাঙল। সে-রাত্রে আমি কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। ভয় করছে, আবার উত্তেজনায় মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে। রাম আর লক্ষ্মণ দুজনেই কি আমাকে চান? বুঝতে পারছি না। আমি ওঁদের মধ্যে কাকে চাই? তাও বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে ওঁরা সভায় চলে গেলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আজ আর কাল দু দিন বাকী। তার পর সবাই চলে যাবেন। আর আমি—?

দুপুরবেলা রাম ফিরে এলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে বললেন, 'আজ আর কোনও কাজ হল না, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।'

তিনি নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে

চোখ বুজে রইলেন। আমি কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'চা আনব?'

তিনি চোখ খুলে একটু হাসলেন : 'না, দরকার নেই। তুমি বরং আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

ডাক্তারবাবু, মানুষের দেহ-মনের সব খবরই আপনি জানেন, তাই আমার তখনকার দেহ-মনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে আপনার ধৈর্যের ওপর জুলুম করব না। পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে হিন্দু মেয়ের মনে তীক্ষ্ণ সচেতনতা আছে আপনি জানেন।......আমি খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ঘন কোঁকড়া চুল, সিঁথি নেই, কেবল কপাল থেকে পিছন দিকে বুরুশ করা।......

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার পানে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে কতকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'আমাদের সমাজে বিধবার এত অমর্যাদা কেন? কী অপরাধ বিধবার? স্বামী মরে গেলেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যাবে কেন? তার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই; একটু ছুতো পেলেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য সভ্য সমাজে কিন্তু এ-রকম নেই, বিধবা হবার দোষে কোনও মেয়ের জাত যায় না—'

আমি সমস্ত শরীর শক্ত করে শুনছি, এমন সময় লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মুখ অন্ধকার: চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রামের পানে একবার তাকালেন, তার পর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্যে এক পেয়ালা চা আনতে পারবে?'

আমি চোরের মত পালিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পনরো মিনিট পরে দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলুম, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে দুজনের চাপা গলার আওয়াজ আসছে। চাপা গলা হলেও আওয়াজ নরম নয়, করাতের শব্দের মত কর্কশ। ওঁদের মধ্যে চাপা গলায় বচসা হচ্ছে। কথা সব বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হল লক্ষ্মণ বলছেন, 'তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ—'

দোরে টোকা দিতে সাহস হল না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলুম। রান্নাঘরে একলা বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই কি দুই বন্ধুর মধ্যে—! তবে কি ওঁরা দুজনেই আমাকে চান?

সন্ধ্যার পর আজও বৈঠক বসল, খুব তর্কাতর্কি হল। রাম আর লক্ষ্মণ কিন্তু ঘরের দুই কোণে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন, আলোচনায় যোগ দিলেন না। কেবল আমি যখন সকলকে চা দেবার জন্যে ঘরে এলুম তখন তাঁদের চোখ আমার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্রি নটা আন্দাজ বৈঠক ভাঙল, সকলে উঠলেন। বাবা আর রাম অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাড়ির সদরে লক্ষ্মণ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ লক্ষ্মণ আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি চমকে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ়স্বরে বললেন, 'সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু এখন নয়। কাল আমাদের সভার অধিবেশন শেষ হবে, তারপর বলব। তুমি তৈরী থেক। যাও, এখন ভেতরে যাও। কাউকে কিছু বোল না।'

আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল; অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলুম।

সারা রাত জেগে শুধু ভাবলুম, কী কথা বলবেন আমাকে? কিসের জন্যে তৈরী থাকব?

পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ লেগে গেল। আজ সভার শেষ অধিবেশন, এলোমেলো নানা কাজ হবে। তার ওপর গুজব রটে গেছে যে, কয়েকজন নেতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। ভোর থেকে বাড়িতে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বাবা চা খেয়েই রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, 'তুমিও এস। সভায় বন্দে মাতরম্ গাইবে।'

সেদিন বন্দে মাতরম্ গাওয়া কিন্তু আমার হল না। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, চারিদিকে পুলিস গিস গিস করছে; জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!

তিন-চার জন বড় বড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন; তার মধ্যে রাম একজন। লক্ষ্মণ গ্রেপ্তার হননি। আমি যখন উপস্থিত হলুম তখন পুলিস বন্দীদের নিয়ে মোটরে তোলবার উপক্রম করছে। বন্দীদের সকলের মুখে উদ্দীপ্ত হাসি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রাম ফিরে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে চারিদিকে চোখ ফেরালেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। তার পর তাঁর চোখ পড়ল আমার ওপর। তিনি একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন, মুখের উদ্দীপ্ত হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। ইংরেজের জেল আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

বন্দীদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। তারপর সভায় কী হল আমি জানি না, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলুম। সভায় আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা সবাই সেদিন কেঁদেছিল; আমার চোখের জল কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার চোখের জলের উৎস যে আরও গভীর তা কেউ জানতে পারল না। কেবল, বাড়ি ফিরে আসবার পর, সৎমা আমাকে কাঁদতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।'

ইচ্ছে হল, বাড়ি ছেড়ে ছুটে কোথাও চলে যাই। বিধাতা যে অলক্ষ্যে সেই ব্যবস্থাই করছেন তা ত তখন জানতুম না।

দুপুরবেলা লক্ষ্মণ বাড়ি এলেন। মুখ বিষণ্ণ কঠিন। আমার পানে খানিক তাকিয়ে রইলেন, মুখ একটু নরম হল। আবার বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ বোঝা যায় না। আমি কেবল সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবনে জেল-খানা ঘর-বাড়ি ওতে বিচলিত হলে চলে না। আমাকেও হয়ত আজ নয় কাল যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ সেরে নেওয়া চাই। —সুলোচনা!'

ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে চাইলুম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন : 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?'

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'যাব।'

'স্বেচ্ছায় যাবে? আমি জোর করছি না।'

'যাব।'

'হয়ত যা আশা করছ তা পাবে না। তবু যাবে?'

'যাব।'

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন; চোখ দুটি যেন করুণায় ভরে উঠল। তারপর আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েই বললেন, বেশ। এখন আমি যাচ্ছি। রাত্রে আবার ফিরে আসব। বারোটার পর। গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি তৈরী থেক।'

'আচ্ছা।'

তিনি চলে গেলেন।

সেদিনের কথা এখন ভাবলে মনে হয়, কেন তাঁর কথার মানে বুঝিনি। তিনি ত ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর অটল হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে টলে গিয়েছিল। সেদিন যদি আমি 'না' বলতুম! যদি বলতুম—যাব না তোমার সঙ্গে, যিনি জেলে গেছেন তাঁর জন্যে

প্রতীক্ষা করব। তা হলে আমার জীবনটাই অন্য পথে যেত। কিন্তু তা ত হবার নয়। আমি যে ও'দের দুজনকেই সমান ভাবে চেয়েছিলুম। সত্মা যে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পালান ছাড়া আমার গতি ছিল না।

দুপুর রাত্রে তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তৈরী ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নিরুদ্দেশের পথে অভিসার শুরু হল।

প্রথমে রেলের স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাশী। ডাক্তারবাবু, শেষ কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। সব কথা খুঁটিয়ে লিখতে ক্লান্তি আসছে।

লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা সরু গলিতে অন্ধকার একটা বাড়িতে তুললেন। আধবয়সী একজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, একটা সাজানো ঘরে বসাল। লক্ষ্মণ ঠিকে গাড়ির ভাড়া মেটাবার জন্যে পিছিয়ে ছিলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এলেন না। আধবয়সী স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করলুম, সে বলল, 'আসবেন, বাছা আসবেন। কত বাবু-ভায়েরা আসবেন। নাও এই শরবতটুকু খেয়ে ফেল। তেষ্টার সময়, শরীর ঠান্ডা হবে।'

সেই রাত্রে আমার জীবনে বেঁচে থাকার পালা শেষ হল, প্রেত-জীবন আরম্ভ হল। ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মণ এলেন। তাঁকে দেখে আমি কেঁদে উঠলুম : 'আপনি আমার এই সর্বনাশ করলেন!'

তিনি নীরস নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার যে-সর্বনাশ করেছি তার জন্য ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমার বন্ধুকে বাঁচাবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছিলুম?'

'অপরাধ কেউ করেনি। তুমি আমার বন্ধুকে চেন না, আমি তাকে চিনি। তার মন তোমার দিকে ঝুঁকেছিল; আমি যদি তোমাকে চিরদিনের জন্যে তার সামনে থেকে সরিয়ে না দিতাম, সে হয়ত তোমাকে বিয়ে করত।'

'তাতে কি এতই ক্ষতি হত?'

'ক্ষতি হত। তার সর্বনাশ হত, দেশের সর্বনাশ হত। তাকে আমি জানি। তার মন একবার যেদিকে ঝুঁকবে সেদিক থেকে আর তাকে নড়ানো যাবে না। তার মনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাঁচ ভাগ করে পাঁচ দিকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তোমাকে বিয়ে করত, তা হলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।'

'কিন্তু আমার কী হবে?'

'দেশের জন্যে অনেকে আত্মবলি দিয়েছে; যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কিসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি। —চললাম। আর দেখা হবে না।'

তিনি চলে গেলেন।

তার পর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেদিন আমার যে-জীবন আরম্ভ হয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। আমার ঘরের দেয়ালে যে-দুটি ছবি দেখে আপনি ভুরু তুলেছিলেন তার মানে বোধ হয় এখন বুঝতে পারছেন। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে; ও'রা দুজন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ও'দের নাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ও'দের আমি আর দেখিনি, কেবল ছবি টাঙিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কথা কি ও'দের মনে পড়ে? দেশের কল্যাণে যিনি আমাকে নরকের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আমার কথা মনে পড়লে তাঁর মন কি বেদনায় টনটন করে ওঠে?

কিন্তু আমার কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। সবই আমার ভাগ্য, আমার জন্মান্তরের কর্মফল। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না?—

এবার শেষ করি। ডাক্তারবাবু, আমার পাপ-জীবনের সঞ্চয় মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনার নিজের টাকার দরকার নেই জানি। কিন্তু আমার টাকাকে আপনি ঘৃণা করবেন না। টাকা কখনও নোংরা হয় না ডাক্তার-বাবু। যত নোংরা স্থান থেকেই আসুক, টাকায় কলঙ্ক লাগে না। আপনি আমার টাকা নিজের বিবেচনামত সৎকার্যে ব্যয় করবেন।

আপনি আমার অন্তিম প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সুলোচনা

ডাক্তারের ফুটনোট :—সুলোচনার টাকা আমার হাতে আসিলে আমি তাহা 'লক্ষ্মণের' নামে বেনামী চাঁদারূপে পাঠাইয়া দিয়াছি। 'লক্ষ্মণ' কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় এই টাকার সদ্‌গতি করিতে পারিবেন।

মোসলেম ভাস্কর্য

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
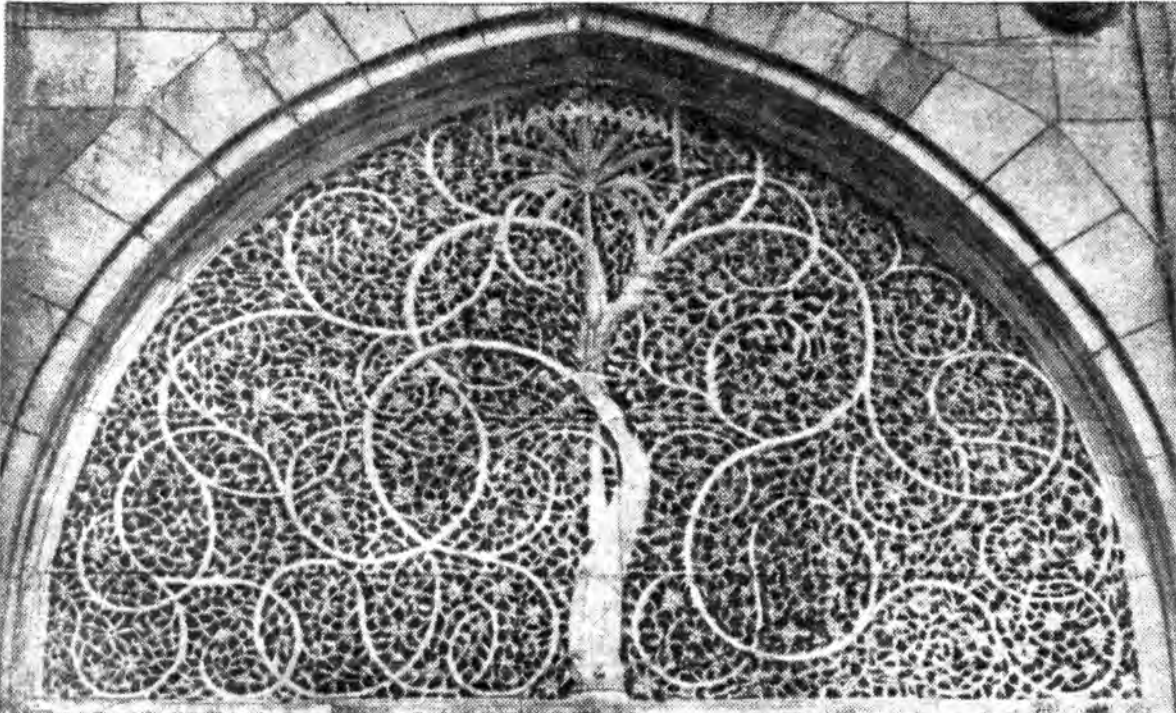
স্কর্য বলতে যদি পাথর, পোড়ামাটি, ধাতু বা অন্য উপকরণে মূর্তিরচনাকেই বুঝি, তা হলে মোসলেম ভাস্কর্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ইসলামে মূর্তি-রচনা গুণাহ্। ইসলামের ধর্ম-আচরণের নীতি অনুসারে যে কোন প্রাণীর অবয়ব অঙ্কন বা রচনায় বারণ আছে।

এ-কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে ইসলাম মনে প্রাণে পৌত্তলিকতা-বিরোধী। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে, আরব উপদ্বীপের সাবেক ধর্মপ্রথায় যে-পৌত্তলিকতার খাদ ছিল, তাকে চিরতরে বিনষ্ট করবার জন্যই ইসলামকে এতটা খড়্গহস্ত হতে হয়েছে। কে জানে কখন কোন্ ছুতোয় চাপা-পড়া মূর্তিপূজার বীজ আবার হয়ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এই প্রথার প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে যাবতীয় প্রাণীমূর্তিকে বরবাদ করতে হয়। ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম যুগে এই নিষেধ যথেষ্ট কড়াকড়ির সঙ্গে পালন করাও হয়েছে। অবশ্য, শেষের দিকে, বিশেষ করে ভারতীয় মুঘল আমলে, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহানের কালে এই নীতির যে প্রচুর ব্যতিক্রম ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ, অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে, শুধু মুঘল চিত্রকলার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। স্বল্পাকৃতি এই বর্ণচিত্রগুলির বেলায়, আকবর ও বিশেষ করে জাহাঙ্গীর ও শাহজহান, সকলেই সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী কালের ধর্মীয় অনুশাসন, অন্ততঃ এই শিল্পকৃতিগুলির বেলায় তাঁরা মানেননি। মুঘল দরবারে মাইনে-করা চিত্রকরেরা যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছেন এবং তাঁদের শিল্পকর্ম শুধুমাত্র নির্জীব বিষয়বস্তুতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না এ-কথা সকলেই জানেন। তাঁদের অঙ্কিত বহু পট ও বর্ণচিত্র এখনও বর্তমান। সেগুলিতে বাদশাহ্, মন্ত্রী, আমীর, অমরাহ্, সুবাদার, সেনাপতি, এমন কি রাজকীয় আস্তাবলের পেয়ারের হাতি-ঘোড়ার ছবি অবধি স্থান পেয়েছে। স্থান পাননি শুধু হারেম-সুন্দরীরা। ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য ততটা নয়, যতটা পর্দার খাতিরে তাঁদের বাদ পড়তে হয়েছে।

কিন্তু মুঘল পেইণ্টিংয়ের বেলায় এই-জাতীয় লঘু নীতি অনুসৃত হলেও, মোসলেম ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কখনই রাস এতটা আলগা হতে দেওয়া হয়নি। ফলে, মুসলমান স্থপতি ও ভাস্করেরা প্রতিভা-বিকাশের নিদারুণ তাগিদে প্রকারান্তর খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন।

হিন্দু ভাস্করেরা যখন পৌরাণিক কাহিনী আর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মূর্তিতে তাঁদের মন্দিরের দেওয়ালগুলি ভরিয়ে তুলবার অবকাশ পেয়েছেন; সুর-সুন্দরীদের অপরূপ লাস্য-ভঙ্গিমায় যখন অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের সাধের সৌধগুলি, তখন মুসলমান শিল্পীদের তুষ্ট থাকতে হয়েছে শুধু ফুল, লতা, পাতা আর জ্যামিতিক নক্সা নিয়ে। এর সুফল হয়েছে এই যে, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ ভাস্করেরা মূর্তিকলার অগাধ ঐশ্বর্যে অবগাহন করবার সুযোগ পেয়ে যখন এই পরিধির বাইরের বিষয়বস্তু আহরণ করবার তাগিদ সাধারণত অনুভব করেননি, তখন মুসলমান ভাস্করদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে দিকে দিকে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। এই অন্বেষণ যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ অজস্র।

সব প্রথমে আলংকারিক লিপিশিল্পের (calligraphy-র) কথাই ধরি, যদিও মোসলেম জগতে ভাস্কর্য থেকে হাতে-লেখা

ধর্ম-পুস্তকের ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ হয়েছে বেশী। এই অপরূপ শিল্পকলাটির কোনও হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ তুলনা নেই। নিছক প্রয়োজনের অভাবেই অ-মুসলমান শিল্পীরা এদিকে দৃষ্টি দেননি, কেননা ভাস্কর্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুতে তাঁদের ঘাটতি পড়েনি কোনদিন। কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট হতে না দিয়ে, মোসলেম শিল্পবিদেরা হস্তলিপির আলংকারিক ব্যঞ্জনাময় রূপটিকে সাদরে আহ্বান করে এনেছেন চিত্রকলার জগতে, ভাস্কর্যের আঙিনায়। এবং সে-প্রচেষ্টা যে কতদূর সফল হয়েছে সে-কথা কোরাণের অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি বা দিল্লির কুতুব-মহল্লা বা আজমীরের আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া মসজিদের সুললিত ভাস্কর্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে, মালদহের পাণ্ডুয়ায় এবং সিকান্দ্রায় আকবরের কবরেও এই ধরনের ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। খোদাই-করা পাথরে এই অলংকারলিপির প্রয়োগকে ভাস্কর্য ছাড়া আর কী বলব? মূর্তি-রচনা থেকে এ-শিল্প সম্পূর্ণ পৃথক। তবু যে আশ্চর্য মুনশীয়ানায় বহু মোসলেম স্থাপত্যের সঙ্গে এই অপূর্ব অলংকরণকে খাপ-খাওয়ানো হয়েছে, তাতে এগুলিকে অতি উচ্চস্তরের ভাস্কর্য ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না।

মুসলমান ভাস্করদের প্রতিভা আর-এক অভিনব দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যেখানে অ-মুসলমান শিল্পীদের অবদান নেই বললেই চলে। আমি এনামেল করা টালি দিয়ে স্থাপত্যের বহিরঙ্গকে বর্ণসজ্জিত করবার রীতির কথা বলছি। এ-শিল্পের জন্ম ইরাণ দেশে হলেও, পরবর্তী কালে এর ব্যবহার সমগ্র মোসলেম-জগতেই ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন থেকে ভারতবর্ষ অবধি এই ভাস্কর্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। গৌড়ের কয়েকটি মসজিদে, আগ্রার চিনিকা-রউজাতে ও লাহোরের বিখ্যাত দুর্গে এই শিল্পকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে। ছোট ছোট টালির সমতল পিঠের একদিক কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিচিত্রবর্ণের এনামেলে সজ্জিত করা হত। সে-প্রসঙ্গ এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে আলোচনা করবার অবকাশ নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই রঙিন টালিগুলিকে পাশাপাশি সজ্জিত করে অতি সুচারু জ্যামিতিক নক্সাই শুধু সৃষ্টি করা হয়নি, ফুল, লতাপাতা, বিবিধ প্রাণী-চিত্র, এমনকি শিকারের জটিল দৃশ্য অবধি অঙ্কিত করা হয়েছে।

এই টালি-সজ্জা থেকে আর-এক ধাপ এগিয়ে মুসলমান শিল্পীরা মার্বেল মোজায়েক ও পিয়েত্রা-দুরার মনোমুগ্ধকর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। কাশ্মীরী কাঠের টেবিলের উপর হাতির দাঁতের কাজ অনেকেই দেখে থাকবেন। পূর্বকল্পিত নক্সা অনুসারে, নরুনের মত সরু ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাঠ খোদাই করে নিয়ে সেই খাতে হাতির দাঁতের পাতলা চিলতে বসিয়ে দেওয়াই এই শিল্পের পদ্ধতি। অনুরূপ-ভাবে, এক রঙের মার্বেলকে খোদাই করে সেই গর্তে অন্য বিবিধ রঙের মার্বেলের টুকরো নিপুণভাবে বসিয়ে দেওয়ার শিল্পকে মার্বেল-মোজায়েক বলতে পারি। পিয়েত্রা-দুরার ক্ষেত্রে, খোদাই-করা মার্বেলের গহ্বরে অন্য রঙের মার্বেল না বসিয়ে, মূল্যবান প্রস্তর যেমন, চুনি, পান্না, পোখরাজ বৈদূর্যমণি প্রভৃতির সমাবেশে চিত্ররচনাই রীতি ছিল। আগ্রার ইতিমদ্-উদ্দৌলায় ও সিকান্দ্রার আকবরের সমাধিসৌধে মার্বেল-মোজায়েকের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। আর পিয়েত্রা দুরার অলংকরণে তাজমহলকে একদা যে-রকম অপর্যাপ্তভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল, তেমনটি বোধ করি আর-কোথাও হয়নি।

পারস্য-জাত এই সুকুমার ভাস্কর্যরীতি দুটি জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহানের আমলেই ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসারলাভ করে। কোন কোন সমালোচক পিয়েত্রা-দুরার রীতিটিকে ইটালির ফ্লোরেন্স থেকে আমদানি বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে তাজমহলের অঙ্গসজ্জার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন অস্টিন-দা-বর্দো নামে এক ফ্লোরেন্সবাসী শিল্পী। একথা মনে করবার কোন ঐতিহাসিক কারণ নেই যে এই বিদেশী শিল্পীটির ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতীয় কারিগরেরা পিয়েত্রা-দুরা পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। মার্বেল মোজায়েক থেকে পিয়েত্রা-দুরা মূলত পৃথক নয়। পার্থক্য শুধু বহুমূল্য পাথরের ব্যবহারে। মুঘল আমলে ইমারত তৈরির অজুহাতে যে-অর্থের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তাতে নিছক আর্থিক কারণে পিয়েত্রা-দুরা পদ্ধতির সূচনা তাজ-মহল নির্মাণের সময় অবধি অপেক্ষা করে ছিল এ-কথা মনে হয় না। অস্টিন-দা-বর্দো স্থানীয় শিল্পীদের কারুকলার উপরে আরও কিছু রঙ-পালিশ চড়িয়েছিলেন এইমাত্র।

পিয়েত্রা-দুরার ফুল, লতাপাতা বা জ্যামিতিক অলংকরণের সমারোহে তাজমহল বা অন্যান্য মুঘল সৌধ একদা যে-অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত ছিল আজ তা চেষ্টা করে আন্দাজ করতে হয়। খোদাই করে বসানো মণিরত্ন চুরি হয়ে গিয়েছে বহুকাল। তার জায়গায় বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে সস্তা উপকরণ দিয়ে। সাবেক ঔজ্জ্বল্যের আজ আর-কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই; শুধু নক্সা-গুলির অপরূপ বিন্যাস ধারণা করা যায় মাত্র।

পাথর খোদাই করে যেখানে রূপসৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছে, আগেই বলেছি, মুসলমান ভাস্করদের সেখানে নিষেধের ডোরে বাঁধা হয়েছে পদে পদে। মূর্তি রচনার অসীম ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হয়েও তাঁরা শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্সা ও ক্বচিৎ কদাচিৎ পশু-পাখি, প্রজাপতি প্রভৃতিকে উপজীব্য করে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। হিন্দু-ভাস্কর্যেও পত্র-পুষ্পের স্থান আছে এবং সে-স্থান কিছুমাত্র নগণ্য নয়। তুলনায়, মোসলেম কৃতিত্বগুলির থেকে তা হীন না সরেস, সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। উভয়
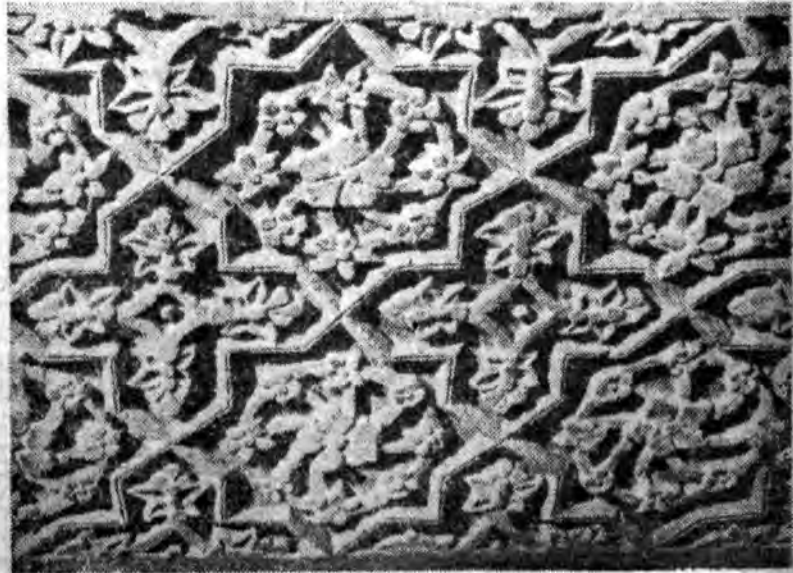
জ্যামিতিক ভাস্কর্য : ফতেপুর সিক্রি

গোষ্ঠীর কারিগরেরাই এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গুপ্ত বা হয়সালা ভাস্কর্যের তুলনায় আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির খোদাই পাথরের মোসলেম ভাস্কর্যগুলি নিতান্ত নিকৃষ্ট নয়। তবে এ-কথা স্পষ্ট যে মোসলেম ভাস্কর্যের নক্সাগুলির উপর হয়সালা ভাস্কর্যের মত অতি-অলংকরণের গুরুভার চাপানো হয়নি। সহজ, সরল ও পরিচ্ছন্ন কারিগরি মোসলেম ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য। এ-ছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে; পাথরের উপর জ্যামিতিক চিত্রাংকণ মোসলেম ভাস্কর্যের একচেটিয়া, যার কোন হিন্দু তুলনা নেই। সারনাথের ধামেকস্তূপে যে-জ্যামিতিক নক্সাগুলির অস্তিত্ব এখন লুপ্তপ্রায়, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ শিল্পক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম মাত্র। মোসলেম ভাস্কর্যের এলাকায় জ্যামিতিক রূপায়ণের যে-এলাহী কারবার হয়েছে, অন্যত্র তার ভগ্নাংশমাত্র হয়েছে কিনা সন্দেহ।

শ্বেত-পাথর বা বালি-পাথরে ছিদ্র করে জালি বা জাফরির কাজকে জ্যামিতিক ভাস্কর্যের অগ্রসর রূপ বলতে পারি। পদ্ধতি মোটামুটি একই। সমতল পাথরের টুকরোর উপর নক্সা এঁকে নিয়ে অসীম ধৈর্যে বাটালি চালাতে হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। জাফরির কাজে অবশ্য ধৈর্য ও সাবধানতা অনেক বেশী প্রয়োজন হয়েছে, কেননা, এ-পিঠ ও-পিঠ অসংখ্য ছিদ্র করবার সময়ে পাথর ভেঙে যাবার আশংকা থাকত সর্বক্ষণই। এই জালির কাজের হিন্দু-তুলনা যে একেবারেই নেই তা নয়। খাজুরাহো বা হালেবিড়-বেলুড়ের মন্দিরগুলিতে এই-জাতীয় ভাস্কর্য অল্পবিস্তর আছে যা সমপর্যায়ের মোসলেম শিল্পনিদর্শনগুলির তুলনায় অতিশয় নগণ্য। জাফরির কাজে অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যই অধিকাংশ হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহগুলি অন্ধ-কুঠরিতে পরিণত হয়েছে। আলো প্রবেশের এই আচ্ছাদিত বাতায়নের কল্পনাটিকে মোসলেম ভাস্করেরা যে চূড়ান্ত রূপসৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তা আগ্রার ইতিমদ-উদ্-দৌলা, ফতেপুরসিক্রির শেখ সলিম চিস্তির কবর ও আহমদাবাদের সিদি সৈয়দ মসজিদের জাফরির কাজ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন।

প্রসঙ্গত, একটি কথা বলে এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধ শেষ করব। অম্বরের যশোরেশ্বরী কালীর মন্দিরে শ্বেত-পাথরের উপর অপূর্ব জালির কাজ আছে। এগুলির কারিগরও হিন্দু, যেমন অধিকাংশ মোসলেম ভাস্কর্যের কারিগরও হিন্দুই ছিলেন। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি। একমাত্র রঙিন টালির কাজ ছাড়া, মুসলমান শিল্প-নির্দেশকদের ভারতীয় অ-মুসলমান কারিগরদের উপর প্রভূতভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। ভাস্কর্যের কোন পদ্ধতিতেই এদেশীয় মিস্ত্রীরা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ফলে, নতুন প্রণালী আয়ত্ত করতে তাঁদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। এ-প্রবন্ধে মোসলেম ভাস্কর্য বলতে আমি এ-কথা বোঝাতে চাই না যে, এই চারুকলার আগাগোড়া—মায় পরিকল্পনা থেকে খোদাই পর্যন্ত—কেবলমাত্র মুসলমান কর্মীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়েছে। বস্তুত, ভারতীয় মোসলেম ভাস্কর্য বলতে আমি এ-কথা সমন্বয়: তার একটি মুসলমান শিল্প-স্রষ্টাদের অনুপ্রেরণা, অপরটি (প্রধানত) অ-মুসলমান কারিগরদের দক্ষতা।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

লিপিভাস্কর্য : কুতুবমিনার

কণ্ঠকণ্ডূতি

সতীনাথ ভাদুড়ী
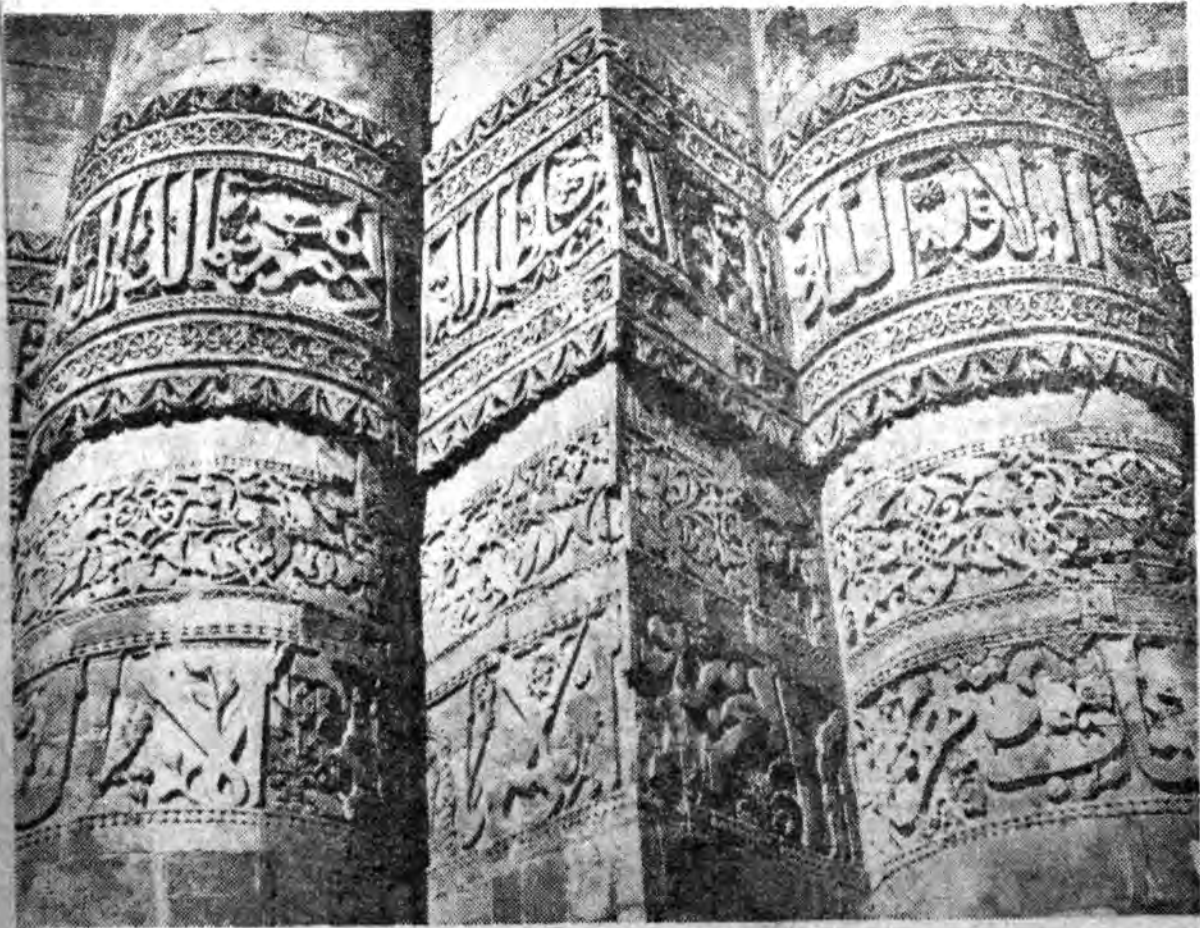
মাইক-এর নীচের একটা টিনের চাকতির উপর বড় বড় করে লেখা "জিরানিয়া-কোয়ল", অর্থাৎ জিরানিয়া জেলার কোকিল। যে দোকান থেকে মাইক আর লাউডস্পীকার ভাড়া করা হয়েছে সেই দোকানের নাম। আবার যাঁর দোকান তাঁরও নাম ওই. লোকে সংক্ষেপে বলে কোয়লজী। শহরের সবাই দেখেছে. সেই দোকানের সাইনবোর্ডের নীচেই ঝোলান থাকে একটা খাঁচা. সকালে বিকালে। খাঁচার বাসিন্দা একটা পোষা ঘুঘু পাখি। অদ্ভুত শখ কোয়লজীর। ত্রিভুবনে আর কেউ কোথাও ঘুঘু পুষেছে কিনা সেকথা এখানকার কারও জানা নাই। তারা জিজ্ঞাসা করে—একটা কোকিল পুষলেন না কেন? তাহলে তবু সাইনবোর্ডের নামটার সঙ্গে একটু সংগতি থাকত। কোয়লজী জবাব দেন না, শুধু মৃদু হাসেন। কথা তিনি পারতপক্ষে বলতে চান না। কেন চান না সেকথাও শহরের কারও অজানা নয়।

খানিক আগেই আর একবার "মাইক" খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মজবুত কোরা-

কাপড় ছেঁড়বার সময় একরকম শব্দ হয় না? ফাঁশ—চিড়-চিড়-চড়াক? সেইরকম লাগছে "মাইক"-এ ফাটা-ফাটা গলায় বলা অস্পষ্ট কথাগুলো। কি যেন একটা ধরবার জিনিসের অভাবে ফসকে আলগা-আলগা হয়ে যাচ্ছে গলার স্বরটা। অভ্যস্ত কান না হলে বোঝা শক্ত কী বলছে। আমার অবশ্য কোয়লজীর কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এক সময় আমরা সহকর্মী ছিলাম। এখনও মাঝে মাঝে ওর রেডিও, লাউড-স্পীকারের দোকানে গিয়ে বসি। নিজের নিজের সুখ-দুঃখের গল্প করে অজও মনের বোঝা হাল্কা করি আমরা। আজ-কাল ও সাধারণত কথা বলে ফিস-ফিস করে। সে সময় ওর কথা বেশ বোঝা যায়। বোধহয় ওর ঠোঁটনাড়ানাটা কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যায় বলে কথাগুলোকে অত স্পষ্ট মনে হয় তখন। এখন মাইকের সম্মুখে দাঁড়িয়েও সেই রকম আস্তে কথা বলছে না কেন। তাহলে হয়ত ওর গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ বড় হয়ে এমনভাবে শ্রোতাদের কানকে পীড়া দিত না।

"এক। দুই। তিন।"

বলছে ত এই কথা কয়টিই বারে বারে। এর জন্য আবার এত বাবরি-চুল নাড়াবার ঘটা কিসের। যাত্রার মত এমন গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বক্তৃতারই বা দরকার কী! আজকে তার হল কি। অন্য কোন সভাসমিতিতে ত ও "ফিট" করবার সময় মাইকের কাছে যায় না—এক, দুই, তিন বলবার জন্য। ও চিরকাল বসে থাকে দূরে, অ্যামপ্লিফায়ার-টার কাছে। সেখান থেকে বোতাম টিপে মিস্ত্রির এক-দুই-তিন বলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সভাসমিতিতে মাইকভাড়া দেবার কাজ তাকে নিতে হয়েছে, কিন্তু কতকগুলো অযোগ্য বক্তার গলার স্বরের দুর্বলতা ঢাকবার যন্ত্রটাকে সে চিরকাল অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। যন্ত্রটা তার অন্নদাতা, দুর্দিনে উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়ে সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এটাকে পুজো করতে পারে না, এই ছিল কোয়লজীর মনের ভাব। জানি ত তাকে।

"হেল্লো। হরান। টো। থ্রির।"

মিস্ত্রিটাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারত কথা কয়টা। কথা না বলে, শুধু তুড়ি বা হাত-তালি দিয়েও ত পরীক্ষা করতে পারত মাইকটা ঠিক কাজ করছে কিনা।

লোকজন এসেছে বেশ। শামিয়ানার মধ্যে আঁটেনি। কম্পাউণ্ডের বাইরে গেট ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, অগণিত লোকের মাথা মনে হচ্ছে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। বাঁ পাশের বারান্দায় চিকের আড়ালে মহিলারা আছেন। বেদীর পিছনের দিকে সাওজীর বাড়ীর অন্দর-মহলের একটা দরজা। এতগুলি অধৈর্য ব্যক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রিত হচ্ছে কোয়লজীর দিকে। দোকানের সুনাম ও কোয়লজীর সম্মান আর বুঝি অক্ষুণ্ণ রাখা গেল না। তবু তার ভাবভঙ্গীতে, বিন্দু-মাত্র অপ্রস্তুত হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। আমি প্রথম সারিতে বসেছি কিনা, তাই সব খুঁটিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

গাঁদাফুলের মালা-গলায় মিসিরজীর অঙুলে এখনও রামায়ণের পুঁথির উপর। অন্নপূর্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন মাইকের কাছের অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত লোকটির দিকে। জনকপুরের বিখ্যাত রামায়ণদলের দলপতি ইনি। দেশজোড়া এ'র রামায়ণগানের খ্যাতি। সাধক-ভক্ত বলেও এ'র নাম আছে। এই জনকপুরে রামায়ণ কোম্পানির অন্য লোকেরা রাম-রাবণ সেজে যুদ্ধ করে, সখী সেজে নাচে, মিসিরজীর দম ফুরিয়ে এলে গান গায়। মিসিরজী নিজে কোন দিনই এই অভিনয়-গুলোতে নামেননি। গান ছাড়া, শুধু নৃত্যারতি দেখাতেন মাথা'র থালায় একশ-আটটা প্রদীপ নিয়ে। বুড়ো হয়ে আজকাল আর নাচতে পারেন না। দলের সঙ্গে বাইরে যাওয়াও আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। গলার সে জোর আর নাই। বহু টাকা পেলে পনিই বা কোথাও যান, আগে থেকে বলে দেন যে লাউডস্পীকার ফিট করান চাইই চাই। তাই ডাক পড়েছিল জিরানিয়া-কোয়লের। এর আগে কখনও সাওজীর বাড়ির রামনবমীর উৎসবে মাইক ফিট করবার দরকার পড়েনি। বুড়ো সাওজী বহু ছেলেমেয়ে নাতিপুতি রেখে গত বছর স্বর্গে গিয়েছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী, পয়সা খরচ করে যতদূর পুণ্য সঞ্চয় করা যায়, তাতে ত্রুটি রাখতে চান না। সেইজন্যই এবার এত খরচ করে মিসিরজীকে আনান হয়েছিল। জনকপুর রামায়ণ কোম্পানিতে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকলে কি হবে! ভক্তিমতি বিধবা বলেছেন সেসব হবে কাল, ওসব ভেজাল আজ নয়, এত বড় একজন সাধক-ভক্তকে যখন পাওয়া গিয়েছে, রাম-নবমীর দিনে, তখন যতটুকু যা পারেন মিসিরজী একাই করবেন। সেইজন্যই আজ এত ভিড়।

যাক! মাইক ঠিক হয়ে গিয়েছে। রামায়ণ গান আবার আরম্ভ হল। শ্রোতাদের সঙ্গে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে লোকের চেঁচামেচিতে ভাল করে গান শোনবার উপায় নেই। পাশের যুবকের দল এক মিনিটের জন্যও নিজেদের কথাবার্তা বন্ধ করেনি। বেদীর পিছনে কিছু দূরে অন্দর-মহলের দরজার দিকে "অ্যাম্পিলফায়ার"টা রাখা আছে। কোয়লজী গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। কিছুক্ষণ পরে বসল আরাম করে। এতক্ষণে বোধহয় সে মাইক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। বসে বসে পা নাচাচ্ছে আপন মনে। আর গান শুনতে শুনতে অ্যাম্পিলফায়ার-এর বাক্সটার উপর আঙুল দিয়ে তাল দিচ্ছে। আজকাল সবাই তাকে সঙ্কোচকাতর, গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলেই জানে। সেজন্য এখনকার এই লঘু চাপল্যটুকু লোকের নজরে পড়বার কথা।

চিরকাল কিন্তু সে এরকম গম্ভীর প্রকৃতির ছিল না। রাজনীতিক জীবনে থাকবার সময় তার উচ্ছল উৎসাহ ও চটুল কর্মব্যস্ততা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তার উপর আবার চেহারাটি ভাল, মাথায় বাবরি চুল, একটু নাটুকে ভাব। আমরা অনেক সময় ঠাট্টা-তামাসা করতাম সভা-সমিতিতে তার এই অকারণ কর্মব্যস্ততা নিয়ে; কিন্তু সেসব ত বহুকাল আগেকার কথা। তখন বয়স ছিল কম; শোভন-অশোভনের মান ছিল আলাদা; দশজনের, বিশেষ করে দলের উপরওয়ালাদের নজরে পড়াটাই ছিল জীবনের লক্ষ্য। এখন কোন-রকমে দিনগত পাপক্ষয় করবার জন্যই কোয়লজী দোকানটা চালায়; কিন্তু আজ একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগছে তাকে। সকাল থেকেই। ভোরবেলাতেই আমার বাড়িতে গিয়েছিল, মিসিরজীর গান শুনতে যাবার জন্য অনুরোধ করতে। বলেছিল, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। কোথায়? শাগুজীর বাড়িতে? এতকাল পরে আবার? সেই আস্তাবলে নয়ত? আমার পরিহাসের উত্তর দিয়েছিল কোয়লজী, তার মুখের সলজ্জ হাসিটুকু দিয়ে। তারপর বিকালে আসবার সময় আমাকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে এসেছিল। তার কৃপাতেই, প্রথম লাইনে বসবার জায়গা পেয়েছি এখানে। না এলেই ভাল ছিল। একটু ধর্মভাব না থাকলে শ্রোতার পক্ষে রামায়ণ গানের রস নেওয়া কঠিন। ধর্মকর্মের বালাই আমার নেই। অনুরোধে পড়ে এসেছি। কাজেই মিসিরজীর গান আমার বিশেষ ভাল লাগছে না। কানে আসছে; মাঝে মাঝে ভাল করে শোনবার চেষ্টা করছি; কিন্তু মন বসাতে পারছি না। যে দুইজন রামায়ণ-কোম্পানির লোক মিসিরজীর দুপাশে বসে

বসে বসে পা নাচাচ্ছে আপন মনে

নেকড়া দিয়ে অনবরত তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, তাদের মাসিক বেতনের পরিমাণ মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি। পাশের যুবক দলের রসাল টীকা-টিপ্পনীগুলো না শুনে উপায় নাই। শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর তারা নজর রেখেছে। যতবার মিসিরজীর চোখ মোছান হচ্ছে, ততবার নাকি তাঁরাও যন্ত্র-চালিতের মত নিজেদের চোখ মুছছেন। ওরা ধরে ঠিকই। যে লোকটা মিসিরজীকে পাখা করছে, সে দেখলাম সত্যিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। মোট কথা, এই সব নানা জিনিস-মিলিয়ে গানের আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ মাইক খারাপ হয়ে গেল আবার। মিসিরজী প্রথমটায় বুঝতে পারেননি; তিনি চোখ বুঁজে গান গেয়ে চলেছেন। পাশের লোক দুইজন তাদের চোখের জল মোছাবার ডিউটি বন্ধ করেনি। কানে এল যে শ্রোতাদের মধ্যেও কে কে যেন দেখাদেখি নিজের নিজের চোখের জল মুছে চলেছেন, মাইক অকেজো হবার পরেও। আমি কিন্তু দেখছি কোয়লজীকে। দৃঢ় পদক্ষেপে সে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাড়াচাড়া করে দেখছে যন্ত্রটার কোন্ অঙ্গ রোগগ্রস্ত। বেদীর কাছে গিয়ে মিসিরজীর পায়ে হাত দিয়ে গান থামাতে অনুরোধ করল বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই। আবার গেল অ্যাম্পিলফায়ারটার কাছে। মুখ-চোখ দেখে বোঝা গেল যে, এতক্ষণে সে রোগ নির্ণয় করতে পেরেছে। মিনিট খানেক এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করে গিয়ে দাঁড়াল মাইকের সম্মুখে। মিস্ত্রিটা কোয়লজীর কাছে গিয়ে কি যেন বলছে। বোধহয়, দোকান থেকে আর-একটা যন্ত্র নিয়ে আসবে কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছে। কিংবা হয়ত অন্য কোন বেফাঁস কথা বলেছে। নইলে কোয়লজী ওরকম চটে উঠবে কেন। না! না! না! কোয়লজী অনুমতি দেয়নি। আঙুল দেখিয়ে মিস্ত্রিটাকে অ্যাম্পিলফায়ারের কাছে বসতে বলল স্বর-নিয়ন্ত্রণের বোতামটা ধরে। মাথার এক ঝাঁকানিতে বাবরি চুল ছড়িয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়েছে মাইকের সম্মুখে; ঠিক সেকালে যেমন করে দাঁড়াত। গেটের বাইরের সরকারী রাস্তা পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখছে সম্মুখের

অগণিত লোকজনকে। একটু বুঝি আনমনা হয়ে গিয়েছে। তারপর চিৎকার করে মাইকে আরম্ভ করল—হেল্লো! হেল্লো! হুনান! টো! থ্রি! ......হেল্লো! হুনান! টো! থ্রি।

বেদীর উপর চেয়ারে উপবিষ্ট আড়ষ্ট রাম-সীতার মধ্যেও দৃষ্টি বিনিময় হল। পাশের লোকরা হাততালি দিচ্ছে। একজন চিৎকার করে বলে ওঠে—"মধুর! মধুর!"

"প্রেম নিবেদন করছে রে!"

"গান গাইছে বোধহয়।"

"হাপর চালাচ্ছে, হাপর!"

ছাত্রের দল নিশ্চয়ই। এরা বোধহয় বাইরে থেকে এসে এখানকার কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে। কোয়লজীর গলার স্বরকে নিয়ে এমন নির্দয় রসিকতা এখানকার কোন লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। এই সেবারও ভোটের সময় জেলার হাজার হাজার লোকে স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একখানা আবেদনপত্র দিয়েছিল—পুরাতন রাজনীতিক কর্মী জিরানিয়া কোয়লকে চিকিৎসার্থে সরকারী খরচায় ভিয়েনা পাঠাবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য আবেদন-পত্রে কোন ফল হয়নি; কিন্তু এর থেকেই বোঝা যায়, এখানকার লোকে কীরূপ সম্ভ্রম ও স্নেহের চোখে দেখে কোয়লজীকে।

কী করে যেন ভিয়েনা শহরের নামটাও কোয়লজীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ওর প্রথম অসুস্থতার সময়, যখন রাজধানীর হাসপাতালে ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই। সেখানকার এক ডাক্তার বলেছিলেন যে, ভিয়েনা ছাড়া আর কোথাও এ-রোগের চিকিৎসা হয় না। কোথা থেকে যে মানুষের কী বিপদ আসে! বিপদটা প্রথম এসেছিল একটা ইলেকশনের মরশুমে। শীতকাল। আমরা এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। একদিন সকাল বেলায় সে বলল, ঢোক গিলতে লাগছে। পরের দিন থেকেই দেখা গেল, তার গলার স্বর বার হচ্ছে না। তার গলার কোন রোগের কথা এর আগে শুনিনি। বরঞ্চ মাথা ধরার কথা সে প্রায়ই বলত। আর বলত যে, বক্তৃতা দিতে ওঠবার মুহূর্তে তার কানে তালা লেগে যায় এবং গলার স্বরও অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে ওঠে, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তারপর মিনিট খানেক নিজের বক্তৃতার স্বর কানে এলে সে-ভাবটা কেটে যায়। এছাড়া আর কোন রকম গলার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তার মুখে শুনিনি এর আগে।

ওষুধ-বিষুধ কিছুতেই ফল হল না। আমি আশ্বাস দিই—"ভয় কী। সেরে যাবে।" শুনে সে আমার হাত চেপে ধরেছিল। চোখে জল। আমার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়প্রত্যয়ের অভাবটুক সে ধরে ফেলেছিল অনায়াসে। কণ্ঠধ্বনি নিয়ে কম মাথা ঘামায়নি ত কোয়লজী সারাজীবন। কথার ধ্বনির মাদকতার স্বাদ পেয়েছিল সে ছোটবেলা থেকে। চানাচুরওয়ালার ছেলে কিনা। তখন ওর নাম ছিল বিরজু। চানাচুর বিক্রির কাজে বাবাকে সাহায্য করতে হত মেলার মরশুমে। এই চানাচুর বিক্রির সূত্রেই তাকে প্রথম অনর্গল কথার পর কথা সাজানর অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়। তার বাপের কথার বাঁধুনি ছিল বেশ। বাপ শিখিয়েছিল, "এক কলি গাইবার সময় নিজের বলা কথার আওয়াজটা নিজের কানে ধরে রাখবি। ওই আওয়াজের মশলাতে গরমালে তবে না মন পরের কলির কথাগুলোকে বার হতে দেবে। কান দিয়ে ঢুকে কথার আওয়াজটা মনের মধ্যে থেকে সঙ্গী-সাথীদের ঠেলে বার করে। তাই না সময় মত কথা যোগায় মুখে।"

বাপের শেখানো চানাচুর তৈরির প্রক্রিয়াটা তার জীবনে কোন কাজে আসেনি; কিন্তু যখন-তখন মুখে মুখে কথা সাজাবার কৌশলটা বিরজু অবিচলিত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছিল। তার দরাজ গলাও বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপ তাকে গ্রামের পাঠশালায় ভরতি করিয়েছিল। সেখান থেকে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পেয়ে সে এসে শহরের স্কুলে সবচেয়ে নীচের ক্লাসে ভরতি হয়। বয়স তখন তের-চৌদ্দ। বক্তৃতা দেবার নেশা তার তখন থেকেই। তখনই সে দশজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার সুযোগ খোঁজে। তাই এই ছোট শহরের লোকজনের নজরে পড়তে ওর সময় লাগেনি। সেই সময় হল এখানে প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। সভা-নেত্রী হয়ে যিনি এসেছিলেন, ভরত-জোড়া তাঁর নাম। ইংরেজী ও উর্দুতে ভাষণ দেবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে বিরজু। বক্তৃতার মধ্যে সে সভানেত্রীকে ভারত-কোহলিয়া (ভারত-কোকিলা) বলে সম্বোধন করে। উত্তরে তিনি বিরজুকে জিরানিয়া-কোয়ল নামে অভিহিত করেন। সভাভঙ্গের পর ভারত-কোহলিয়া জিরানিয়া-কোয়লকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে আদর করেছিলেন। হাসতে হাসতে তাকে বলে-ছিলেন, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাগ্মিতার জোরে বিরজু নিশ্চয়ই দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা হবে। জেলার লোকে বিরজুর জন্য গর্ব অনুভব করেছিল সেদিন। সেই থেকে বিরজু হয়ে গেল জিরানিয়া-কোয়ল—সংক্ষেপে কোয়লজী। সেই থেকে কোয়লজীর চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে গেল...... তার ভাষণ শোনবার জন্য লোক ভেঙে পড়ছে......ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে সারা দেশ সফর করে বেড়াচ্ছে......লোকে জয়ধ্বনি দিচ্ছে......খবরের কাগজে তার ফটো বার হচ্ছে......আরও কত রকমের কথা......

বক্তৃতা দেবার সহজাত ঝোঁকটা একটা লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে আরও জেঁকে বসল তার মনে। এতকাল সে সুযোগ খুঁজে বেড়াত পণ্ডিতজীর ফেয়ারওয়েল মিটিং-এ, স্কুলের প্রাইজ বিতরণ সভায় বা পাড়ার তুলসী-জয়ন্তী উৎসবে। কিন্তু এবার থেকে সে মাখামাখি আরম্ভ করল এক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বক্তৃতা দেবার এমন সুযোগ-সুবিধা সেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে তখন বিশেষ ছিল না।

এদিকটা ত সবই আশানুরূপ হল; হল না শুধু পড়াশোনার দিকটা। যে-লোকটা যে-কোন বিষয়ের উপর অনর্গল বক্তৃতা দেবার মত বুদ্ধি রাখে, সে যে চেষ্টা করেও কেন কাজ-চালানো গোছের ইংরেজী রপ্ত করতে পারল না, জানি না। সেই নীচের ক্লাসেই পর পর তিনবার ফেল করে তাকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। সুবিধার মধ্যে দেশে তখন একটা জাতীয় আন্দোলনের হিড়িক চলছে। তারই মধ্যে বিরজু নিজেকে ডুবিয়ে দিল তখনকার মত।

সেই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

মিসিরজীর রামায়ণ গান চলেছে। শ্রোতারা নড়েচড়ে আবার শান্ত হয়ে বসেছে। চিকের আড়াল থেকে ছোটছেলের একটানা কান্নার আওয়াজ, পাশের যুবকের দলের মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে। চিৎকার করে তারা ছেলের মাকে তাঁর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে দিল। কোয়লজী দাঁড়িয়ে রয়েছে পিছন দিকে অ্যামপ্লিফায়ার-এর কাছে। সে আজ খদ্দরের জামা-কাপড় পরে এসেছে। আগে খেয়াল করিনি। ইদানীং দেখতাম সে খদ্দর পরা ছেড়ে দিয়েছিল। আজ দেখছি তার সবই অন্যরকম।

এক সময় ছিল, যখন সে মাথায় করে বাড়ি-বাড়ি নিয়ে গিয়ে খদ্দর বেচত। এই শাওজীর বাড়ির পাঁচিলের বাইরে খান-কয়েক ঘর আছে, সহিস, কোচমান, ড্রাইভার-দের থাকবার জন্য। তারই একখানা ঘরে সে তখন থাকে। সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের বাড়িটা তখন গভর্নমেণ্টের হাতে। ড্রাইভার সাহেবের কৃপায় এখানে মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে সে বেঁচে যায়। চানাচুর বিক্রি করতে সম্ভ্রমে বাধে· তাই দিনে স্বরাজের গান গেয়ে খদ্দর ফিরি করে বেড়াত, রাতে এসে এই ঘরে থাকত। ওই সময় আমিও কতদিন ওর ঘরে এসে আড্ডা মেরেছি। কত সময় তার জন্য ভাত-তরকারি নিয়ে গিয়েছি

টিফিন-কেরিয়ার করে। মনে আছে একটা হাসির কথা। সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করত মাছ আছে কি না। মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনের এপার পর্যন্ত শাওজীর জমি। মাছ থাকলে সে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গিয়ে বসত ড্রেনের ওপারে, রাস্তার ধারে। বলত যে, শাওজীরা বৈষ্ণব, তাঁদের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। একটু বাড়াবাড়ি না? কে দেখতে আসত সেখানে! তাছাড়া আমি নিজের চোখে সেখানে সহিস-কোচমানকে ইঁদুর পুড়িয়ে খেতে দেখেছি। বললেও, ও নিজের জিদ ছাড়ত না। আরও লক্ষ্য করতাম যে, তার সৎ-অসৎ জ্ঞান শাওজীর বেলায় যেমন সজাগ, অপরের ক্ষেত্রে তেমন ছিল না। এর মূলে বোধহয় ছিল তার গহন মনে লুকানো একটা দোষী দোষী ভাব। তখন বুঝতে পারিনি; একথা অনুমান করেছিলাম বহুকাল পরে, তার নিজের মুখ থেকে একটা অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে। অন্য প্রসঙ্গে বলা। এরকম অভিজ্ঞতার কথা গোপন রাখবার বয়স তখন পার হয়ে গিয়েছে। হাসি-ঠাট্টার খোরাক জোগান ছাড়া কথাটার তখন আর অন্য কোন মূল্য ছিল না।

বাইরের আস্তাবলের পাশের ঘরে থাকবার সময়, কতই বা বয়স ছিল বিরজুর। মনে হত পৃথিবীর যাকিছু সব তারই জন্য। সূর্য ডোবে তারই জন্য; রাত্রিও শেষ হয় তারই জন্য। তার জন্যই দোয়েলটা শিস দিত ভোরের আলো দেখা দেবার আগে; আর ভোরের আলো দেখা দিলে ঘুঘু পাখি তাকে ডেকে বলত—"বিরজু! ওঠো! ওঠো! ওঠো! বিরজু! ওঠো! ওঠো! ওঠো!" বিরজুকে জাগাতে হবে কেন? সে ত জেগেই রয়েছে। মাঝরাত থেকে সে দড়ির খাটিয়াখানার উপর এপাশ ওপাশ করছে। কোন আড়াল থেকে লুকিয়ে যে ডাকে পাখিগুলো! সারাদিন কোথায় থাকে, কী করে, জানতে ইচ্ছা করে। মন উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে ডানা মেলে লাজুক পাখি-গুলোর সঙ্গে। কত কী হয়ত করে। ঠোঁটের চিরুনি দিয়ে আনমনা হয়ে হয়ত পালক আঁচড়ায়। ডাকে আপন খেয়াল-খুশিতে। কণ্ঠধ্বনি দিয়ে বোধহয় সাথীকে সংকেত দেয় নেপথ্য থেকে। বোধহয় ডাকবার পর সঙ্গীর সাড়া পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে উৎকর্ণ হয়ে। বিশ্বসুদ্ধ সকলেই প্রতীক্ষা করে কারও না কারও—কিছুর না কিছুর—কেউ নীল শাড়ির, কেউ মধুগন্ধের, কেউ চাঁপার কলির পরশের। বিরজুও উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করে একটি কণ্ঠ-ধ্বনির। তার মনের সুর বাঁধা ভোর-বেলাকার একটা ধ্বনি-সংকেতের সঙ্গে। দিনের পর দিন। সময় বাঁধা। ...ওই যে!...

"কারে-ম্যায়!" অকারের মা! কারের মাকে ডাকছেন তিনি। ধ্বনির সুরটা সা-রে-গা-র মত। কথাটা ঠিক ধরা যায় না স্পষ্টভাবে, এত দূর থেকে। আন্দাজে মনে হয় তিনি বলছেন—"কারেম্যায়!"

এই প্রত্যাশিত ধ্বনিটা কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরজু এক, দুই, তিন, চার করে গুনতে আরম্ভ করে। মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে সময়ের। পাঁচশ পর্যন্ত গুনতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আরও। মহাজনী কারবার করেন শাওজী; তাই সব সময় সাবধান। দুর্গের মত দেখতে বাড়িটা। অন্দরমহলের কামরাগুলোয় ক্ষীণ সূর্য ঢুকতে পান অতি সংকুচিতভাবে, ছাতের কাছের গরাদ আঁটা গবাক্ষগুলোর মধ্যে দিয়ে। বড় হাতিতে চড়ে পথ দিয়ে লোক গেলেও তাদের লুব্ধ দৃষ্টি যাতে বাধা পায়, সেদিকে খেয়াল রেখে পাঁচিলের উচ্চতা ঠিক করা হয়েছে। এই পাঁচিলের গায়েই বিরজুর ঘর। পথের হট্টগোলে ভোরবেলা ছাড়া শাওজীর অন্দরমহলের কল-কাকলি এ-ঘরে পৌঁছয় না। মাঝে মাঝে জাঁতা পেষার বা পরব উৎসবের কোরাস গান কানে এলে তার মধ্যে থেকে একটা গলার স্বরকে আলাদা করে চেনবার চেষ্টা করে সে। শাওজীর বাড়ির মেয়েরা শখ করে পিষতেও ত পারেন আটা। কত কিছু কল্পনা করে নিতে ভাল লাগে। পুত্রবধূ, কন্যা, আশ্রিতা, পালিতা কত আছেন শাওজীর বাড়িতে। এঁদের মধ্যে কার সেই কণ্ঠস্বর, সেকথা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। ......পাঁচশ গোনা শেষ হয়েছে। বিরজুর বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে এল বুঝি। ওই! খুক্! খুক্! প্রত্যাশিত সংকেত। কাশির শব্দ। ভিজে ভিজে গলা। অতি পরিচিত। অত্যন্ত আপন। একবার গলা খাঁকরি দিয়ে বিরজুও

সাগ্রহ সংশয় — আলোকচিত্রী : জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশল—খুক্‌ খুক্‌। কাশির সংকেতের উত্তরে। বেশী জোরে নয়। ড্রাইভার-কোচমানের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। আবার সে কান পেতে শোনে। পরিচিত কাশির ধ্বনির মধ্যে দিয়ে আবার সাড়া দিলেন তিনি। এমনি করেই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, যতক্ষণ না ড্রাইভার, সহিস, কোচমান ঘুম থেকে ওঠে। ......কখন কখন মনে হয়, কৌতুকময়ী সাড়া না দিয়ে মজা উপভোগ করছেন। ......প্রথম প্রথম ছিল খেলা। পরে কিন্তু জিনিসটা বিরজুর কাছে খেলার চেয়েও অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। কত স্বপ্নজাল বোনা এ নিয়ে। এ-ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন, সে সারারাত কেশেছিল গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভান করে।

জেলে যাবার সার্টিফিকেটওয়ালা লোকের বক্তৃতা দেবার সত্যিকারের ক্ষমতা থাকলে, তখনকার যুগে নেতা হবার আর কোন বাধা ছিল না। 'ভারত-কোহলিয়া'র আশীর্বাদের কথা মনে জাগরূক রেখে, অতি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নিজের অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলছিল কোয়লজী। বহু নামজাদা বক্তার বক্তৃতা শুনেছি; কিন্তু একেবারে খেলো কথা বলে শ্রোতাদের মন ধরে রাখবার এমন অনায়াস ক্ষমতা, কোয়লজীর মত আমি আর দেখিনি। ভাষণ শুনতে হয় ত কোয়লজীর—এমনি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সাধারণ লোকজনের মনে, কিছু দিনের মধ্যে। মনে মনে আমরা তাকে ঈর্ষা করতাম। ওই সময়ের একদিনের একটা ঘটনা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। রাজধানী থেকে বড় নেতা এসেছেন জিরানিয়াতে। হাঁপানি রোগে তিনি বারো-মাস ভোগেন; আর যত সারগর্ভ কথাই বলুন, লোকের মন ধরে রাখবার মত করে বক্তৃতা দিতে পারেন না। তখন মাইকের ব্যবহার এ-অঞ্চলে সবে আরম্ভ হয়েছে। মাইকে বললে হেঁপো রোগীর বক্তৃতাও সিংহ গর্জনের মত শোনাবে, এই রকম একটা কথা ফিস ফিস করে সারা জেলার লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। রাজধানীর নেতা ভাষণ আরম্ভ করলেন। মাইক দিয়ে উন্নতি হয়েছে বক্তৃতার —তাঁর খুসখুসে কাশি ও হাঁপের টানটার অবিরাম আওয়াজ সিংহ গর্জনের চেয়েও জোরে হচ্ছে। ......দেশপূজ্য নেতার 'দর্শন'টাই আসল। বেশ কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে। সকলেই পালাতে চায়। "শান্তি!" শান্তি!" "বসে যান ভই সব!" "প্যারে ভইয়ো! বহনো!" কিছুতেই কিছু হল না। চোখে জল আসবার জোগাড় জেলার নেতাদের। রাজধানীর নেতা গ্লাস থেকে জল খেয়ে চশমার কাচ মুছতে আরম্ভ করেছেন। স্থানীয় নেতারা রাজধানীর নেতার কাছে কোয়লজীর জন-প্রিয়তার কথাটা না জানাতে পারলেই খুশি হতেন। কিন্তু সে উপায় যে নাই। ইঙ্গিত পেয়ে কোয়লজী উঠে দাঁড়াল। মাইকের লোকটা যন্ত্রটা তার কাছে আনতেই, হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল সেটাকে—সে হেঁপো রোগী নয়—সবচেয়ে দূরের শ্রোতাদের শোনাবার মত গলার জোর তার আছে।

কোয়লজী হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। "ছি! ছি! ছি! ছি! ছি!" ...... আরে! কোয়লজী যে! কী যেন বলবে! কী মজার মজার কথা যে বলে কোয়লজী! ছি-ছি বলবার পর কোয়লজী মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে, শুধু চাহনির মাধ্যমে ওই তীব্র ভর্ৎসনাটা ছড়িয়ে দিল, চতুর্দিকের শ্রোতাদের মধ্যে। বাঁড়িমুখো লোকটা থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বক্তৃতা আরম্ভ করে।...... সে একবার গিয়েছিল কলকাত্তাতে; কলকাত্তার মছুয়াবাজারে; হ্যাঁ মছুয়াবাজার স্ট্রীটে। কলকাত্তার মত শহরের মাছের বাজার! সে যে কী চেঁচামেচি, কী হৈ হল্লা! তার আন্দাজ পেতে হলে আসতে হয় আপনাদের কাছে।

শ্রোতারা হেসে উঠেছে। এখনই হয়েছে কী; দেখ না, হাসিয়ে হাসিয়ে মারবে। তারপর একটু গরমাতে দে; দেখবি আগুন ছিটবে।

শ্রোতাদের হাসির দমক থামলে কোয়লজী আবার আরম্ভ করে। ......কলকাতায় ছিলেন চিৎরঞ্জন দাস—ব্যালিস্টর। আর এখানে? এখানে আছেন এই চিৎরঞ্জক। ......নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে কোয়লজী হাসছেন। সভার লোকরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। তারপর কোয়লজী শ্রোতাদের স্থির হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসতে বললেন। যাঁর মুখ থেকে হেলায় ছিটিয়ে দেওয়া কথাগুলো কুড়িয়ে দেশের খবরের কাগজগুলো বড়লোক হয়ে গেল, সেই মহামান্য নেতার ভাষণ এইবার আরম্ভ হবে: চুপ করে শুনুন আপনারা! শুনে পুণ্য সঞ্চয় করুন! তাঁর ভাষণ শেষ হবার পর, এই অধম তার টুটা-ফুটা ভাষায় আপনাদের মনের মত দু-চার কথা শোনাবে। ......সেদিন মন্ত্রের মত কাজ করেছিল বিশৃঙ্খল জনতার উপর, কোয়েলজীর এই অনুরোধ।

লেখাপড়া শেখেনি। জনতার হৃদয়ে পৌঁছবার মত এই বলবার ক্ষমতাটুকুই ছিল তার রাজনীতিক কর্মের পুঁজি। কথা বলবার ক্ষমতা চলে যেতেই জেলার নেতারা তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, রাজ-নীতির ক্ষেত্রে কোন কর্মীই অপরিহার্য নয়। রাজধানীতে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় সেখানকার পার্টির অফিসের লাউড-স্পীকার-এর চার্জে যে ভদ্রলোক আছেন, তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বহুদিন থাকতে হয় কোয়লজীকে। সেই সূত্রেই এই নূতন জীবিকার সঙ্গে তার পরিচয়। নাইবা দিতে পারল বক্তৃতা: মাইক, লাউড্‌স্পীকার ফিট করবার সূত্রে সভাসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ তবু থাকবে। বিয়ে করেনি। সংসার খরচ ছিল কম। বেশী উপার্জনের চেষ্টা ছিল না। দোকানের আয় থেকেই চলে যেত কোন রকমে। আর সুবিধার মধ্যে, কিছুকাল পরে বিকৃত স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা সে ফিরে পেয়েছিল।

মিশিরজী রামায়ণের কোন জায়গায় পৌঁছেছেন, এখন সেটা পর্যন্ত ধরতে পারছি না। এত অমনোযোগী হয়ে রয়েছি আমি। মন পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। সে বসে রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার-এর বাক্সর কাছে। পাশের ছাত্রের দল সরবে ঘোষণা করে দিল যে, তাদের তেষ্টা পেয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের কর্তব্য সম্বন্ধে গৃহকর্তাকে অবহিত করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের চিৎকারে মিশিরজীর একাগ্রতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হয়েছে। তাঁর চোখের পাতা খুলেছে। গান কিন্তু বন্ধ করেননি মুহূর্তের জন্যও। সভামণ্ডপের গরম সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে চলে যাওয়াও শক্ত। আমার নজর পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। ওর একটা হাত অ্যামপ্লিফায়ারের স্বর-নিয়ন্ত্রণের বোতামের উপর; আর-একটা হাত রাখল মাইকের থেকে আসা তারটা যেখানটায় জুড়ে দেওয়া হয়, সেইখানটাতে। অ্যাঁ! ও কী করল! কোয়লজী নিজে? ঠিকই তাই। মাইক অকেজো হয়ে গিয়েছে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। তার খুলে নেবার মুহূর্তে কোয়লজী বাঁহাতে 'ভল্যুম'-এর বোতামটাও টিপে দিয়েছে, নইলে মাইকের গুনগুনানি শব্দটা শ্রোতারা শুনতে পেত। সভামণ্ডপে হইচই আরম্ভ হয়ে গেল। পাশের ছাত্রের দল ইতর ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কোয়লজীকে। মিশিরজীর চোখে পর্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। আর কেউ দেখেনি, আমি যা দেখেছি। কেউ সে সন্দেহও করতে পারে না। তবু সকলে বিলক্ষণ চটেছে কোয়লজীর উপর। ব্যস্ত হয়ে কোয়লজী চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথায় যন্ত্রটা খারাপ হয়েছে দেখবার জন্য। আমি জানি ও দেখছে না, দেখবার ভান করছে। কেন ও অমন করল? ......পিছনের দরজা দিয়ে ও কে ঢুকলেন সভামণ্ডপে? বেদীর দিকে এগিয়ে আসছেন দুইজন বৃদ্ধা বিধবা। গৃহকর্তার মা, আর একজন বোধহয় বাড়ির দাই; আশপাশের লোকের গুঞ্জনধ্বনিতে বোঝা গেল। দাই-এর হাতে দুখান রঙিন রেশমের

কাপড়। চেয়ারে আসীন রাম-সীতাকে প্রণাম করলেন গৃহকর্তার মা। তারপর কাপড়ের ভাঁজ খুলে রাম-সীতার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। যতক্ষণ না বৃদ্ধা দুইজন বেদীর পিছন দিককার দরজা দিয়ে অন্দর-মহলে ঢুকে গেলেন, ততক্ষণ শ্রোতাদের একাগ্র দৃষ্টি তাঁদের দিকে ছিল। বারবার মাইক খারাপ হচ্ছে দেখে বোধহয় বাড়ির লোকেরা আগে থেকে এই পর্বটা ঠিক করে রেখেছিলেন, যাতে মাইক মেরামতের সময় শ্রোতাদের নজর এই দিকে থাকে। না, তা ত নয়। গৃহকর্তা নিজে হন হন করে এসে বেদীর উপরে উঠলেন। মিশিরজীকে নমস্কার করে কী যেন বলছেন ফিসফিস করে। তবে কি আজকের পালা এখানেই শেষ? মুখের ব্যঞ্জনায় বোঝা গেল মিশিরজীর আপত্তি নেই গৃহকর্তার প্রস্তাবে। গৃহকর্তা কী যেন বললেন গানের দলের লোকজনকে। তারা সবাই তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সকলে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। তারা গেল নাচ-গানের জন্য সাজগোজ করতে। মাইকের ভাবগতিক দেখে বাড়ির কর্তা আর আস্থা রাখতে পারছেন না কোয়েলজীর আশ্বাসে। অর্থদণ্ড, কাজ পণ্ড, লোকের কাছে মান-ইজ্জত নষ্ট—বিরক্ত তাঁদের হবার কথা। পয়সার অভাব তাঁদের নাই। এমন জানলে অন্য জায়গা থেকে মাইক আনাতে পারতেন! শ্রোতারা ক্ষেপে উঠেছে। নানারকম কড়া মন্তব্য কানে আসছে, কোয়েলজীর বিরুদ্ধে। কোয়েলজীর নিজের কিন্তু সেসব কথা কানে যাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না। অসীম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াল বেদীর উপরে, মাইকের সম্মুখে। মাথার এক ঝাঁকিতে, বাবরি চুলের বোঝা ছড়িয়ে নিল কাঁধের উপর। কেশর ফুলিয়ে পশুরাজ নীচের নগণ্য মানুষগুলোকে দেখছে। বক্তৃতার মঞ্চের সম্মুখে এত লোকজন দেখে কি পুরনো কথা মনে পড়ছে তার? ক্ষুব্ধ, বিশৃঙ্খল শ্রোতার দলকে দেখে বিচলিত হবার পাত্র কোয়েলজী নয়। তার হাতের তেলোর একতাল কাদা বলে ভাবত সে শ্রোতাদের এক সময়ে।

"হেল্লো! হুয়ান! টো! থিরি!"

গাঁক গাঁক করে আওয়াজ বার হচ্ছে বিকট জোরে মাইক থেকে। একজন মিস্ত্রি ছুটে যাচ্ছে অ্যামপ্লিফায়ারের দিকে, বোধ-হয় আওয়াজটাকে একটু আস্তে করে দেবার জন্য। গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ বর্ধিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে তুলেছে। গৃহকর্তা কোয়েলজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। থামতে বলছেন তাকে। ...যথেষ্ট হয়েছে। আর আমাদের মাইকে কাজ নেই। এখন নাচ-গানের পালা; তাতে মাইক

...ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা

লাগবে না। আপনি দয়া করে আপনার যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়ে যান!...কোয়েলজী গৃহকর্তার কথা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না।

"সেবুন! এট্! নাইন! টেন! ইলেবুন!"

থামবার কোন লক্ষণ নেই। কতদূর পর্যন্ত গুনবে কে জানে। অকারণে চিৎকার করে চলেছে। আমার বুক দুর দুর করছে —এই বক্তৃতা আরম্ভ করে বুঝি কলকাত্তার মছুয়াবাজারের। বাড়ির কর্তা তার কাঁধে হাত দিয়েছেন, কোয়েলজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। এইজন্যই বুঝি সে হঠাৎ সংখ্যা গোনা বন্ধ করল। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে, সে মাইকের সম্মুখে কাশল—খুক খুক করে। কর্কশ আওয়াজটা বুলেটের মত গিয়ে লাগল অগণিত ধৈর্যচ্যুত শ্রোতাদের কানের পর্দায়। অনেকক্ষণ ধরে তারা এই অকর্মণ্য মাইকওয়ালাটার অত্যাচার সহ্য করেছে। আর নয়। তারা রেহাই পেতে চায় এর হাত থেকে। পাশের ছাত্রের দলকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তারা বুঝে গিয়েছে নিঃসন্দেহে যে, মুখের কথায় কোন ফল হবে না এখানে। ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে ওঠবার আগেই দেখি তারা হৈ হৈ করে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বেদীর সম্মুখে। তাদের সমর্থনে আরও বহু লোক এগিয়ে আসছে মাইকের দিকে। আমিও ছুটে গিয়েছি কোয়েলজীকে বাঁচাবার জন্য। বৃদ্ধ মিশিরজী কোয়েলজীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে এই সব অবুঝ পাগল-দের বোঝাচ্ছেন। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আছি। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে কোয়েলজীকে বাঁচাবার জন্য গৃহকর্তা ঠেলে আমাদের পিছনের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ঢুকতেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে আর কেউ না ঢুকতে পারে। দরজার পাশে রাখা অ্যামপ্লি-ফায়ারটাকে আছাড় দিয়ে ভাঙবার শব্দ শোনা গেল। আমরা যেখানে ঢুকলাম, সেটা একটা ঘর। অজস্র হুঁকো, কলকে, গড়গড়া, আর তামাক খাওয়ার অন্যান্য সব রকমের সরঞ্জাম ঘরময় ছড়ান। গৃহকর্তার মা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। রাম-সীতাকে কাপড় পরিয়ে এসে, বোধহয় তাড়াতাড়িতে বসবার সময় পাননি তখনও। কলকে ধরাবার পরেই বোধহয় মাইক-বিভ্রাটটা ঘটে। বুড়ী দাইটাও ঘরের এক কোণাতে আর-একটা কলকে সাজছে। আমরা ঘরে ঢুকবার মুহূর্তেই বোধহয় গৃহকর্তার মা হুঁকোয় টান দিয়েছিলেন। নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। কাশি আসছে বুঝি ভদ্রমহিলার। চেষ্টা করেও চাপতে পারলেন না। খুক খুক করে কাশলেন। ভক ভক করে ধোঁয়া বার হল মুখ দিয়ে। হঠাৎ আমাদের ঢুকতে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। এতক্ষণে মাথার কাপড় টেনে দেবার কথা মনে পড়ল তাঁর।

কোয়েলজীকে তখনও আমি ধরে। কেমন যেন আড়ষ্ট গোছের হয়ে সে বসে পড়ল সেখানে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে, অথচ যেন কিছু দেখছে না। দরজার বাইরের চেঁচামেচি তখনও শোনা যাচ্ছে—"ভিয়েনার বাচ্চা কোথাকার! একবার আয় দরজার বাইরে—তোকে আজ মাইকে চড়াব! ভেবেছিস কি!"

কোয়েলজীর হাঁটুর কাছের অসাড় ভাবটা কাটলে, গৃহকর্তা খিড়কির দুয়ার দিয়ে আমাদের বার হবার পথ দেখিয়ে দিলেন। সভামণ্ডপের হইচই তখনও থামেনি। নিঃশব্দে চোরের মত চলেছি আমরা পথ দিয়ে। কিজন্য সে নিজেই মাইকটা খারাপ করে দিয়েছিল, এই প্রশ্নটা এখনই তাকে করা উচিত হবে কিনা ভাবছি; এমন সময় সে নিজেই কথা বলল ফিসফিস করে।

"সেই আওয়াজটা তামাক টানবার কাশির; এঁরই।"

আকবর বাদশা হরিপদ কেরানী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রথম ব্যক্তি॥ কে ওখানে—আমার বাগিচায়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ আপনি বুঝি বাগিচার জিম্মাদার?

প্রথম ব্যক্তি॥ অনাবশ্যক কৌতূহল। তুমি এখানে কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ পথ চলে ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করছি।

প্রথম ব্যক্তি॥ দূরদেশের লোক বুঝি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ আপনার অনুমান ঠিক, বাংলাদেশ থেকে আসছি।

প্রথম ব্যক্তি॥ বাংলাদেশ, সুবে বাংলা! কী তোমার নাম?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ হরিপদ কেরানী।

প্রথম ব্যক্তি ॥ কেরানী? এ কী রকম পদবী? কৌলিক পদবী কি?

হরিপদ কেরানী॥ ছিল একটা কিছু, কিন্তু তিনপুরুষের কেরানীগিরির স্মৃতির তলায় তা কবে তলিয়ে গিয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি॥ সেজন্য দুঃখ করো না, কোন বৃত্তিই হীন নয়।

হরিপদ কেরানী॥ কিন্তু কোন কোন বৃত্তি সম্মানকর।

প্রথম ব্যক্তি॥ যেমন?

হরিপদ কেরানী ॥ বাদশাহী।

প্রথম ব্যক্তি ॥ সহস্র কেরানীর পায়ের উপরেই ত বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা।

হরিপদ কেরানী ॥ তবু পা পা-বই নয়। কিন্তু আপনার পরিচয় ত পেলাম না। পোশাক-আশাক মূল্যবান, আমীরওমরা হবেন মনে হচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তি॥ এখনি ত বাগিচার জিম্মাদার মনে হয়েছিল।

হরিপদ কেরানী॥ তা হয়েছিল বটে, তখন কেবল মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

প্রথম ব্যক্তি॥ মুখ দেখে কিছু মনে হয়নি?

হরিপদ কেরানী॥ মুখ দেখে কি মানুষ বোঝা যায়, মানুষ বুঝতে পারা যায় কাপড়ে।

প্রথম ব্যক্তি ॥ কেমন?

হরিপদ কেরানী॥ এই যেমন ছেঁড়া কোর্তায় আমি হরিপদ কেরানী। এসব ছেড়ে কাশ্মীরী শালের চোগা আর পাগড়ি পরলে আমিই হয়ে উঠতে পারি আকবর বাদশা।

প্রথম ব্যক্তি॥ আকবর বাদশা হয়ে ওঠা কি এত সহজ?

হরিপদ কেরানী॥ কে বলছে সহজ! কাশ্মিরী পোশাক দুর্মূল্য।

প্রথম ব্যক্তি॥ মূল্যটাই শুধু অন্তরায়? পোশাক খুলে নিলে তুমিও যা আকবর বাদশাও তা-ই, কি বলো?

হরিপদ কেরানী ॥ আপনার পরিচয় না পেলে আর কিছুই বলব না। অপরিচিতের কাছে মুখ খুললেও মন খুলতে নেই।

প্রথম ব্যক্তি ॥ আমি বাগিচাগুলোর মালিক।

হরিপদ কেরানী॥ গুলোর? আর কতগুলো আছে?

প্রথম ব্যক্তি॥ অসংখ্য।

হরিপদ কেরানী ॥ অসংখ্য! তবে বুঝি বড় জায়গীরদার হবেন?

প্রথম ব্যক্তি॥ প্রায় সেই রকম।

হরিপদ কেরানী॥ তবে কি আরও বড়! সুবেদার?

প্রথম ব্যক্তি॥ প্রায় সেই রকম।

হরিপদ কেরানী ॥ আর ভাবতে পারছি না, আমি সামান্য কেরানী, জায়গীরদার, সুবেদার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব অস্পষ্ট।

প্রথম ব্যক্তি ॥ তবে খুলেই বলি, আমি আকবর বাদশা।

হরিপদ কেরানী ॥ আকবর বাদশা! শাহানশা চিনতে পারিনি, কসুর মাপ করবেন।

আকবর বাদশা ॥ কিছু কসুর হয়নি হরিপদ, কসুর মানুষের পোশাকগুলোর, ওদের ষড়যন্ত্রেই কেউ বাদশা, কেউ কেরানী।

হরিপদ কেরানী ॥ হুজুর, আমরা বাঙালীরা, জাত-সাহিত্যিক, আমাদের কথা আমাদের দায়িত্বকে ছাড়িয়ে যায়, আর তার জন্যে অনেক সময়ে বিপদেও পড়ি আমরা।

আকবর॥ কিছু বিপদ হয়নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

হরিপদ॥ হরিপদ কেরানীর দলের যথার্থ আশ্রয় গাছতলা। কিন্তু শাহানশাকে এখানে দেখব আশা করিনি।

আকবর ॥ এই স্থানটি আমার বড় প্রিয়, তার মধ্যে আবার এই ফলের বাগিচাটি, এখানকার সেও, নারঙ্গী, আঙুর, পীচ, ডালিমের তুলনা হয় না।

হরিপদ ॥ ফতেপুর শিকরী আগ্রা, দিল্লির রাজপ্রাসাদে কি এসব দুষ্প্রাপ্য?

আকবর॥ সেখানে এসব দেখি থালায়, এখানে গাছে, দুয়ে তফাৎ আছে।

হরিপদ॥ শেষ পর্যন্ত থালাতে ওঠবার জন্যেই ওরা গাছে ফলে।

আকবর॥ থালায় ওরা সুস্বাদু, গাছে ওরা সুন্দর।

হরিপদ॥ সৌন্দর্য কি রাজপ্রাসাদে দুর্লভ?

আকবর॥ রাজপ্রাসাদে যে সৌন্দর্য তা মুগ্ধ করে, তাতে কেবলই সুখ।

হরিপদ॥ আর কি দিতে পারে সৌন্দর্য! দুঃখ?

আকবর॥ সুখও নয় দুঃখও নয়, দুয়ে মিশিয়ে আর একটা কিছু।

হরিপদ॥ বুঝতে পারলাম না শাহানশা।

আকবর॥ রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য মনকে ভোলায় মনকে দোলায় না। ফলের বাগিচায় যে সৌন্দর্য দেখি তা একই সঙ্গে সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে কল্পনাকে আঘাত করছে, তবে ত কল্পনা চলে।

হরিপদ॥ সেই সৌন্দর্য দেখবার আশায় বাদশা এসেছেন এখানে?

আকবর॥ সৌন্দর্য দর্শন অনেক শুভ-যোগাযোগের ফল, কালেভদ্রে দর্শন মেলে।

হরিপদ॥ কেন, এই ত ফলে রয়েছে সিঁদুর মাখানো পীচ, সোনার রঙের সেও। ফুলে ফলে পাতায় আবিরগুলাল ছড়াচ্ছে—অভাব কি?

আকবর॥ ঐ ত বললাম শুভ যোগাযোগ। সবই আছে কিন্তু যেভাবে যে পরিবেশে থাকলে সুন্দর বলে মনে হয় তা হয় ত নেই।

হরিপদ॥ এ যেন আশাভঙ্গের দুঃখ বলে মনে হচ্ছে।

আকবর॥ দুঃখ বই কি।

হরিপদ॥ কি আশ্চর্য! হিন্দুস্থানের বাদশার মনেও দুঃখ!

আকবর॥ দুঃখের প্রকৃতির তুমি কি জানো! হিন্দুস্থানের বাদশা কি এত বড় অভাগা যে দুঃখের স্বাদ জানে না।

হরিপদ॥ আমাদের ত তাই ধারণা।

আকবর॥ দুঃখের স্বাদ যে পায়নি সৌন্দর্য কী তা সে জানে না, প্রেম কী তা সে জানে না!

হরিপদ॥ এক নিশ্বাসে সৌন্দর্য আর প্রেম।

আকবর॥ বিধাতার এক দীর্ঘ নিশ্বাসেই যে ওদের জন্ম, মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসের দাক্ষিণে হওয়ায় যে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে যুগল প্রজাপতির মত।

হরিপদ॥ প্রেম আর সৌন্দর্য!

আকবর॥ আসলে ওরা দুই নয়, এক, যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করি বলি সৌন্দর্য, যখন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি বলি প্রেম।

হরিপদ॥ সিংহাসনে বসে এত কথা ভাববার সময় কোথায় শাহানশা।

আকবর॥ সিংহাসনে যে বসে সে ভাবে না, বরঞ্চ অনেক সময় লোকে ভাবিত হয়ে ওঠে তার দৌরাত্ম্যে।

হরিপদ॥ তবে?

আকবর॥ চিরদিন ত সিংহাসনে ছিলাম না।

হরিপদ॥ সে ত বাল্যকালে।

আকবর॥ হাঁ বাল্যকালের কথাই বলছি। তুমি জানতে চেয়েছিলে কখনও সুখ পেয়েছি কিনা। একবার সুখ পেয়েছিলাম—সেই সুদূর বাল্যকালে।

হরিপদ॥ শুধু একবার?

আকবর॥ শুধু একবার।

হরিপদ॥ কৌতূহল হচ্ছে সম্রাট।

আকবর॥ তবে বলি শোন—একথা আর কেউ জানে না।

হরিপদ॥ আর কেউ জানে না?

আকবর॥ না। কাকে বলব। আমার দরবারে গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত সভাসদ সেনাপতি যথেষ্ট আছে, চাটুকারের সংখ্যাও কম নয়। অভাব শুধু মনের কথা বলবার লোকের।

হরিপদ॥ আমার পরম সৌভাগ্য আজ।

আকবর॥ তখন হুমায়ুন বাদশা দিল্লির সিংহাসনে, আমার অখণ্ড অবসর। একাকী অশ্বারোহণে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতাম পাহাড়ে পর্বতে। একদিন তখন বয়স চৌদ্দর মধ্যে, এলাম এখানে। তখন এ বাগিচা ছিল না, এসব পরে অনেক যত্নে তৈরি করেছি, কেন করেছি সব শুনলে বুঝতে পারবে। তখন ছিল গোটা কয়েক পীচ আর সেও গাছ। দূর থেকে দেখতে পেলাম জাফরানী রঙের শাড়িপরা একটি বালিকা, আমার বয়সী হবে, একটা সিঁদুরে পীচ পাড়বার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে, কিন্তু নাগালে পাচ্ছে না। তার সেই ঊর্ধোত্থিত বাহুর চেষ্টা, উন্মুখ দৃষ্টি—গুণী কণ্ঠে বিতালিত একখানি সুরের মত, বড় অপূর্ব লাগল আমার চোখে। অপূর্ব, হরিপদ, অপূর্ব! সুন্দর নয়, শোভন নয়, লোভন নয়, অপূর্ব! এ অভিজ্ঞতা জীবনে একবার মাত্র আসে; দ্বিতীয়বার এলে আর অপূর্ব থাকে না, তখনই জেগে ওঠে পুরুষের পক্ষে পৌরুষ, নারীর বক্ষে নারীত্ব! আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময়ে হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙল তার কণ্ঠস্বরে, ঝরণার জলে আলোর চমকের মত সে কণ্ঠস্বর, সে বলল, দাও-না পেড়ে আমাকে ফলটা।

হরিপদ॥ এত বড় দুঃসাহস তার, কোথায় হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা, কোথায় গ্রাম্য বালিকা।

আকবর॥ ও পরিচয় পরিচয়ই নয়। এযে প্রথম পুরুষের কাছে প্রথম নারীর মিনতি। মনে পড়ল আদিম নরনারীর রূপকথা, তাদের মতই আমিও নির্বাসন বরণ করতে রাজি ছিলাম। কি হবে সিংহাসনে হরিপদ। যাকগে। তখন ঘোড়া থেকে নেমে হাত বাড়ালাম ফলটার দিকে। কিন্তু ফল আর ধরতে পারিনে। মেয়েটি বলল, সবই যদি বললাম নামটা আর লুকিয়ে কী লাভ, আমিনা বলল, 'ও কী রকম, ফলটার দিকে তাকাও, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে ফল ধরতে পারবে কেন?' আমি বললাম ফলটাকেই দেখবার চেষ্টা করছি। কোথায়? তোমার চিক্কণ কপালের আরসীতে। আমার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল সে—মনে হল এ পর্যন্ত সিরাজের যত বুলবুল গান সমাপ্ত করবার আগেই উড়ে গিয়েছে সব যেন একযোগে কূজন করে উঠল। আমিনা বলল, খুব লোককে ফল পাড়তে ডেকেছি; থাকত রহিম। রহিম কে? মিশলো প্রথম বিন্দু ঈর্ষার বিষ প্রেমে, প্রেম

আর ঈর্ষা নিকটতম প্রতিবেশী, যেমন কলহ ওদের মধ্যে তেমনি প্রণয়, বেশিক্ষণ কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। রহিম কে? রহিমকে চেনো না, আমার বড় ভাই। স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেললাম। তখন ফল পাড়লাম ঝুড়ি ভরে আর এখানে এই পাথরটার উপরে পাশাপাশি বসে কাড়াকাড়ি করে দুজনে খেলাম সেই ফল। এই পাথর-খানাই আমার প্রথম রাজসিংহাসন। পরে হলও তাই, এখনি বুঝবে কেমন করে হল।

হরিপদ॥ এ যে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত।

আকবর॥ এবং সত্য। আমিনার কাহিনী বলি শোন, এতদিন কাউকে বলতে পারিনি, মনের মধ্যে ভার হয়ে রয়েছে। কাছেই সাহুগঞ্জে ওদের বাড়ি, বাপ ফৌজদারের অধীনে দারোগা, ছেলে আর মেয়ে রহিম আর আমিনা।

হরিপদ॥ শাহানশা থামলেন কেন?

আকবর॥ কি বলব ভাবছি, কেমন করে প্রকাশ করব ভাবছি, বাইরে থেকে এ সামান্য, ভিতরের দিকে এর গুরুত্ব, তা কেবল কবির কলম প্রকাশ করতে সক্ষম। কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে সেই একদিন যে নিষ্ফল আনন্দ পেয়েছিলাম হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসেও সারাজীবনে তার জুড়ি মেলেনি।

হরিপদ॥ তারপরে?

আকবর॥ মেয়েটি তখন পরিচয় জানতে চাইল আমার। প্রথমে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু শেষে যখন পীড়াপীড়ি শুরু করল, মনঃস্থির করলাম, দেব নির্ভয়ে আমার পরিচয়। তার হাতখানা ধরে মুখের দিকে চেয়ে যখন উদ্যত হয়ে উঠেছি, এমন সময়ে অদূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি। চেয়ে দেখি বৈরাম খাঁর পিছনে আমার অনুচরবর্গ! তারা ঘোড়া থেকে নেমে একযোগে কুর্নিশ করে শাহানশা বলে আমাকে অভিবাদন করল, জানাল হুমায়ুন বাদশা অকস্মাৎ মারা গিয়েছেন। তারপরের ইতিহাস সুবিদিত।

হরিপদ॥ সে ইতিহাস কে না জানে? আকবর বাদশার অভিষেক হল বিনা আড়ম্বরে, নির্জন প্রান্তরের একখানা পাথরের আসনে।

আকবর॥ এই সেই নির্জন প্রান্তর, এই সেই পাথরের আসন।

হরিপদ॥ আর আমিনা?

আকবর॥ সে এতই নগণ্য তাকে কারও চোখেই পড়ল না। বাদশার ঘরে বেগম আছে প্রেয়সী নেই। তখনি রওনা হতে হল দিল্লিতে, ভাবলাম ফিরে এসে আমিনাকে সংগ্রহ করব, এখন ত আমার প্রতাপের জাল রাজ্য জুড়ে। হায় তখন কে জানত জালে মাছ ধরা পড়ে, পদ্মিনী ধরা পড়ে না।

হরিপদ॥ পরে আর কি তার সন্ধান করেননি।

আকবর॥ এখানে ফিরে এসে সন্ধান করতে পাঁচ বছর সময় কেটে গেল। কেউ তাদের সন্ধান দিতে পারল না—কোথাও তারা নেই। তখন এখানে আমিনার কথা মনে করে ফুলফলের বাগিচা তৈরি করলাম। অনেক টাকা খরচ করলাম। রাজা বাদশার অনেক টাকা, তাই তারা ভাবে টাকা দিয়ে সব শূন্যতা ভরিয়ে তোলা যায়। তারপরে সময় পেলেই এখানে ঘুরে ঘুরে আসি, লোকে ভাবে প্রথম অভিষেকের স্থানটি দর্শনই আমার উদ্দেশ্য। বাসাটা নিশ্চয় ভেঙে গিয়েছে জেনেও গাছটার কাছে ঘুরে ঘুরে আসে মুগ্ধ বিহঙ্গ। কিন্তু ও কি হরিপদ, তোমার চোখে জল কেন?

হরিপদ॥ শাহানশার দুঃখে।

আকবর॥ হরিপদ, চোখের জলের চেহারা আমি চিনি। ও জল যে আত্মগত দুঃখের।

হরিপদ॥ তবে হয়ত তা-ই হবে।

আকবর॥ বল বল শুনি, দেখে নিই চোখের জলে রাজায় প্রজায় মিল আছে কিনা।

হরিপদ॥ বিধাতা ওইখানে মানুষকে কৃপা করেছেন—সুখে মানুষ ছোট বড় কিন্তু চোখের জলে সমান।

আকবর॥ বল শুনি তোমার চোখের জলের শাহনামা।

হরিপদ॥ হায় সম্রাট! হতভাগ্য এক কেরানীর দুঃখ কাহিনী আপনার শ্রুতি-যোগ্য নয়।

আকবর॥ বল কি? সুখের কথা হলে শুনতে চাইতাম না। এ যে দুঃখের কথা! দুঃখে মেলায়। দুঃখের অগ্নিময় সিংহাসনে প্রশস্ত স্থান—অনেকের সেখানে জায়গা, সম্রাট ও কেরানী সেখানে একাসনে সমাসীন।

হরিপদ॥ তাই যদি হয় শুনুন। সুবে বাংলার পূর্ব প্রত্যন্তে ধলেশ্বরী নদী, ধলেশ্বরী নদীতীরে আমার গ্রাম। সেখানে একটি কিশোরী আমার চোখকে মুগ্ধ করে-ছিল, অনেক আকাশকুসুম রচনা করেছিলাম তাকে ঘিরে।

আকবর॥ কী তার নাম?

হরিপদ॥ সহস্রের ভিড়ে যে হারিয়ে গিয়েছে তার নামের কি সার্থকতা?

আকবর॥ ঐটুকুই ত শেষ পর্যন্ত হাতে থাকে, যখন মানুষটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, নামরূপে থেকে যায় সে মনের মধ্যে।

হরিপদ॥ লক্ষ্মী।

আকবর॥ কেন বিয়ে করলে না তাকে?

হরিপদ॥ ঘোর দারিদ্র্য।

আকবর॥ দারিদ্র্য নয় হরিপদ, নসীব! আমার ক্ষেত্রে অন্তরায় ঐশ্বর্য, তোমার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য। তাই বলছি দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য কোনটাই অন্তরায় নয়, অন্তরায় নসীব, অদৃষ্ট। তারপরে?

হরিপদ॥ সম্পন্ন বর এসে তাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে আমার জীবন থেকে।

আকবর॥ তোমার স্বপ্ন থেকেও কি?

হরিপদ॥ স্বপ্ন থেকে তাকে বিদায় করি এমন সাধ্য আমার নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রকলার মত দেখা দেয় সে দুঃখের মধ্যরাত্রে।

আকবর॥ তবেই ত রয়ে গেল, যে-ভাবে রয়ে গেছে আমিনা আমার জীবনে। কিন্তু তুমি সৌভাগ্যবান হরিপদ।

হরিপদ॥ সৌভাগ্যবান আমি সম্রাট?

আকবর॥ সৌভাগ্যবান বই কি! ঐ একটি স্বপ্নের মদিরায় পূর্ণ হয়ে আছে তোমার জীবন। আর আমার? হিন্দুস্থানের বাদশার আকাশ সহস্র বিদ্যুতের প্রভায় উজ্জ্বল, চন্দ্রকলা সেখানে থাকলেও চোখে পড়ে কই।

হরিপদ॥ ভেবেছিলাম সম্রাটের কাছে সান্ত্বনা পাব।

আকবর॥ কে কাকে সান্ত্বনা দেয়! দুঃখের পদ্মপত্রে স্বপ্নের শিশিরবিন্দু সদ্যঃপাতী, রাজা আর ভিখারী দুজনেই সমান তৃষ্ণার্ত।

হরিপদ॥ এ-ও কি নসীব?

আকবর॥ না, এই হচ্ছে গিয়ে সংসারের প্রকৃতি। যা অনিবার্য তাকে ধীর মনে স্বীকার করে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। কতক সুখ আছে যা মেলে না, মিললে হয় ত আর তা সুখকর লাগত না, রাজারও মেলে না ভিখারীরও মেলে না।

হরিপদ॥ তবে।

আকবর॥ বিধাতা সব নেন, নেন না শুধু স্বপ্নটুকু। ঐ দয়াটুকু করেছেন তিনি মানুষকে।

হরিপদ॥ তবু যে তাকে ভুলতে পারি না।

আকবর॥ কেন ভুলবে! জীবনে যে এল না, স্বপ্ন থেকেও যদি সে বিদায় নেয় তবে দুঃখের মধ্যাহ্নে দাঁড়াব কোন্ ছায়াতরুর তলে?

হরিপদ॥ এসব তত্ত্ব কথায় সুখ পাই কই?

আকবর॥ সুখ কেন পাবে? দুঃখের সূচীবিদ্ধ পথেই ত তার আনাগোনা।

হরিপদ॥ হিন্দুস্থানের বাদশাও কি তবে দুঃখী?

আকবর॥ এমন এক আধটা দুঃখ আছে সেখানে আকবর বাদশায় আর হরিপদ কেরানীতে পার্থক্য নেই।

হরিপদ॥ হায় লক্ষ্মী।

আকবর॥ হায় আমিনা।

মনোনয়ন

আশাপূর্ণা দেবী

ন্দ্রাণীর আর অনিরুদ্ধর পরিচয়টা ছিল প্রায় আবাল্যের। সম্পর্কের কোন ক্ষীণসূত্র ধরে বোধ করি এই পরিচয়ের শুরু, তবে সে আর এখন কারোরই মনে নেই। বয়সের ধর্মে হৃদয়-উত্তাপের জ্বালে চড়ে সে পরিচয়টুকু কখন যে এক সময় প্রেমে পরিণত হয়েছিল, সেও হয়ত ওরা দুজনের একজনও খেয়াল করেনি। কিন্তু সেই প্রেম ক্রমশ দানা বাঁধতে বাঁধতে ঠিক যখন একটা পরিণতির অবয়ব নেবার জন্যে গাঢ় হয়ে আসছিল, তখনই হঠাৎ এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল।

অনিরুদ্ধ প্রথমটা কৌতুক অনুভব করেছিল, তারপর ক্রমশ বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। এখন নেমে এসেছে সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কিছুদিন অভিমানাহত চিত্তে দূরে সরে গিয়েছিল। গিয়ে অনুভব করল এটা পাগলামি। এটা ঘোরতর নির্বুদ্ধিতা। ধিক্কার দিল নিজেকে, তারপর এসে দাঁড়াল লড়াইয়ের মাঠে। শক্তিটা একটু বেশীই খরচ করতে হবে, কারণ তৃতীয় ব্যক্তি ততদিনে ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে বেশ একটি স্থায়ী আসন লাভ করে বসেছে।

আর ইন্দ্রাণীর চিত্তলোকে?

সেটা কতখানি, তাই জানবার জন্যেই আজ এত তোড়জোড় অনিরুদ্ধর। আজ এখানে একরকম জোর করেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এসেছে অনিরুদ্ধ। লেকের ধারের বুদ্ধমন্দিরের দোতলার এই নির্জন চত্বরটায়। এনেছে ইন্দ্রাণীর নিজের মুখ থেকে একটা স্পষ্ট কথা শুনতে চায় বলে।

ইন্দ্রাণীর চিত্তলোকে যদি সেই হতভাগা তৃতীয় ব্যক্তিটা একেবারে স্বর্ণসিংহাসনে চড়ে বসে থাকে, তা হলে সেটাই থাক, অনিরুদ্ধ কিছু আর চিরদিন ধরে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কাঙালপনা করবে না।

চিরদিনই শুনে এসেছে, মেয়েরাই পুরুষের হাতের খেলার পুতুল, অলক্ষ্যে কখন সে-পালা বদলাল? যাক, বদলাক পালাটালা, অনিরুদ্ধ কারও খেলার খেলনা হয়ে থাকতে রাজী নয়।

কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেন অনিরুদ্ধ ওকে এখানে ধরে এনেছে। ইন্দ্রাণীর 'ভীষণ মাথাধরা।' 'ভয়ঙ্কর শরীর খারাপ হওয়া' এবং *'একটুও বেরোবার ইচ্ছে না থাকা'* সত্ত্বেও কেন প্রায় জোর করেই ঠেলতে ঠেলতে গাড়িতে তুলেছে—'বেরোলেই সেরে যাবে' আশ্বাস দিয়ে! তাই যতবারই অনিরুদ্ধ নিজের কথাটা পাড়বার চেষ্টা করছে, ততবারই ইন্দ্রাণী, অবোধের ভানে মন্দিরের স্তব্ধতা আর গাম্ভীর্য, পরিবেশের শুচিতা আর সৌন্দর্য নিয়ে পবিত্র আলোচনা জুড়ে দিচ্ছে। অতএব অনিরুদ্ধকে সে আলোচনায় একবারও যোগ দিতে হয়, একটুক্ষণও নিজের উত্তপ্ত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ জ্বালাকে সংবরণ করে রাখতে হয়।

কিন্তু ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল, পুরোহিত উঠে এসেছেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় অবস্থিত দেবমূর্তির আরতির আয়োজন নিয়ে। অনিরুদ্ধ চাপা রাগের স্বরে বলে, "তোমাকে এখানে নিয়ে আসাই দেখছি ভুল হয়েছে আমার। এমন ভাব করছ তুমি, যেন ইতিপূর্বে এখানে কখনও আসনি, যেন এমন বাগান এমন মন্দির জীবনে দেখনি। তার চাইতে গড়ের মাঠের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালে আমার কথা কটা বলবার অবকাশ পেতাম।"

"কথা?" ইন্দ্রাণী আলগা আলগা অবাক চোখ তুলে বলে, "বিশেষ কোন কথা বলবার জন্যেই কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলে আমায়?"

"হ্যাঁ, তাইত!" অনিরুদ্ধ রুক্ষ গলায় বলে, "বাড়িতে থাকলেই ত এখুনি

তোমার সেই অনুরক্ত ভক্তটি এসে জুটবেন? আমি তোমার কাছে আজ একটা শেষকথা চাই ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণী একবার মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে আরও ভালমানুষ-ভালমানুষ মুখে বলে, "শেষকথা চাই! তোমার দাবি শুনে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে যেন কোন কথা লেনদেনের বিজনেস খুলেছিলাম। কিন্তু কবে বল ত? কিছু ত মনে পড়ছে না। আচ্ছা, গোড়ার কথাটা কী?"

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে, রোদে তোলা ফোটোর মত ইন্দ্রাণীর মুখের একটা পাশ অন্ধকার দেখাচ্ছে, আর-একটা পাশ আলো আলো. সেই আলো-আলো গালটার দিকে একবার তাকিয়ে অনিরুদ্ধ কষ্টে আত্মসংবরণ করে ফের আরও রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, "তোমার কথা শুনে কী ইচ্ছে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ওই গালটায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই।"

"চমৎকার!" হেসে গড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রাণী, "ইচ্ছের এ-রকম মৌলিকত্ব সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে তোমাকে কৌশিক দত্তর চাইতে বেশী পছন্দ হয়ে যায় আমার।"

অনিরুদ্ধর দৃষ্টি কোমল হয়ে আসে, গভীর গম্ভীর স্বরে বলে, "ওটা 'মাঝে মাঝে'র জন্যে তুলে না রেখে একেবারে পাকা করে ফেল না ইন্দ্রাণী?"

"এই সেরেছে! তুমিও? গতকাল কৌশিক দত্তও যে ঠিক এই কথাটা বলেছে। আচ্ছা, এসব কথা তোমরা বিলিতী বই পড়ে শেখ বুঝি?"

"থাম।" প্রায় ধমকে ওঠে অনিরুদ্ধ, "তোমার খুকীপনার খেলা রাখ। গতকাল কৌশিক দত্তও ঠিক এই কথাই বলেছে? তার মানে তুমিও গতকাল তাকে ঠিক এই কথাটি বলেছিলে?"

ইন্দ্রাণী একটু ভাববার ভান করে বলে, "তা হয়ত বলেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম। কৌশিক দত্ত প্রকাণ্ড একটা কবিতা গোটা অওড়ালো বই না দেখে, তাই বললাম—"

"থাক, থাক কী বলেছিলে, আর-একবার উচ্চারণ করবার দরকার নেই ইন্দ্রাণী! কিন্তু আমি বলছি কী, এই বেড়াল-ইঁদুর খেলাটা আর কতদিন চালাবে? ওই রাস্কেলটাকে যদি ছাড়তে না পার, আমাকেই রেহাই দাও; এমন করে আর দগ্ধে মেরো না।"

ইন্দ্রাণীও এবার গম্ভীর হয়ে বলে, "তোমায় ত আমি ধরে রাখিনি।"

"রেখেছ বই কি! হাত দিয়ে না ধরলেই কি ধরা হয় না? কিন্তু এই ধরা-অধরার ছায়াবাজি আর নয়, শেষ হক এর। এই শেষকথাটাই চাইছি আজ আমি।"

ইন্দ্রাণী বোধ করি চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, আর বোঝা যাচ্ছে না কিছু, সেই না-বোঝার ছায়া থেকে মৃদু হেসে বলে ইন্দ্রাণী, "কথাটা কিন্তু এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। কী বলতে চাইছ তুমি? এই দেবমন্দিরের আওতায় বসে তোমার কাছে কবুল করতে হবে, 'এই শেষ, আর নয়?' আর কিছুতেই তোমাকে ভালবাসতে পাব না?"

"ইন্দ্রাণী!" গাঢ় স্বরে বলে অনিরুদ্ধ, "তুমি এমন অনায়াসে এমন কঠিন কথা বলতে পার! শেষকথা চাইছি মানে কি এমনি ধারা শেষ? শেষকথা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তুমি কাকে বিয়ে করবে? নিতান্তই যদি কৌশিক দত্তকে না পেলে তোমার জীবন মিথ্যে হয়ে যায়, ত আমি আর জ্বালাতন করতে চাই না। শুধু সেই কথাটা তোমার মুখে স্পষ্ট শুনতে চাই।"

"কী করে বলি বল ত?" কেমন একরকম নিরুপায়-নিরুপায় শোনায় ইন্দ্রাণীর গলার স্বরটা, "যতক্ষণ তোমার সামনে থাকি, মনে হয় বিয়ে করতে হলে কৌশিক দত্তকেই করা ঠিক, তুমি যেন বড্ড সাধারণ—বড্ড চেনা। আর যতক্ষণ কৌশিক দত্তর সামনে থাকি, মনে হয় ও যেন বড্ড বেশী বোকা, বড্ড বেশী হাস্যকর, অতএব বিয়ে করতে হলে তোমাকেই—"

"শুনে ধন্য হলাম।" অনিরুদ্ধ রূঢ় গলায় বলে, এরকম কেন হয় জান ইন্দ্রাণী? তোমাদের এ যুগের মেয়েদের বড্ড বেশী লোভ, বড্ড বেশী চাহিদা বলে। ভারতীয় নারীর আদর্শের কথা তুলছি না, কিন্তু এটাও মনে রেখো, ভাল-মন্দ পূর্ণতা-অপূর্ণতা দুই নিয়েই মানুষের গড়ন, একাধারে সর্বগুণাধার গড়া হয় না। তবু বাছতে হলে ভেবেচিন্তে একটা মানুষকেই বেছে নিতে হয়।"

"সে তো দিনরাত্তিরই ভাবছি গো, মনস্থির করতে পারছি না যে! এইত এখন মনে হচ্ছে তুমি যেন একটি আকাট গোঁয়ার রুক্ষ-সেপাই, কৌশিক দত্ত কেমন শান্ত-শিষ্ট সভ্য ভব্য মার্জিত সুকুমার। অথচ যেই বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই দেখব কৌশিক দত্ত তার সেই ফুলকোঁচানো ধুতির আগাটি মাটিতে লুটিয়ে গিলে-করা ভাঁজটি অটুট রেখেও সোফায় গা হেলিয়ে এমন ভঙ্গিতে বসে আছে যে, দেখে মনে হবে ও যেন অনন্তকাল ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে, তখনই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মনে হয় মেয়েমানুষ হয়ে একটা মেয়ে-মানুষকে আবার বিয়ে করব কি!"

অনিরুদ্ধ হতাশভাবে বলে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইন্দ্রাণী, তোমার মাথার চিকিৎসা করা দরকার।"

ইন্দ্রাণী হেসে ওঠে, "কী আশ্চর্য আমার প্রাণের বন্ধু অনুভাও ঠিক এই কথাই বলে! আচ্ছা, কেউ কোন নতুন কথা বলতে পারে না কেন বলত? সবাই একই ধরনের কথা বলে কেন?"

"কেন, সেটা তোমার সেই ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস কোর।" উদ্ধতভাবে বলে অনিরুদ্ধ।

হঠাৎ পিছনে একটা খসখস শব্দ হয়, মৃদু একটু কণ্ঠস্বরের আভাস।

বৌদ্ধ পুরোহিত ওদের সচেতন করতে এসেছেন, আরতি সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে আর এখানে বাইরের লোকের থাকা বিধি নয়।

আরতি হয়ে গিয়েছে!

কী আশ্চর্য! কখন হল?

অবাক হয়ে গেল ওরা! সেই সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির একবিন্দু ধ্বনিও ওদের কানে ঢুকল না।

গাড়িতে বসে ইন্দ্রাণী দিব্যি আলোচনার সুরে বলল, "আচ্ছা, তোমার কী মনে হচ্ছে বলত? তাহলে কি আমি তোমাকেই সত্যি ভালবাসি? নইলে অমন কানের মাথা খেয়ে গল্প করছিলাম কেন?"

অনিরুদ্ধ এক সেকেণ্ড কী একটা ভেবে নিল, তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল "ইন্দ্রাণী, তুমি জান আমি একটা ভাল কাজ পেয়ে পুনায় চলে যাচ্ছি, ষোল তারিখে জয়েনিং ডেট,—"

"ওমা, তাই নাকি, যাচ্ছ জানি, কিন্তু এই সামনের ষোলই?"

ইন্দ্রাণী আঙুলে গুণে বলে, "মাঝে ত তা হলে মাত্র সাত দিন।"

"হ্যাঁ। এই সাত দিনের মধ্যেই আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করে ফেলতে চাই, মনস্থির করতে এ কটা দিন সময় দিলাম তোমায়,—এর মাঝখানে আর দেখা করে ব্যস্ত করব না। আশা করি এই সাত দিন ধরে অনবরত কৌশিক দত্তকে দেখতে দেখতে নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে তুমি।"

"তা কে জানে?"—ইন্দ্রাণী একটা হাই তুলে বলে, "কৌশিক দত্তও ত বলছিল এই তেরো তারিখ থেকে ওদের কলেজ বন্ধ হবে, দু মাস ছুটি, ত্রিপুরা না শ্রীহট্ট কোথায় যেন বাড়ি ওর, সেখানে যাবে। কাজেই দুজনকেই যদি না দেখতে পাই, দুজনের জন্যেই হয়ত মনকেমন করবে, মনস্থির করব কী করে?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে" দাঁতে ঠোঁট চেপে

বলে অনিরুদ্ধ, "আমার জবাব পেয়ে গেছি। কিন্তু তুমি মনে কোর না ইন্দ্রাণী, বাংলাদেশে তুমিই একমাত্র পাত্রী! আর তুমি ছাড়া আর বউ জুটবে না আমার।"

"বাঃ, সে-কথা আবার কখন মনে করলাম আমি?" ইন্দ্রাণী ছলছলে গলায় বলে, "বরং এখন মনে হচ্ছে হয়ত বা তোমার জন্যেই আমার বেশী মনকেমন করবে। আর পুণা জায়গাটাও থাকবার পক্ষে ভাল।"

"বেশ, আরও এক মাস সময় দিচ্ছি, ঠিকানা রেখে যাব, যদি ইচ্ছে হয় চিঠি লিখে জানিও।" বলে গাড়ির গতি জোর করে দিয়ে নিঃশব্দে চালাতে থাকে অনিরুদ্ধ।

•

দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল অনিরুদ্ধ, নিজে নামল না। ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে দেখল তাদের দুজনের মাঝখানের তৃতীয় ব্যক্তিটি যথারীতিই অধিষ্ঠান করছেন বসবার ঘরে ফুলকোঁচানো ধুতির কোঁচাটি মাটিতে লুটিয়ে, গিলে-করা চুড়িদারের ভাঁজটি না ভেঙে অথচ গা হেলিয়ে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষার ভঙ্গিতে।

দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ঠিকই, তবু হাসতে কার্পণ্য করল না ইন্দ্রাণী। রীতি-মত আপ্যায়িতের হাসি হেসেই বলল, "এই যে আছেন বসে? যা দেরি হল আমার, ভাবনা হচ্ছিল, আপনারও না ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।"

শুনলে লোকের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, কৌশিক দত্ত হচ্ছে ইন্দ্রাণীদের কলেজের অধ্যাপক। বাংলার অধ্যাপক। অধ্যাপকদের মধ্যে বয়সে সব থেকে কম, আর দেখতে সব থেকে সুন্দর।

পড়ানো?

সে ত এমন অদ্ভুত ভাল যে, ক্লাস সুদ্ধ সব মেয়েই প্রায় এই অদ্ভুত ভাল পড়ানো অধ্যাপকের প্রেমে পড়ে বসে আছে। তবে অধ্যাপক নিজে মাত্র একজনেরই প্রেমে পড়েছেন, সে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ক্লাস সুদ্ধ মেয়ের ঈর্ষার আর পরিহাসের পাত্রী। ইন্দ্রাণী অবশ্য পরিহাস গায়ে মাখে না, বরং কৌশিক দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে কতটা হ্যাংলামি আর কী কী ক্যাবলামি করে হেসে হেসে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে সহপাঠিনীদের সূক্ষ্ম ঈর্ষাটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে।

কিন্তু সে যাক। এখন উপভোগ্য রয়েছে আলাদা।

•

ইন্দ্রাণীকে দেখেই কৌশিক দত্ত নড়ে-চড়ে বসেছে। ওর কথায় একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার পণ ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবই।"

"সেই ত হয়েছে জ্বালা। এই দেখুন না, এতক্ষণ ধরে অনিরুদ্ধ ওই একই কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করল। বলে কিনা 'সাতদিন সময় দিলাম, আমায় বিয়ে করবে কি করবে না পাকা কথা দাও।' আচ্ছা বলুন ত, বিয়ে কি একটা বিজনেস যে এভাবে কথা দেওয়া যায়?"

কৌশিক দত্তর ফরসা ধবধবে গোল মুখটা পাকা আপেলের মত টুকটুকে হয়ে ওঠে। গোল মুখ আরও গোল করে উত্তর দেয় সে, "কিন্তু কথা ত একটা

"আমার কী ইচ্ছে করছে জান ইন্দ্রাণী?"

পাওয়া দরকার। অবশ্য তুমি যদি তোমার বাল্যপ্রণয়ীকেই চাও, সে আলাদা কথা, তবে আমিও ছুটির আগে একটা পাকা কথা পেতে চাই ইন্দ্রাণী।" কৌশিক দত্তর কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে ওঠে, "না না, ভুল বলছি, কথা চাই না, তোমাকেই চাই। বল ইন্দ্রাণী, তোমার দাদাকে বলি আমি।"

"এই মরেছে!" ইন্দ্রাণী চোখ কপালে তুলে বলে, "আমার দাদাকে আবার আপনি বলবেন কী? না, না, সে যা বলবার আমিই বলব।"

"কবে আর বলবে ইন্দ্রাণী?" কৌশিক দত্তর দৃষ্টি স্বপ্নালস হয়ে আসে, 'আর কতদিন রইব বসে দুয়ার খুলে?', "আমার কী ইচ্ছে করছে জান ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী চমকে উঠে বলে, "অ্যাঁ, আপনারও কিছু ইচ্ছে করছে?"

কৌশিক দত্ত সন্দেহযুক্ত স্বরে বলে, "তুমি অমন চমকে উঠলে যে ইন্দ্রাণী?

"না। ও কিছু না। মানে, অনিরুদ্ধও একটু আগে বলছিল কিনা, ইচ্ছে করছে—"

"কী ইচ্ছে করছে?" চোখটা জ্বলে ওঠে কৌশিক দত্তর অন্ধকারে নেকড়ের মত, গলার স্বরটা খাদে নেমে যায়, "বলতে বলতে থেমে গেলে যে?"

ইন্দ্রাণী চোরা হাসি হেসে বলে, "না, মানে আপনার কাছে বলতে একটু লজ্জা করছে—"

"লজ্জা করছে!" কৌশিক দত্ত সোজা হয়ে উঠে বসে, "কী বলেছে তোমায় স্কাউণ্ড্রেলটা? ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি তা জান?"

"হ্যাঁ, তা শিক্ষা দিয়ে দেওয়াই উচিত," ইন্দ্রাণী দুঃখ-দুঃখু গলায় বলে, "আমায় বলে কিনা 'ঠাস করে চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে তোমার গালে।' দেখুন তো—"

কৌশিক শিথিল ভঙ্গিতে বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, "আমার সঙ্গে তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয় ইন্দ্রাণী।"

"কী কাণ্ড স্যার, আমি কি ঠাট্টা করছি? এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, সত্যি ও এই কথা বলেছে আমায়।"

কৌশিক দত্ত হঠাৎ সেই গা-ছোঁয়া হাতটা ধরে ফেলে বলে, "ওর কথা তুমি আর আমার সামনে বোল না ইন্দ্রাণী, দোহাই তোমার। তুমি আমায় অনুমতি কর এই তিনদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলে একেবারে তোমায় নিয়েই চলে যাই।"

"ওমা, সে কী! দাদা যেতে দেবেন কেন? উঁহু কক্খনো যেতে দেবেন না। অবিশ্যি ত্রিপুরা জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর।"

"আরও সুন্দর হয়ে উঠবে ইন্দ্রাণী, যদি তোমার পা পড়ে। কিন্তু ইচ্ছে করে ছেলেমানুষের মত কথা বল কেন? আমি কি এমনি নিয়ে যেতে চাইছি তোমায়? বিয়ে করে নিয়ে গেলেও যেতে দেবেন না তোমার দাদা?"

"বিয়ে! ও! তাড়াতাড়িতে অতটা বুঝতে পারিনি। মাপ করবেন। কিন্তু দাদা যে আমার বিয়েতে ভীষণ ঘটা করতে চান, তিন দিনের নোটিসে কি রাজী হবেন?"

আশায় জ্বল জ্বল করে ওঠে কৌশিক দত্তর ঈষৎ সোনালী চোখ দুটো। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে বুক। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, "বেশ, আমি অপেক্ষা করব। বল, কতদিন প্রতীক্ষার শেষে পাব তোমায়?"

ইন্দ্রাণী ব্যস্তভাবে বলে, "না না, সে কী? ছুটিটা মিথ্যে নষ্ট করবেন কেন? এত তাড়াহুড়োর কী দরকার? তার চেয়ে এক কাজ করুন না, আপনার ত্রিপুরার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যান, আমি বরং চিঠি লিখে—"

কৌশিক দত্ত হতাশভাবে বলে, "বেশ! বুঝছি তুমি এখনও মনস্থির করতে পারনি। আশ্চর্য হয়ে যাই ভেবে, কী আছে তোমার ওই অনিরুদ্ধর মধ্যে। ওই ত চেহারা!"

"তা যা বলেছেন!" ইন্দ্রাণী হেসে ওঠে "চেহারায় আপনার ধারেকাছে ও লাগতে পারে না। যাকগে, চা খাবেন ত স্যার্?"

অনিরুদ্ধ সত্যিই সাত দিনের মধ্যে একবারও দেখা করেনি। চলে গেল পুনায়। কিন্তু কৌশিক দত্ত ত্রিপুরা যাবার আগে স্টেশনে যাবার সময় পর্যন্ত দেখা করে গিয়েছে, বিদায় নিয়েছে কাঁপা কাঁপা গলায় —'আশার বাণী' বহন-করা পত্র চেয়েছে তাড়াতাড়ি।

পুনায় চিঠি যায় কৌশিক দত্তর যেন অনুকূলেই। "অনেক ভেবে দেখলাম অনিরুদ্ধ, তোমার সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারলাম না। অনেক জ্বালিয়েছি তোমায়, ছোটবেলার বন্ধু বলে মাপ কোর।"

কিন্তু কৌশিক দত্ত কেন খাম খুলে অমন নীলচে মেরে গেল? কেন তার গোল গোল মুখটা ঝুলে পড়ল অমন করে? ওর চিঠির ভাষাটাও যে প্রায় একই।

"অনেক ভেবে দেখলাম স্যার, কিছুতেই মনস্থির করতে পারলম না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে, ভাবছি আর হাসি পাচ্ছে। হয়ত অনেক বিরক্ত করেছি আপনাকে, ছাত্রী বলে মাপ করবেন।"

ওরা দুজনে যখন চিঠিটা রেখে স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল—ইন্দ্রাণী কিনা শেষটায় ওই একটা বাজে লোককে—,তখন ইন্দ্রাণী ওর বান্ধবী অনুভার উদ্দেশে চিঠি লিখছিল, "কী করব বল্ মনস্থির করার উপায় কোথা? আমি ত সিরিয়াস হতেই চাই, কিন্তু সিরিয়াস হতে পাব এমন লোক ত পাই না। ওরা যখন সিরিয়াস হয় তখন আমার কেবল হাসি পায়। অনেকবার অনিরুদ্ধটার কথা ভেবেছি, কিন্তু বলেইছি ত তোকে, বড্ড বেশী পরিচিত, বড্ড বেশী আটপৌরে হয়ে গেছে ও। ও কথা কইতে গেলেই আমি বুঝতে পারি ও কী বলবে, আমি তাকালেই ও বুঝতে পারে আমি কী বলতে চাই। এই রহস্যহীন জীবন নিয়ে কদিন ঘর করতে পারব? শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলেছি দাদাকেই নির্বাচনের ভার দেব। গলায় মালা দেবার আগে পর্যন্ত বরের মুখ দেখব না, চোখে চোখে চাইব না, ফুলশয্যার রাতে অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে ঘামতে ঘামতে পুলকে রোমাঞ্চিত হব। কী বলিস, আইডিয়াটা খারাপ? তুইও ত বলিস পড়া-বই কিনতে তোর ভাল লাগে না।

ওদের কথা বলবি? তার জন্যেও ভাবি না, ওদেরও ত একই অবস্থা। ওদের মধ্যেও ত একজন অন্তত না-পড়া বই পড়বার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হত? তবে কী জানিস, মানুষের জীবনে রসের প্রয়োজন আছে, আর যে-রসটা হচ্ছে নিষিদ্ধ ফলের। মনস্থির করে স্থির করেছি, সারাজীবন ধরে ওদের প্রেমপত্র লিখব আমি। সে সব চিঠিতে এই কথাটা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে ছাড়ব বুদ্ধির ভুলে তাকে মিস্ করে জীবনে একটা পরম ক্ষতি হয়ে গেছে আমার। কী বলিস এ আইডিয়াটাই কি মন্দ? দেখিস তা হলে ওরাও কোনদিন বুড়িয়ে যাবে না, আর আমিও। না আমি কোনদিন মূল্যহীন হয়ে পড়ব না। পুরুষের আসক্তি দিয়েই ত মেয়েদের মূল্যের পরিমাপ।

খুব খারাপ ভাবছিস আমায়?

কিন্তু কেন? ভেবে দেখ সত্যিই কি খারাপ?

জগতের সমস্ত কাব্যরসই ত এই নিষিদ্ধ ফলের রস। 'স্বামীটি ছাড়া আর আমার কোন অনুরক্ত ভক্ত নেই' এ ভাবতে নিজেকে, ভারী বেচারী-বেচারী লাগে না কি? আমি বলি ঘর সংসার করতে যেমন একটি স্নেহবান হৃদয়বান এবং অর্থবান মজবুত স্বামীর দরকার, তেমনি ঘর সংসারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রেমপত্তর লেখবার মত দু-একটা ভক্ত থাকাও নিশ্চয় দরকার। নয় কি না তুইই বল্। তোর ত বিয়ে হয়েছে, এ রকম না হলে কদিন আর বেঁচে থাকতে পারবি তুই? কিন্তু দেখ এতে আমিও বেঁচে থাকব, ওদেরও বাঁচিয়ে রাখব।"

অথ নাসিকা কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সুদূর মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র রেল স্টেশন। প্লাটফর্ম বলতে বিশেষ কিছু নেই, লাইনের ধারে একসারি পাথরের লম্বা লম্বা ইট পোঁতা, তার ভিতর হালকা করে সুরকি ছড়ানো, তাইতেই যা হয়। সমস্ত অঞ্চলটাই মেঠো আর বিরল-বসতি। স্টেশনের কাছেপিঠে গ্রাম ত নেইই, দূরেও গাছপালার আড়ালে কোথায় কী আছে আন্দাজ হয় না ঠিকমত। তারই মধ্যে এক-খানির নাম ধরে স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে। গাড়ি সমস্ত দিনে তিনখানি আপ, তিনখানি ডাউন। আমি যাব আপ অর্থাৎ উত্তরে। আসতে আসতে বেশ খানিকটা পথ থাকতেই গাড়ি এসে চলে গেল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি রোদ বেশ তেতে এসেছে। প্লাট-ফর্মের মাঝখানে একটি বেশ ঘনপল্লবিত দেবদারু গাছ, তারই নীচে গিয়ে হোল্ডঅল থেকে শতরঞ্চিটা বের করে পেতে বসলাম।

প্লাটফর্মে লোক আর মাত্র দুজন। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি বছর পনেরোর মেয়ে। পাল্কিতে আসতে আসতে দূর থেকেই চোখে পড়েছিল; ভদ্রলোক একটা কী বিছিয়ে শুয়ে আছেন, মেয়েটি দুলে দুলে তাঁর পা টিপছে। রাস্তার উল্টো দিকেই মুখ করেছিল, একবার ঘুরে আমার দিকে নজর পড়তে ভদ্রলোককে বোধ হয় জানাল। তিনিও ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে উঠে বসলেন।

আমি পোঁছে গুছিয়ে বসে আলাপ শুরু করেছিলাম। দুঃখের কাহিনী।...ভদ্রলোক নাম বললেন লক্ষ্মীকান্ত বসু। হ্যাঁ, এটি মেয়েই। আসছেন নগাঁ থেকে; ওই যে তিনটে তালগাছ একসঙ্গে মাথা ফুঁড়ে উঠেছে, ওইখানে। না, বাড়ি ওখানে নয়, বাড়ি ও'দের হল গৈফে, সেও এই রকম স্টেশন থেকে নেমে দু কোশ পথ। পোঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে, তারপর গাড়ি যদি লেট করে এল—প্রায়ই লেট থাকে, এই গাড়িটাই টাইমে এসেছিল—কপাল দোষেই বলতে হবে ইস্টিশনে পা দিতে-না-দিতে ছেড়ে দিল-- উনি যদি আবার লেট করে আসেন ত চিত্তির; মেঠো পথ, সঙ্গে মেয়ে, কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

ক্লান্ত আর কেমন যেন বেশী রকম মন-মরা দেখে আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, অত ভেবে কী করবেন? এমনও ত হতে পারে আজ টাইমে আসবার পালা আছে।'

একটু ম্লান হাসি হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন, 'বড় সুযাত্রা করে বেরিয়েছি কিনা, সব শুনলে ওকথা আর বলতেন না। ওই ত বললুম, গাড়ি টাইমে এল সেও কপাল দোষেই।'

'কী ব্যাপারখানা—যদি আপত্তির কিছু না থাকে...'

শহরের দিকে হলে প্রশ্নটা মুখে বেধে যেত। ভদ্রলোক একটু ঠোঁটে সেইরকম হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন, তার-পর জানালেন, 'না, আপত্তি কিসের? দুঃখের কথা জানাতেই ত চায় লোকে, শোনবার লোক পেলে হালকাই ত হয় মনটা। কিন্তু ফল ত নেই, যাকে শোনানো তারও মনটা না হক ভারী করে দেওয়া, একে ত আমারও গাড়ি টাইমে এসে পড়ায় এই নিগ্রহ... নগাঁয় ও'র এক আত্মীয়ের বাড়ি। পাশের গ্রাম চন্দনায় একটি পাত্র যোগাড় করে মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন, ওদিকে খেতের ফসল তোলার হাঙ্গামায় আর যাওয়া হয়নি— একে সামান্যই, টেনেটুনে বছরটা কোনরকমে চলে, ছেড়ে গেলেই ত পরের হাত তোলার উপর নির্ভর—হাঙ্গামা মিটিয়ে নিয়ে এসেছিলেন মেয়েটিকে, তা...'

প্রশ্ন করলাম, 'হল না?'

কথাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, একটু চুপ থেকে যেন গ্রামটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'না হওয়ারও একটা সামঞ্জস্য আছে। এ যেন এগিয়ে দিয়ে—টেনে নেওয়া ভগবানের। তাইত হয় দুঃখ। সব একরকম ঠিকঠাক হয়ে একটা সামান্য খুঁতের জন্যে গেল ভেঙে—সে খুঁত এমন যে, আজ পর্যন্ত খুঁত বলে কারুর মনে হয়নি, বরং প্রশংসাই পেয়ে এসেছে সবার।'

থেমে গিয়ে ভদ্রলোক একটু অন্যভাবে হেসে মেয়ের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করেই বললেন, 'হ্যাঁরে আদু, বলে দোব কি খুঁতটা? না হয় ঘুরেই চা না ওনার দিকে, দেখুন নিজের চোখে।'

মেয়েটি আমি আসা পর্যন্ত মুখটা

ঘুরিয়ে দুটি হাঁটু জড়িয়ে বসেছিল, মাথায় আপত্তির একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আরও ঘুরিয়ে নিল ওদিকে।

'লজ্জা পেয়ে গেছে।'

একটু হেসেই আমার দিকে চেয়ে বললেন কথাটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কী যে হোল, চোখ দুটো হঠাৎ ডবডব করে উঠল, তারপর কোঁচার খুঁটটা তোলবার আগেই ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি, বললাম, 'থাকগে একথা! আমারই ভুল হয়েছে, জানতাম না ত! স্থির হন আপনি।'

চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন, 'কী যে লজ্জা...আগেকার মতন ন দশ বছরের মেয়ে নয়ত...খায়নি পর্যন্ত...পেটে বেদনার ছুতো করে...কোথায় বেদনা তা আমি বাপ হয়ে কি না বুঝে পারিনে পাগলি?... উফ!...'

কী যে করব, কী বলব ভেবে উঠতে পারছি না। উনি ত চোখে কোঁচার খুঁটটা চেপে ধরেছেনই, বেশ বুঝলাম মেয়েটিও স্থির থাকতে পারেনি, চাপা কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওদিকে।

একটু নিরুপায়ভাবে চুপ করে থেকে মনে করলাম একটু এগিয়ে গিয়েই না হয় শান্ত করবার চেষ্টা করি গায়ে পিঠে হাত দিয়ে, পাড়াগাঁ-ই ত। উঠতে যাব, এমন সময় স্টেশনের বাইরে হঠাৎ একটু চেঁচামেচি উঠতে সমস্ত ব্যাপারটা আপনিই সামলে গেল।

আমি যে-রাস্তা দিয়ে এলাম, সে-রাস্তায় আর-একখানি ছৈ-দেওয়া গরুর গাড়ি আসছিল। আমরা লাইনের দিকে মুখ করে বসে ছিলাম, লক্ষ্য করা হয়নি, গাড়িটি এসে গিয়েছে এবং চেঁচামেচি সেইখানেই।

প্রথমেই আচমকা যে-কথাটা শুনে আমরা তিন জনেই চকিত হয়ে ঘুরে চাইলাম সেটা হচ্ছে—'আমি হচ্ছি মালীঘরার ডাকসাইটে মিত্তির বাড়ির ছেলে—আমার নাম বংশীধারী—আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি চলবে না!'

চড়া গলা। একটি প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরই। ভিতর থেকে একে একে আরোহীরা নেমে আসছে, জিনিস-পত্র নামানো হচ্ছে, উনি এক হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে একটা হাত কোমরে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছেন—

'তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হাত-পা জখম করতে হবে না, গাড়ির ঢের দেরি আছে...নিগ্রহের কসুর হয়নি, এর ওপর আর বাড়াবার দরকার নেই...ট্রাঙ্কটা দুজনে ধরে, দুজনে...মহিম তুমি ভেতর থেকে আংটাটা ধরে আলগে দাও...নাপতে কোথায় গেল?...একটু ধর-না সামনে এসে বাবা, পাওনা যারা গেল বলে তোর যে দেখছি... তা বলে ওই মেয়ে ঘরে আনতুম এইটেই ইচ্ছে তোদের? ...ললিত কোথায় গেল? ...ও ছৈয়ের ওদিকে রয়েছে? না, দেখছি ত, তোমারও মনটা যেন—কী যে বলে...'

গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে দলটা এগুল। বড়র মধ্যে তিনজন, তিনটি যুবা, দুটি বছর বারো তেরো ছেলে, একটি আরও ছোট, একজন নামাবলী গায়ে বামুন পণ্ডিত আর একজন নফর গোছের। হাতে টোপর দেখে মনে হল নাপিত আর উনি পুরুত, আর সমস্ত দলটি বরযাত্রীর দল।

ভদ্রলোক চেঁচাতে চেঁচাতেই আসছেন—'হল নিগ্রহ, কিন্তু দোষটা কার? গোড়াতেই যদি দেখিয়ে দেয় এই আমাদের মেয়ে...নাও ওইখানটায়ই বোস, বেশ ঠাণ্ডা আছে, হীরু, কম্বল দুটো বিছিয়ে দে—আপনাদের অসুবিধে হবে?'

এসে পড়েছেন গাছতলাটায়। বললাম, 'না, অসুবিধে কিসের? জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে। বরং এদিকটায় এসে বিছুতে বলুন, রোদ এসে পড়বে। কোনদিকে যাবেন?'

'আপে গাড়ির ত দেরি আছে এখনও? আজগুবি দেশ মশায়, কোন গাড়ি কখন আসবে, ওদিকে মেয়ের বাপ সে সাধু কি ধাপ্পাবাজ দাঁড়াবে—কিছু হদিস পাওয়ার জো নেই এ-দেশে।'

বললাম, 'দেরি আছে।...বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন?'

'নিয়ে যাচ্ছি মানে!'—হীরু নাপিত কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে, সবাই বসেছে, উনি বসতে গিয়ে হঠাৎ উগ্রভাবে আমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন, তারপর হাতের ভরে ভারী শরীরটা নামিয়ে দিয়ে সেই ভাবেই বলে চললেন, 'নিয়ে যাচ্ছি কী বলছেন আপনি। বিয়ে ভেঙে দিয়ে ফিরে আসছি।...এইত হয়েছে, আপনি একজন বাইরের লোক, কোনদিকে টেনে বলবার আপনার কোন স্বার্থ নেই, আপনি নিরপেক্ষভাবে বলুন... তার আগে আমার মুখটা ভাল করে দেখে নিন একবার দয়া করে।'

ভদ্রলোক সোজা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কেন দেখানো এভাবে, কী উদ্দেশে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে বললাম, 'মুখ ত দিব্যিই দেখছি।'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কিন্তু নাক কোথায় মশায়!...কুস্তীর বংশ নয় মালীঘরার মিত্তিররা, কিন্তু নাক কোথায়? এই নাক (হাত বুলিয়ে) দুদিকে গালের সঙ্গে প্রায় মিশে এলো বলে—বাবার, তাঁর আগে ঠাকুদ্দার অয়েল রয়েছে বৈঠকখানায় টাঙানো, দেখলে মিলিয়ে দেখতেন পুরুষানুক্রমে কী রকম নেমে আসছে, এর ওপর আমি যদি আবার এক খাঁদা মেয়ে এনে ঘরে ঢোকাই...আপনি ওর নাকটাও তা হলে দেখে নিন একবার... সাধন! একবার ফিরে চাও এদিকে।'

আর ও-মেয়েটির মত নয়। তিনজন যুবকের মধ্যে মাঝেরটি আস্তে আস্তে তুলছিলই মাথা, আর-একটা ডাকে সোজা করে তুলে আমার মুখের দিকে চাইল। বেশ নরম কচি মুখখানি, গৌরবর্ণ, টানা-টানা চোখ। নাকটা ভদ্রলোকের ধাঁচেই, খানকটা চাপা; তবে তাতে তাঁকেও যেমন কুৎসিত করেনি, তেমনি একেও করেনি। ঈষৎ-লজ্জিত, হয়ত একটু কাতরও, মিষ্টি মুখটার ওপর দৃষ্টিটা আটকে গিয়েছিল, ভদ্রলোকের প্রশ্নে চকিত হয়ে উঠলাম, 'দেখলেন ত?...আমার ছেলে, এরই বিয়ে দিতে এসেছিলুম। দেখলেনই ত আমার চেয়েও এক ডিগ্রি নেমেছে। এখন আপনিই বলুন, যদি এখনও সাবধান না হওয়া যায়, এই বোঁচার স্কন্ধে অর-এক বোঁচ এলে...'

'তা বলে ভেঙে দিয়ে আসা একেবারে... না এগুলেই ত ভাল ছিল।'

ও'র কথাগুলো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল রাগের মাথায়; তা ভিন্ন আমার সামনেই চেহারার খুঁত নিয়ে ঠিক ওই ধরনের এক ট্র্যাজেডী, মনটা খিঁচড়ে এসেছে, একটু বিরক্তভাবেই কথাগুলো বলে থাকব, বংশীধারীবাবু একটু যেন দমেই গেলেন। তারপর —'আপনিও তা হলে...' বলে আবার পূর্ববৎ খাপ্পাই হয়ে উঠলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়ে আসতে হল ভেঙে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না বের করলে চলে? তোমার খাঁদা মেয়ে তা সে কথা লুকিয়ে ওরকম ধাপ্পা দেওয়ার দরকার কী? ওই মহিম রয়েছে, ছেলের মামা, ও ত মিছে কথা বলবে না। যখন মেয়ে দেখতে এল—ও আর ওই ললিত এসেছিল—বলুক ওরা।' দিব্যি নাকওলা মেয়েই ওদের দেখায়নি তখন? কি গো ললিত?

সমস্ত দলটি স্বভাবত ঝিমিয়ে গিয়েছে। মহিম আমার দিকে চেয়ে একটু মগ্নকণ্ঠেই বললেন, 'আমাদের ত অন্য মেয়েই দেখিয়েছিল। তঞ্চকতাটুকু না করলেই হত।'

ললিত একটু আড়ে চেয়ে বললেন, 'রাত্তিরে দেখা, অনেক দিন হলও, অত মনে নেই। তা হয়ই যদি ত এ-মেয়েও পড়ে থাকবার নয়।'

'শুনুন। ললিত আমার ওপর চটেছে। পড়ে থাকবার কথা হচ্ছে কী? কিন্তু... সাধন, আর-একবার ঘুরে চাও।'

একবারেই হুকুম তামিল করবার মত কড়া গলা এবার, সাধন এবার আর ইতস্তত না করে ঘাড়টা তুলে চাইল আমার দিকে। বংশীধারীবাবু বললেন, 'আমার কাছে ত তঞ্চকতা নেই, বেশ ভাল করে দেখে নিন। ওই

ধাপ্পাবাজির মধ্যে পা বাড়িয়ে দিলে কী সর্বনাশটা ডেকে আনা হত। একটা গোটা বংশ, সব আছে, নাক নেই, নেমে যেতে যেতে বিলকুল লোপাট! ভাবতে পারেন?'

ললিত একটু বিরক্ত হয়েই মুখটা ঘুরিয়ে বললেন, 'যদি হত সর্বনাশ—যেমন তুমি বলছ—চীনেরা জাপানীরা যখন টি'কে আছে তোমার বংশও থাকত টি'কেই—ভালভাবেই টি'কে, তাদের তুলনায় সাধন তোমার ত খগরাজ গরুড় বলতে হবে।'

'শুনে রাখুন মশায় কথাটা!...সাধন। অত অবাধ্য হয়েছ কেন? খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে রাখতে কী হয় মুখখানা?'

এতক্ষণ হুকুমই ছিল, এবার রীতিমত রাগ। সাধন আবার ফিরে চাইলে বললেন, 'না, গোমড়াপনা করবে না মুখ, তাতে নাকে ইতর-বিশেষ হয়ে ধোঁকায় ফেলতে পারে ও'কে। ...এইবার দেখুন মশায় ভাল করে। ললিতের ওটা রাগের কথা হল না? এই ছেলেকে খগরাজ গরুড় বলতে হবে?... আর তাই মনে করে মালীঘরার মিত্তির বংশের ছেলে আমি—একজন ধাপ্পাবাজি করে তার খাঁদা মেয়েকে যে গাঁছয়ে দিতে চাচ্ছে...তা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে...'

একটু ব্যঙ্গের হাঁসি হেসেই বললাম, 'কিন্তু যাদের একেবারে ঘাড়ে কুড়ুল পড়ল...'

'পড়তে পারল কোথায় মশায়? টাকার জোর আছে, আগে বোধ হয় কথাও হয়ে নাকের জন্যে ভেঙে গিয়ে থাকবে। পাশের গ্রাম থেকে সেই পাত্র আনিয়ে...'

'তা আপনিও না হয় খাইটা বাড়িয়ে দিতেন, এমন একটা দাঁও...'

মনটা ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম কাজ কী, পরের কথায় যাব না। কিন্তু ক্রমেই ভদ্রলোককে ব্যাপারটা তিক্ত করে তুলতে দেখে মনে হল, তা হলে ভাল করেই মিষ্টি মিষ্টি দু কথা শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দিই। কিন্তু এই সময় একটা ব্যাপার হতে মাঝপথেই থেমে যেতে হল।

লক্ষ্মীকান্তবাবু এতক্ষণ মুখটা একেবারেই ওদিকে করেছিলেন, আঘাতটা একেবারে সোজাসুজি গিয়ে পড়ছে ত, আমার এই ভাব পরিবর্তনে ঘুরে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সব ছেড়ে আমার দৃষ্টিটা একেবারে ও'র নাকের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল—যা এতক্ষণ মোটে খেয়াল করিনি।

মুখটি একটু শুকনো এবং সে তুলনায় নাকটি বেশ বড় এবং বর্তুল। মনটা বংশীধারীবাবু থেকে একেবারে ও'দের দিকে গিয়ে পড়ল,—এই বাপের মেয়ে যখন তখন এখানেও দেখছি নাকেরই ট্রাজেডি—ওদিকে স্বল্পতায়, এদিকে বাহুল্যে।

তা হলে কিন্তু কোনদিকে যায় মানুষ? সমস্যাটা একটি বিষন্ন প্রশ্নে ঘনিয়ে উঠছে মনে এমন সময়ে নিশ্চয় হঠাৎ সব কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই এতক্ষণ পরে মেয়েটিও ঘুরে চাইল।

চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়ে মনের সব জ্বালা কোথা দিয়ে গেল নেমে। দুর্লভ মুখ একখানি। টানা-টানা বিহ্বল চোখ, চাপা ঠোঁট। বিশেষ করে নাকটি। পুরন্ত গোলছাঁটের সুডৌল মুখে বাপের ওই নাকই তার পরুষ বর্তুলতা হারিয়ে কী বাহার করে ঠোঁটের কাছাকাছি পর্যন্ত যে নেমে এসেছে, যেন চোখ ফেরানো যায় না।

দেখা অবশ্য আধ মিনিটও নয়, ফিরিয়ে নিয়েছে মুখটা। আমি কিন্তু মন স্থির করে ফেলেছি। হেসেই মিষ্টি মিষ্টি করে "দাঁও"-এর কথা বলতে যাচ্ছিলাম বংশীধারীবাবুকে, সেই হাসিটাকে মোলায়েম আর রুচিকর করে নিয়ে বললাম, 'না, রাগ করবেন না বংশীধারীবাবু, দাঁও মারাটা দুনিয়ার চাল হয়ে গেছে বলেই বলছিলাম, মালীঘরার মিত্তির বাড়ির সন্তান যে তাতে নামবেন না এটা জানাই। তবে...'

হাসিটা আরও বড় করে দিয়ে চুপ করে গেলাম।

ভাব ও ভঙ্গিমার একবারে দিক পরিবর্তনে সবার দৃষ্টি এদিকে এসে পড়েছে, বংশীধারীও একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন, বললেন, 'বলুন, কী বলছেন, থেমে গেলেন কেন?'

একটু শব্দ করেই হেসে বললাম, 'কিন্তু মিত্তির বংশের মর্যাদা কঠোর পরীক্ষার সামনে, আগে থাকতেই বলে রাখছি, মাফ করবেন। বলছিলাম, সত্যিই নাকের জন্যেই এত হচ্ছিল কী? তা হলে আমি এমন বাঁশির মত নাক দিতে পারি—এখনই—এখানেই...'

'কোথায়—চলুন—কথা দিচ্ছি আপনাকে। ...কিন্তু এখানে কোথায়?...'

লক্ষ্মীকান্তবাবুর বিস্ময় বিমূঢ় চোখদুটির উপর দৃষ্টি ফেলে বললাম, 'আদু মাকে একটু ঘুরে বসতে বলবেন না?... নামটিও বোধ হয় আদরিণী?'

ললিতবাবু বললেন, 'এ'রই মেয়ে ত?'

একটু যেন আশঙ্কারই রেশ ছিল, অভাব থেকে একেবারে অতিরিক্ত ত। কিন্তু ততক্ষণে লক্ষ্মীকান্তবাবু উঠে পড়েই ঘুরিয়ে বসিয়েছেন কন্যাকে।

একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন বংশীধারীবাবু। নামটা জেনে নিয়েছেন আমার, ব্রাহ্মণ জেনে ছেলেকে আর ভাবী বধূকে প্রণাম করিয়ে নিয়েছেন। বলছেন, 'যাত্রা অশুভ বলছিলাম শৈলেনবাবু? এমন শুভযাত্রা জীবনে আসেনি। একটা বংশের গোটা ধারাটাই বদলে গেল—চার পুরুষ ধরে কি সর্বনাশের পথে যে নেমে চলেছিল। বরং দেখে নিন আর একবার? বিশ্বাস না হয়ত। ...সাধন!...'

কী যে করবেন, কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। সমস্ত দলটিও যেন কোন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে।... সাধনকে নিয়ে তার বন্ধু দুজন স্টেশনঘরের আড়ালে কোথায় ওদিকে চলে গেল।

কিন্তু মালীঘরার খামখেয়ালী সন্তান, আর এ-নাকের চেয়ে আরও ভাল নাকের অভাবও ত নেই সংসারে, ব্যাপারটা জুড়তে দেওয়া সংগত মনে করলাম না, বললাম, 'শুভযাত্রাই যখন এত, তখন হাতছাড়া করার দরকার কী মিত্তির মশাই? ভাল নাক একটা দুর্লভ ত সংসারে; দেখলেনই ত খুঁজে।'

পুরুতমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আর দিনটিন আছে সামনে?'

কেন জানি না একটু হাসলেন, বললেন, 'একটা ত কালই, এমাসে ওই শেষ, তারপর একেবারে বোশেখের মাঝামাঝি।'

শিউরে উঠলেন বংশীধারী, 'অত দেরী? সর্বনাশ! আরে অত দেরি করতে আছে? কালই।... অবিশ্যি বেহাইয়ের যদি আপত্তি না হয়...'

আশায়, আনন্দে, তার সঙ্গে [illegible] অদৃষ্টের উপর অবিশ্বাসে [illegible] রকম হয়ে গিয়েছেন লক্ষ্মীকান্তবাবু, হাত দু[illegible] এক[illegible] করে বললেন, 'আজ্ঞে আমায় যখন আ[illegible]শ করবেন। গরিবের আয়োজন, তার জন্যে...'

গাড়ি আসার ঘণ্টি পড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বংশীধারী, 'তা হলে মহিম, তুমি এই গাড়িতে ফিরে যাও, তোয়ের থাকতে বলোগে বাড়িতে। আর দ্যাখো, বরযাত্রী যারা অমন করে গা-ঢাকা দিলে, সবাইকে আবার ধরে নিয়ে আসবে—কাল সকালের গাড়িতেই।'

মহিমবাবুকে বললাম, 'চলুন, সাথী হব খানিকটা পথ...'

অনেকক্ষণ কেটেছে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলাম, লক্ষ্মীকান্ত ডান হাতটা চেপে ধরলেন, চোখে জল এসে গিয়েছে। বললেন, 'আপনি যাবেন? সে হতেই পারে না। দুটো দিন...যতই কাজ থাক...'

আরও আপত্তি করে উঠলেন বংশীধারী, 'আপনি যাবেন মানে। ঘটক, আপনি হলেন এযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, আপনাকে কে যেতে দিচ্ছে।'

একটু ক্ষতি হবে। কিন্তু ওই কথা, মালীঘরার মিত্তির বংশের খেয়ালী সন্তান, আর এই নাকের পর আর নাক নেই এমনও ত বলা যায় না—আজ থেকে কাল পর্যন্ত সময়।

হেসে আবার বসেই পড়লাম।

বীরভূমে থিয়েটার

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইতেই মাথায় চাল ঠেকিয়া গেল। 'সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির প্রথম অধিবেশনেই একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিল। অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ এবং 'বিশ্বকোষের' প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু আমন্ত্রিত হইয়া হেতমপুরে রাজবাড়িতে আসিয়াছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক একজন রাজকর্মচারীর অসৌজন্যে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। রাজকর্মচারিগণের অনেকেই "হ্যাট কোট" না দেখিলেই মানুষকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাছাড়া নগেন্দ্রনাথকে তাঁহারা চিনিতেন অন্য পরিচয়ে। বীরভূমে সিউড়ীতে তাঁহার সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির জন্য রাজ এস্টেটের সঙ্গে অল্পস্বল্প আর্থিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে তাঁহাকে মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতে হইত, পরিচয়টা সেই সূত্রে। নগেন্দ্রনাথের অন্য পরিচয় তাঁহারা জানিতেন না, জানা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কে হরপ্রসাদ? শাস্ত্রী উপাধি ত, হয়ত টোলের কোন পণ্ডিত আসিয়াছেন কথঞ্চিৎ সাহায্য ভিক্ষায়! অথবা অন্য কোন কারণও থাকিতে পারে, এই পর্যন্ত! সুতরাং যাহা ঘটিবার ঘটিল, আমি উপস্থিত থাকিয়াও ঘটনার প্রতিরোধ করিতে পারিলাম না। ফলে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন সাবধান হইয়া গেলেন। অতঃপর কোন সাহিত্যিক কিংবা ওই ধরনের জ্ঞানী গুণী কেহ হেতমপুরে আসিলে তিনি একক আমার উপরই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিতেন। আদেশ ছিল—"চিরকুট দিয়া ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাহিয়া পাঠাইব; না পাই, যেন কাহাকেও কোন কথা না বলি। এবং নিজে দাম দিয়া বাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করি। পরে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" এই কারণেই আমি স্বনামধন্য শ্রীনামকীর্তন প্রচারক অধুনা নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের সেবার সুযোগ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পর পর কয়েক বৎসরই তিনি স-দলে হেতমপুরে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবরাত্র নামসংকীর্তনের অনুষ্ঠান হইত।

তখন 'সরস্বতীপূজা উপলক্ষে হেতমপুর রাজবাড়িতে খুব ধুমধাম হইত। কবি, ঝুমুরি, লেটো, যাত্রা, কলিকাতার থিয়েটার, কয়দিন ধরিয়া উৎসবের বন্যা বহিত। অনেক অনেক সাহেবসুবা আসিতেন, রাজবাড়ির খরচে কেলনার কোম্পানি তাঁহাদের খানাপিনার ভার গ্রহণ করিতেন। মেলায় নানান জিনিসের প্রদর্শনী বসিত। মেলা জমিয়া উঠিত। পূজার পরদিন শীতলা ষষ্ঠী, ওই দিন সাধারণ গৃহস্থের গৃহে অরন্ধন পালিত হইত। ওই দিনেই মহারাজা রামরঞ্জনের বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি। পোলাওয়ের সহিত মাছ মিষ্টান্নের আয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি আনা দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকিত বলিয়া নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ শুভাগমন করিতেন। বাড়িতে বাসী খাওয়ার হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না, আর সেকালে চারি আনায় অনেক-কিছু পাওয়া যাইত। সুতরাং রথ দেখা এবং কলাবেচার সুযোগ ঘটিত। আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। রাজাদের নিজেদেরই একটি যাত্রার দল ছিল। 'সরস্বতী-পূজায় এই দলের অভিনয় হইত। অন্য সময়ও হইত। বাঁধা স্টেজ ছিল বলিয়া যাত্রার দলের লোক লইয়া এবং বাহির হইতে লোক আনাইয়া মহারাজকুমার মাঝে মাঝে থিয়েটারেরও ব্যবস্থা করিতেন। এইজন্য তিনি বাঁধা স্টেজ তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখার সখ ছিল, গান বাজনা জানিতেন। "রমাবতী" নাম দিয়া নিজে একখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন। বাহিরের লোক আনাইয়া নাচ গান এবং অভিনয় শিক্ষা দেওয়াইতেন। মহারাজা রামরঞ্জনের এক ভাগিনেয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার ম্যানেজার ছিলেন। এই যাত্রা ও থিয়েটার দল উপযুক্ত দক্ষিণা লইয়া নানা স্থানেই অভিনয় করিয়া বেড়াইত। ছেলেবেলায় সিউড়ী বড়বাগানের মেলায় হেতমপুরের যাত্রাদলের গান শুনিয়াছি। থিয়েটার দেখিয়াছি। আমার উপনয়ন উপলক্ষ্যে থিয়েটার দল কুড়মিঠায় আসিয়াছিল। এই থিয়েটারের সূত্রে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিয়া দুই-দশ দিন থাকিয়া যাইতেন। একবার ক্ষীরোদপ্রসাদ বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন হেতমপুরের নিকটবর্তী দুবরাজপুরে সব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতেন। একবার ক্ষীরোদপ্রসাদ আসিয়াছেন, এই উপলক্ষে ছোটখাট একটা মজলিসের অনুষ্ঠান হইয়াছে। নিমন্ত্রিত শচীশচন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন "এই যে, কেমন আছেন?" শচীশচন্দ্র একটু মেজাজে ছিলেন, বলিলেন "কেন, আমার জন্যে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন? ঘুম হয় না বোধ হয়! কই চিঠিপত্র লিখে কোনদিন ত একটা খবরও নেন না। কাকের মুখেও কোন তত্ত্ব নেই। আর আজ দেখেই একেবারে কেমন আছেন!" ক্ষীরোদপ্রসাদ কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পান নাই।

যে-বৎসর আমি বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে হেতমপুরে যাই, হেতমপুরে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই 'সরস্বতী-পূজার সময় আচার্য হরপ্রসাদ হেতমপুরে আসিয়াছিলেন। ইহারই পর বৎসরে 'সরস্বতী-পূজায় কলিকাতা হইতে নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থিয়েটার দল লইয়া হেতমপুরে আসেন। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পুত্র প্রসিদ্ধ সুরকার জানকীনাথ এবং থিয়েটার জগতের স্বনামখ্যাত কর্মবীর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অন্য স্থানে রাখিয়া একটি পৃথক গৃহে অপরেশচন্দ্রকে বাসা দেওয়া হইল। তত্ত্বাবধানের ভার পাইলাম আমি। এইখানেই প্রথম আমি অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হই। অপরেশচন্দ্রকে আদর-যত্ন করার মধ্যে মহিমানিরঞ্জনের অপর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। পূর্বেই মহিমানিরঞ্জনের নাটক লেখার কথা বলিয়াছি। 'রমাবতী' হেতমপুরের স্টেজে অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি পড়িয়া একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। এই নাটকে ফটিক ও ফকির নামে দুইটি চরিত্র আছে। একবার আমি রাজ এস্টেটের তদানীন্তন ম্যানেজার প্রিয়বন্ধু শ্রীবনবিহারী ঠাকুরের সঙ্গে এই দুইটি ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলাম। আর একবার হেতমপুরে

'বাজীরাও' অভিনীত হয়। এই নাটকে আমাকে মলহর রাও হোলকার রূপে স্টেজে নামিতে হইয়াছিল। বনবিহারী সাজিয়াছিল রণজী সিন্ধিয়া। বাস, এই পর্যন্ত, আমার অনুরোধে মহারাজকুমার আর কোনদিন আমাকে থিয়েটার করিতে বলেন নাই। আমার অসম্মতির কারণ, কেহ কেহ আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—শেষে যাত্রার দলেও হয়ত ডাক পড়িতে পারে। যাঁহারা আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন তাঁহারা আবার মহিমানিরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, আমি নাকি 'রমাবতী' নাটকখানির খুব নিন্দা করিয়াছি। মহারাজকুমার আমাকে স্নেহ করিতেন বলিয়া অনেকে আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই আমি এবং বনবিহারী থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করি।

মহারাজকুমার আরও একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, আমি নাম দিয়াছিলাম 'বঙ্গে বর্গী'। নাটক ছাপানো হয় নাই। তাঁহার আশা ছিল অপরেশচন্দ্র এই নাটকখানি দেখিয়া শুনিয়া স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইজন্য বহুদিন তিনি অপরেশ-চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। 'সরস্বতী-পূজার কিছুদিন পরে মহারাজকুমার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের রিপন স্ট্রীটের বাড়িতে অপরেশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। সেইদিন এই নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আলোচনা হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল—বীরভূমে বর্গীর হাঙ্গামা। দিল্লির সুলতানের কন্যা শেরিনা হাফেজ নামে এক যুবককে ভালবাসিয়া ফেলে। শেরিনার পিতা কিন্তু ওসমান নামক একজন ওমরাহপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন নিকট জানিয়া শেরিনা ও হাফেজ পলাইয়া আসিয়া হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। খুঁজিতে খুঁজিতে ওসমান বাঙলায় আসিয়া উপস্থিত হন। এবং বর্গী দলের সাহায্য লইয়া বীরভূমে হাতেম খাঁর গড়ে হানা দেন। বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর। হাতেম খাঁ ছিলেন বীরভূমের অধীশ্বর বাদিওজুমানের অধীনস্থ একজন সামান্য ফৌজদার। তাঁহার আর সৈন্যসামন্ত কোথায়? বীরভূম-রাজা সাহায্য করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণের যুদ্ধেই হাফেজ নিহত হইলেন, ধরা পড়িবার ভয়ে শেরিনাও আত্মহত্যা করিলেন। হাতেম খাঁর নামেই হাতেমপুর, এখন হেতমপুর নামে পরিচিত। হেতমপুরের পূর্ব দিকে গড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার নিকটেই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে শেরিনা বিবির কবর আছে। কিছুদূরে রাঘব বেড়া—এখানে রাঘব নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজনগর-

রাজের একজন তহসিলদারের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে। রাজদরবারে কোন প্রতিকার না পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ কামনায় তিনিও এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়েন। নাটকের ইহাই ছিল বিষয়বস্তু। অপরেশচন্দ্রের পরামর্শ মত নাটকখানি নূতন করিয়া লিখিলাম। লিখিতাম, তাঁহাকে দেখাইয়া আসিতাম, পড়িয়া শুনাইতাম। নাটকখানি অভিনীত হইল না। কিন্তু আমার লাভ হইল অপরেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব।

এই বিষয়বস্তু লইয়া বীরভূমের খ্যাত-নামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক লিখিলেন। ইহার পূর্বেই তাঁহার লিখিত নাটক 'বীর রাজা' কলিকাতার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত প্রহসন 'রাতকাণা'র খ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলশিবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদও নির্মলশিবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, লাভপুরেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। অপরেশচন্দ্র ত কয়েকবারই লাভপুরে আসিয়াছেন। নির্মলশিব এক সময় তাঁহাদের কয়লাকুঠীর কাজ দেখিবার জন্য কিছুদিন রানীগঞ্জে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র বার-দুই রানীগঞ্জের বাসাতেও গিয়াছিলেন। নির্মলশিবের থিয়েটারের শখ ছিল, তাঁহারও থিয়েটারের দল ছিল। নিজে নাট্যকার, ভাল অভিনেতা, সুদক্ষ শিক্ষক। লাভপুরেও থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজ ছিল। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় লাভপুরে নির্মলশিবের হাতে। কিশোর তারাশঙ্কর নির্মলশিবের থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেতমপুর ও লাভপুরের আদর্শেই বীরভূমে শখের থিয়েটারের প্রসার বাড়ে। এখন ত ছুটিছাটায় স্কুলের ছেলেরাও থিয়েটার না করিয়া ছাড়ে না।

নির্মলশিব যখন রানীগঞ্জে, আমি হেতমপুর ছাড়িয়া সেই সময় নির্মলশিবের নিকট চাকুরি স্বীকার করিয়াছিলাম। আমার এক আত্মীয় মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় নির্মলশিবদের রানীগঞ্জ অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। আমি তাঁহারই বাসার নিকট একটি বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক মাস রানীগঞ্জ বাস করিয়াছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্মলশিবদেরও নিকট-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল।

একবার অপরেশচন্দ্র রানীগঞ্জ গিয়াছেন; নির্মলশিবের লেখা নাটকটির কথা উঠিল। অপরেশচন্দ্র নাটকখানি শুনিলেন—'বঙ্গে বর্গী' নামটিও তাঁহার পছন্দ হইল। 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক বিহারীলাল সরকারের একখানি বই ছিল, নাম 'বঙ্গে বর্গী', নামটি আমি বিহারী-লালের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। 'বঙ্গে বর্গী' স্টারে অভিনীত হইবে, কথা পাকা হইয়া গেল। নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আমি অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম। দেখি কলিকাতা শহরের যেখানে সেখানে প্রাচীরপত্র। মনোমোহন থিয়েটারে বঙ্গে বর্গী নাটক অভিনীত হইবে। যতদূর স্মরণ হয় রচয়িতার নাম নিশিকান্ত বসু। দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠ-হার' নাটকের যোগে 'বঙ্গে বর্গী' বহুদিন চলিয়াছিল।

অপরেশচন্দ্র নির্মলশিবের লেখা নাটকখানির নাম দিলেন 'নবাবী আমল'। এ নামও ধার করা, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি বই ছিল, নাম 'নবাবী আমল'। নাটকখানি নূতন করিয়া লেখার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি অপরেশচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া গেলাম।

এই সময় আমি একটা গুরুতর অসুখে ভুগিতেছিলাম। সে একটা অদ্ভুত ব্যারাম। আমি 'চা' খাই না, সকালে অন্য কিছু খাইতাম না। দুপুরে সামান্য ঝোল-ভাত খাইতাম কিন্তু তাহাতেই বৈকালের দিকে মনে হইত যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কী যেন একটা ঠেলিয়া উপর দিকে উঠিত, অসহ্য যাতনা হইত। অপরেশচন্দ্রের ডাক্তার-বন্ধুর সংখ্যা বড় কম ছিল না। কলিকাতার অনেক নাম-করা ডাক্তার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্টার থিয়েটারের নিকটেই রাজাবাগান স্ট্রীটে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি। কারমাইকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক, ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ ভদ্রতার অবতার ছিলেন। যুবক ডাক্তারগণ এই 'সার' অপরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। প্রায় প্রতিদিন বৈকালের দিকে ডাক্তার বসুর বৈঠকখানায় বিরাট একটা আড্ডা বসিত। ডাক্তার মদনমোহন দত্ত, ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়, থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার মনোমোহন পাঁড়ে, আরও অনেকেই আসিয়া সেই আড্ডায় যোগ দিতেন। প্রায়ই পাশাখেলা চলিত। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে প্রচুর জলযোগের যোগান দিতেন। এই আড্ডার আড্ডাধারী আজিও একজন

বর্তমান আছেন, নাম ডাক্তার শ্রীইন্দুভূষণ রায়। সংস্কৃত বহু উদ্ভট শ্লোক ইঁহার মুখস্থ ছিল। মনে হয়, যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। এই সব ডাক্তারের দলও থিয়েটার করিতেন। একবার একটি বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ডাক্তারের দল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' অভিনয় করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় দেখিতেছেন। পার্বতী দয়াল সরযূ শান্তা কে সাজিয়াছিল মনে নাই। মনে আছে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মহিমের ভূমিকায় সাজিয়াছিলেন। শান্তাকে লইয়া তাহার ঢলাঢলি সকলেই সহিয়া গেলেন। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নর্তকীর নাচগান ও বন্ধুবান্ধব লইয়া মহিমের হুল্লোড় দুই-একজন যেন বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ ডাক্তার চুনিলাল হুংকার দিয়া উঠিলেন. "নরেন!" আমরা চমকিয়া উঠিলাম, অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। আমি প্রতিবাদ করিলাম, "এখানে ত নরেন বলিয়া কেহ নাই, স্টেজে ত উনি মোহিত। আর দৃশ্যটা যদি অশ্লীল বলিয়া মনে হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি (চুনিলাল) ডাক্তারবাবু কি নাটকখানি পড়িয়া আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই? অভিনয় দেখিতে না আসিলেই ত পারিতেন।" ডাক্তার আচার্য আমাকে ধরিয়া বসাইলেন। কিন্তু আমাদের অনুরোধে পুনরায় ওই দৃশ্য হইতেই থিয়েটার আরম্ভ হইল।

নরেন্দ্রনাথের পাশার আড্ডায় আমিও যোগ দিতাম। সুতরাং আমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি ঘটিল না। অপরেশচন্দ্রের আতিথেয়তারও কোন কমতি নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যারাম বাড়িয়া চলিল, রাত্রে আমি জল-বার্লি খাইতে ধরিলাম। প্রায় মাসখানেক ধরিয়া যখন এই দুর্ভোগ চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। রাত্রিশেষের দিকে স্বপ্ন দেখিলাম একটি ভাঙ্গা শিবমন্দির, নিকটেই প্রকাণ্ড দিঘিতে কাকচক্ষু জল টল টল করিতেছে। আমি শিবের পূজা দিতে গিয়াছি, পূজক ব্রাহ্মণ আমাকে শিবের চরণামৃত খাওয়াইয়া দিলেন। ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুমাইলাম না। মনে মনে খোঁজ করিতে লাগিলাম, কোথায় সেই শিবমন্দির। মনে পড়িল আমাদের গ্রামের কিছু দূরেই একটি গ্রামের শিবমন্দিরের কথা। লোকে সেখানে অম্লশূলের ঔষধ আনিতে যায়। কিন্তু সেখানে ত বড় দিঘি নাই। মন্দিরের পাশে ছোট একটি কুণ্ড আছে। যাহা হউক মনে মনে শিবের উদ্দেশে পূজা মানসিক করিয়া সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইলাম। দুপুরে ঝোল-ভাত খাইয়া ভয়ে ভয়ে বৈকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন যন্ত্রণা নাই, যেন মন্ত্রশক্তিগুণে সকল ব্যাধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ সহজ অবস্থা। অপরেশচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ কী খাইবেন?" রোজ রোজ জল-বার্লির কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতেন, তিরস্কার করিতেন। বলিতেন "সাহস করুন, জলবার্লি ছাড়িয়া যাহা রুচি হয় পুষ্টিকর কিছু খাওয়া ধরুন, নইলে এমন করিয়া কত দিন বাঁচিবেন" ইত্যাদি। আমার কিন্তু সাহস হইত না। খাবার নামেই ভয়ে বুক কাঁপিত। আজ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "লুচি খাইব।" অপরেশচন্দ্র যেন খুশিতে ভরিয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "সে কী মশায়, এ দুর্বুদ্ধি আপনাকে কে দিলে? বেশ ত জলবার্লি চলছিল, সামান্য তিনটে পয়সার মামলা। লুচির খরচ জানেন?" রাত্রে তিনি লুচিই খাইতেন। সে দিন একটু ঘটা করিয়াই ঠাকুরকে আয়োজন করিতে বলিলেন। রাত্রে এক সঙ্গেই দুইজনে আহার করিলাম। গ্রামে ফিরিয়া শিবের পূজা দিয়াছিলাম। চরণামৃত খাইয়া আসিয়াছিলাম। সেইদিন হইতে প্রায় বিশ বৎসর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। পরে পুনরায় সেই ব্যারামে আক্রান্ত হই। এবার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। কলিকাতায় থাকিয়া প্রায় চারি মাস ধরিয়া কবিরাজী

ঔষধ খাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাই। গত বৎসর পুনরায় তাহাই রূপান্তরে দেখা দিয়াছিল, এবং ডাক্তারের শরণ লইয়াছিলাম, কারণ এবারকার ব্যাধির নাম নাকি করোনারি থ্রম্বসিস!

তখনকার দিনে খুব সদাচারে থাকিতাম, কারণ প্রায় বাড়িতেই থাকিতাম। মন ছিল নির্মল, তাই স্বপ্নে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইতাম। কোন সময়ে ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত, কোন সময়ে বা তাহার প্রতিকার পন্থা স্বপ্নে জানিতে পারিতাম। স্বপ্নেই আমি শ্রীগীতগোবিন্দের নিগূঢ় রহস্যের সামান্য সন্ধান পাইয়াছি। স্বপ্ন আমার অনেক সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের পর অপরেশচন্দ্রের মত শক্তিধর পুরুষ থিয়েটারের রাজ্যে আমার নজরে পড়ে নাই। একাধারে নিপুণ নাট্যকার, সু-অভিনেতা, সুদক্ষ অভিনয়-শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ থিয়েটার-পরিচালক ছিলেন অপরেশচন্দ্র। কিছু পরে দেখিয়াছি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। যুগসন্ধিকারী অভিনেতা, একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অর্ধেন্দুশেখর গিরিশ-চন্দ্র ও অপরেশচন্দ্রের পর এহেন সুনিপুণ শিক্ষকও বাঙলায় আর পঞ্চম জন জন্মগ্রহণ করেন নাই। অপরেশচন্দ্রের নাম আজকাল কেহ স্মরণ করে না। শিশিরকুমারও আমাদের অনাদর অবহেলা সহিয়া গিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে অপরেশচন্দ্র দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে দারুণ বাতব্যাধি প্রায় তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইতে পারিতেন না, ঘাড় সোজা করিয়া হাঁটিতে পারিতেন না। তাহার উপর আবার হাঁপানি ছিল। হাঁপানিতে তিনি মাঝে মাঝেই খুব কষ্ট পাইতেন। এইজন্য নিজে কিছু লিখিতে পারিতেন না, একজন গণেশের দরকার হইত। সুগায়ক রাধাচরণ ভট্টাচার্য এবং জানকীনাথ বসু প্রায় তাঁহার গণেশ-কর্ম করিতেন। অপরেশচন্দ্র জানকীনাথকেই পছন্দ করিতেন খুব বেশী। কারণ জানকীনাথের হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত, বানান ছিল নির্ভুল, আর লেখার সময় তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না। জানকীনাথ কানে একটু কম শুনিতেন।

আমি বহু দিন অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার গণেশের কাজও করিয়াছি। কলিকাতার উপকণ্ঠে নাগেরবাজারে গদাই মল্লিকের বাগানে প্রায়ই তিনি থাকিতেন। সেখান হইতেই থিয়েটারে যাতায়াত করিতেন। ঘুম হইতে উঠিতেন প্রায় বেলা আটটায়। উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইয়া একেবারে স্নানাদি সারিয়া লইতেন। তারপর শুধু এক গ্লাস জল খাইতেন। বাগানে স্টোভে ও কুকারে নিজে রাঁধিতেন। তিনি রাঁধিতে পারিতেন সুন্দর। নিজে যেমন ভোজনবিলাসী ছিলেন, তেমনই খাওয়াইতেও বড় ভালবাসিতেন। খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা ছিল তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস। ঘুম হইতে উঠিয়া একটি ডাবের জল কিংবা মিছরির পানা নিত্য বরাদ্দ ছিল। বৈকালে থিয়েটারে আসিতেন কিংবা গল্পগুজব করিতেন। অপরেশচন্দ্র খুব সুরসিক এবং মজলিসী লোক ছিলেন। রাত্রের খাবারও বাগানে নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইতেন। তাহার পর রাত্রি দশটা নাগাদ লেখা আরম্ভ হইত। বিছানায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতেন। যখন তামাক খাইতেন, সারি সারি আট-দশটি কলিকায় তামাক সাজা থাকিত। একটি নিবিলে আর একটিতে আগুন দিতে হইত। যখন সিগারেট খাইতেন একটা গোটাকৌটা রাত্রেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন, আমি লিখিয়া যাইতাম। বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে থামিতেন। কখনও বলিতেন, "একটু পড়ুন ত।" পড়িতাম। বলিতেন, "আর একটু আগে হইতে পড়ুন।" কখনও কখনও খাতাখানি চাহিয়া লইয়া নিজে পড়িয়া দেখিতেন। এমনই করিয়াই লেখা আগাইয়া চলিত। রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, খাতার উপর ঢুলিয়া পড়িতেছি। দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "যান, শুয়ে পড়ুন গিয়ে, আপনার দ্বারা আর কিছু হবে না।"

লেখার সময় সাবধান করিয়া দিতেন, "ভুল ধরিবেন না। তর্ক তুলিবেন না, যাহা বলিবার পরদিন বলিবেন।" সময় সময় সে কথা ভুলিয়া যাইতাম। ভুল ধরিতাম তর্ক করিতাম। এক-এক দিন রাগিয়া গিয়া খাতাটা কাড়িয়া লইয়া পাতা কয়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সে দিন আর লেখা হইত না। শুনিয়াছি তিনি এক-আসনে বসিয়া দশ ঘণ্টার মধ্যে "সাইন অব দি ক্রশ" অনুবাদ করিয়া আহুতি নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। দেখিয়াছি দিনের পর দিন দিনে রাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চৌদ্দ দিনে 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক লেখাইয়া লইয়াছেন। তিনি বেশী বয়সেই লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আত্মপ্রকাশে তাঁহার জানি না কেন একটা কুণ্ঠা ছিল। ধীরে ধীরে সে সঙ্কোচ দূরীভূত হয়। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি নাটক থিয়েটারে জমিয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি নাটকই থিয়েটারকে আর্থিক সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপরেশচন্দ্রের ভাষা ছিল বড় চমৎকার। তাঁহার রচিত 'অযোধ্যার বেগম', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি হইতে ইহার উদাহরণ মিলিবে। তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'মন্ত্রশক্তি' 'পোষ্য পুত্র' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার হাতে নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অভিনয়শিক্ষায় তিনি অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃত মিত্রের ছাত্র।

লোকে দুর্নাম করিত অপরেশচন্দ্র পরের লেখা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দেন। এ-কথা যে কত মিথ্যা আমি তাহার একজন প্রধান সাক্ষী। 'রামানুজ' নাটক লইয়া এই রকম একটা কথা উঠিলে আমি তাঁহাকে সে কথা জানাই। তিনি ক্ষীরোদ-প্রসাদের লেখা রামানুজ, নিজের লেখা 'রামানুজ' এবং মাদ্রাজ মঠ হইতে প্রকাশিত 'রামানুজ চরিত' আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দেখিলাম, দুইজনে রামনুজ চরিত্রের দুইটি দিক বাছিয়া লইয়াছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ জ্ঞানের দিক দেখিয়া তদনুরূপ ঘটনাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। আর অপরেশচন্দ্র ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। কেহ কাহাকেও স্পর্শ করেন নাই। অপরেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। মাতৃবিয়োগের পর বাড়িতেও মন বসিত না। পিতা বিপ্রদাস কলিকাতায় থাকিয়া এই সময় মাসে মাসে 'পাক-প্রণালী' প্রকাশ করিতে-ছিলেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত যখন বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া প্যাণ্ডোরা নাম দিয়া থিয়েটারের দল খোলেন, অপরেশচন্দ্র সেই দলে যোগদান করেন। এবং এই লইয়া পিতার সঙ্গে সামান্য কথা-কাটাকাটির পর বাড়ি হইতে পলাইয়া যান। বর্ধমান, রানীগঞ্জ ভাগলপুর পাটনা কাশী এলাহাবাদ প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়া আবার তিনি মণীন্দ্রবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িলেন। মাঝখানে একটি কাজ জুটিয়া গেল— সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার কে বি দত্তের পিতা-ঠাকুরকে শ্রীমদ্ভাগবত শোনানো।

অপরেশচন্দ্র কিছুদিন হোরমিলার কোম্পানির অফিসে কাজ করিয়াছিলেন। জীবনের কিছুদিন ঠিকাদারির কাজেও কাটিয়াছিল। ১৩১১ সালের ৩রা ফাল্গুনে মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজাররূপে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হয়। সেই হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি থিয়েটারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অপরেশচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে।

খাওয়ার গল্প করবেন, বানিয়ে বানিয়ে ব… …দেখবেন পেটটা ভরা ভরা লাগছে।

খাওয়া
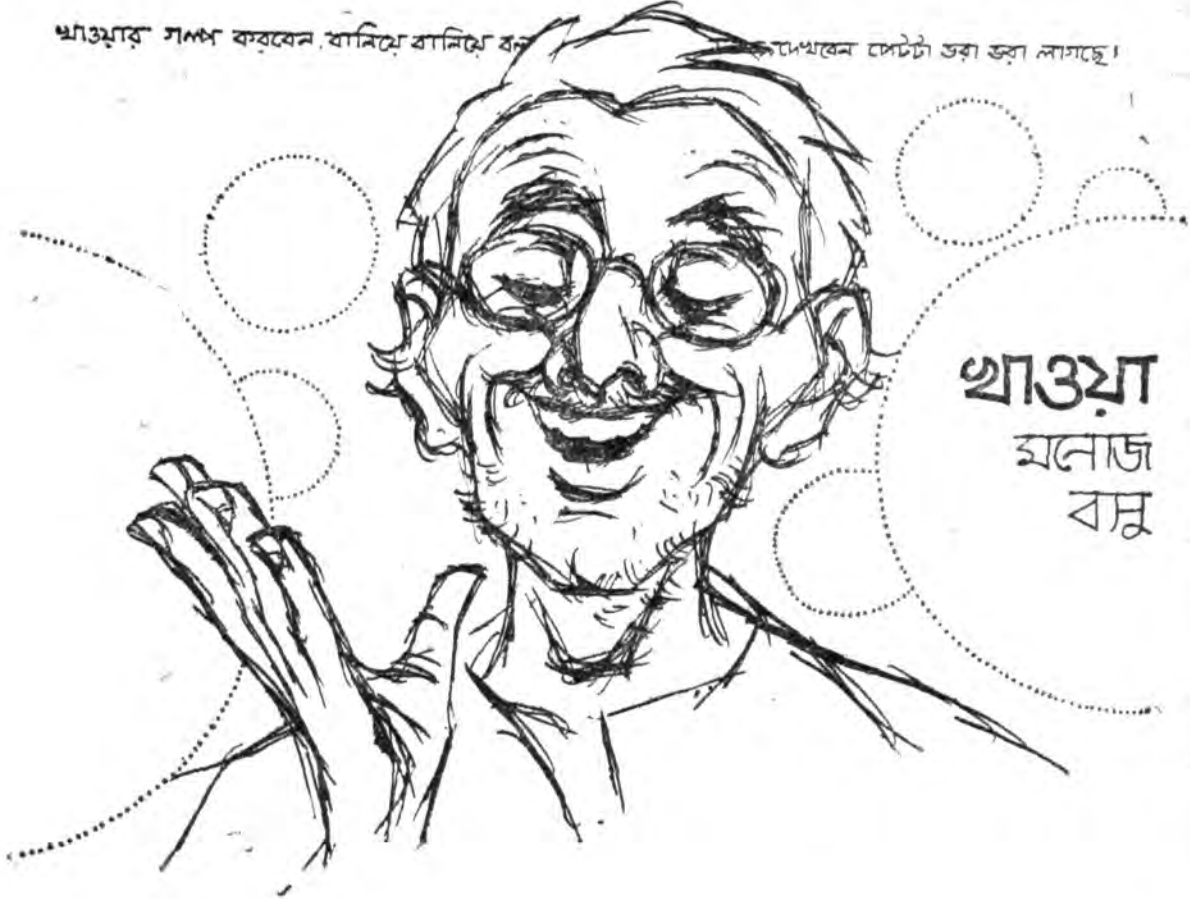
মনোজ বসু

“শহুরে বাবুভেয়ের কথা বলবেন না। পাণ্টলুন-জুতো-জামায় ঢাকা থাকে, তাই। জামা উ'চু করে তুললে চোখ চাওয়া যায় না। পাঁকাটির মত সরু সরু পনেরো-বিশটা হাড় জুড়ে-গে'থে একখানা কাঠামো—একদানা মাংস নেই হাড়ের গায়ে। বাঁচেন না আবার সেই দেহের দেমাকে। এটা ওটা মাখছেন, সাবান ঘষছেন অহরহ। জামা-কাপড় বদলে বদলে পরা হচ্ছে—এখন এটা, তখন সেটা। বিকারের রোগীর বেলা ডাক্তারে যেমন ঘন ঘন ওষুধ বদল করে—এখন রাঙা ওষুধ, দু-ঘণ্টা পরে সাদা ওষুধ, তারপরে বড়ি, তারপরে সবুজ ওষুধ। ও'দেরও সেই রকম। সিকিখানা ফুলকো লুচি আলটপকা টাকরায় ফেললেন, ওই সঙ্গে কণিকাপ্রমাণ মাছ। একঢোক জল খেলেন। খেয়ে ঢেকুর তুললেন: ওঃ, বিষম খাওয়া হয়েছে। এই মানুষ ও'রা। খাওয়ার গল্প ও'দের কাছে করতে যাবেন না। মাথার মধ্যেই ঢুকবে না।”

বিদ্যুৎ-সরবরাহ কি রকম বানচাল হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ থেকে এই অবস্থা। অন্ধকারের মধ্যে আমি এসে জায়গা নিলাম। সুটকেশটার উপরে চেপে বসে টিফিন-কেরিয়ারটা হাতে ধরে আছি। স্টেশনে যত রিফিউজি এসে কায়েমি বাসা বে'ধেছে। সাতজনে দশ ফুট বাই আট ফুট টিনের ঘরে ভাগাভাগি করে থাকে—ভাড়ার অঙ্ক শুনে তাতেও পিলে চমকাবে। হেন অবস্থায় মাঠের মত ঘরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র ভাইব্রাদার নিয়ে পুরোপুরি পা মেলে শুয়ে সংসারধর্ম করছে—দোষ দেব কি, আমিই ত হিংসে করি ওদের। অস্পষ্ট ছায়ার মত একটা দল অন্ধকারে গল্পগাছা করছে। খাইয়ে লোক নিঃসন্দেহ—কেবলই খাওয়ার গল্প। খেতেই যেন এসেছে দুনিয়ার উপর, খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। স্পষ্টাস্পষ্টি ঠিক এই কথাটাই বলছে একজনে।

“বে'চে থাকা খাওয়ার জন্যে। চর্বচোষ্য মজা করে খাব, সেই লোভেই ত কষ্টের জীবন বয়ে বেড়াই। আমাদের রাখাল চক্কোত্তি কবিরাজ মশায়ের কিন্তু আলাদা রকম বুঝ। এক ছটাক পরিমাণ পুরনো সরু চালের অন্ন আর মসুরির ডালের ঝোল খেতেন তিনি। তরকারির মধ্যে একটা পটল আর সিকিখানা কাঁচকলা। সারাজীবন এই খেয়ে গেলেন। স্নানের বিষয়ে বলতেন, ‘যতটা জানি, একবার স্নান হয়েছিল আঁতুড়ঘর থেকে বেরনোর মুখে। আরও একবারের বাসনা রাখি—শ্মশানে যখন চিতায় উঠব, সেই সময়টা। সেই চিতায় ওঠা, হিসেব করে দেখো, একশ'টি বছরের আগে হচ্ছে না। ষোলআনা নিয়ম মেনে চলি, মরণ অমনি হলেই হল!’ আমরা বলতাম, একশ' বছর কি কবিরাজ, একটা বছরও তোমার ঐ নিয়ম মানতে হলে, তার আগে গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরে থাকব। তা-ও বাঁচলেন নাকি কবিরাজ! পঞ্চাশও পুরল না—না খেয়ে খেয়ে পনরো আনা মরেই ছিলেন, একদিন সন্ধ্যাবেলা চিঁচিঁ-গলায় ‘বড়বউ’ ‘বড়বউ’ বার দুয়েক ডেকে চোখ উলটে পড়লেন।

“বড়বউ অর্থাৎ কবিরাজের বউ ঠিক উল্টো মেজাজের। হবে না কেন, কোন্ বংশের মেয়ে! ও'র ঠাকুরদাদা হলেন মুকুন্দপুরের ঘোষাল। আধমুনে মুকুন্দ যাঁর নাম। রায়তোড়ের রাজাবাবু ভোজন দেখে চমৎকৃত হয়ে তিরিশ বিঘে খাস জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর যাঁকে লেখাপড়া করে

দিলেন। কবিরাজ মর-মর বড়বউ ঠাকরুণ জেলে ডেকে সেইদিন পুকুর থেকে বড় বড় দুটো কাতলা মাছ তুলে ফেললেন। পুকুরের মাছ এর পরে ত বারো ভূতে খাবে, ব্রাহ্মণঘরের বিধবা হয়ে তিনি মাছ ছুঁতে পারবেন না। কাতলার দুটো মুড়ো এবং টাকরার সঙ্গে মুগের ডাল দিয়ে ঘণ্ট রেঁধেছেন পরিপাটি করে। ছেলেপুলে হয়নি বড়বউয়ের—মাছ খাবার একলা মানুষ। দুপুরবেলা একটা মুড়ো হয়ে গেছে, বাকিটা রাত্রের জন্য। এমনি সময়ে কবিরাজকে অন্তর্জলীতে নামাচ্ছে, আর শেষ সময়ে জড়িতকণ্ঠে তিনি বড়বউয়ের নাম করছেন। বড়বউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাবে কি করে? রান্নাঘরে খিল এঁটে রাত্রের মুড়োটা চিবিয়ে নিচ্ছেন তাড়াতাড়ি। এই জীবনের শেষ মুড়ো খাওয়া। ঐ অতিকায় বস্তু সাপটানো সহজ নয়, দেরি কিছু হবেই।

"বিধবা হয়ে গিয়ে বড়বউয়ের নিজের মাছ-খাওয়া বন্ধ, অন্য দশ রকমে পুষিয়ে নেন। আর অন্যকে খাওয়ান খুব। খাওয়ালে খানিকটা খাওয়ার সুখ পাওয়া যায়। ছোকরারা খাচ্ছে—বুড়ো অথর্ব অম্বলের রোগী, দেখবেন, সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করছে। কবিরাজের শ্রাদ্ধে ভোজ খেতে বসেছি। বিরাট আয়োজন। কেশরপুর গঞ্জের তৈলাক্ত বাছা বাছা কই, রান্না হয়ে গিয়ে আরও যেন রাজপুত্রের চেহারা খুলেছে। কাপড়ের খুঁট ঢিলে করে মুখোমুখি দু-সারিতে সব বসেছে—খান্না হবে ঐ কই মাছে। এক কুঁড়ি (কই-মাছের কুড়ি চব্বিশটায়, তার উপর দুটো ফাউ; মোট ছাব্বিশ) যে না খাবে, তার নাম ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কইয়ের দু-পাশে কাঁটা থাকে, কাঁটা গলায় বিঁধে গেল ত চিত্তির। কাঁটা কি করে বেরবে, সে ভাবনা পরের। গলাধঃকরণ অসুবিধায় আপাতত হেরে ত গেলেন ভোজের পাল্লায়। কাঁটায় আহত হয়ে রণশায়ী হলেন। সেইজন্যে কায়দাটা হল—কানকোর নীচে থেকে এক-পিঠের মাছটুকু টেনে মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিলেন; উলটে ফেলে তারপর অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ও-পিঠের মাছটুকুও। মাথা ও কাঁটা পাতের পাশে রেখে দিয়ে ধরলেন আর একটা মাছ। হাতে-মুখে খুব দ্রুত চেপে ধরে খাচ্ছেন। লোভ করে মাথা-কাঁটা চিবতে গেছেন কি নির্ঘাৎ হেরে মরবেন। ওগুলো গুনতির সময় লাগবে—হার-জিত নির্ণয় কাঁটা গুনে দেখে।

"রসগোল্লা খাবার নিয়ম—রসটা আধা-আধি পরিমাণ বের করে দেবেন আগে। রসে তাড়াতাড়ি পেট ভরে যায়। আবার রস না থাকলেও চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁত ব্যথা করে। নাম-করা খাইয়ে ইন্দির দা'কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'চিংড়িমাছ কতগুলো খাবেন?' বললেন, 'কী করে বলি ভাই! খাওয়ার পক্ষে ও-জিনিস ভাল নয়। পেটে জায়গা থেকে যায় কিন্তু দাঁতে খিল ধরে গিয়ে চিবতে পারিনে।' সেই ব্যাপার না হয় দেখবেন। সব কাজের একটা হিসাবি-নিয়ম আছে। বহুদর্শিতার ফলে আমার দু-আঙুলের আন্দাজ হয়ে গেছে—আঙুলের চাপে যথাযথ রস নিংড়ে টুকটুক করে মুখবিবরে ফেলছি, আর গিলে ফেলছি। পরিবেষণ করতে এসে বালতি হাতে মানুষ তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। খবর শুনে আত্মীয়কুটুম্বরা ছুটে এল। শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্রী বড়বউ ঠাকরুণও আর পারেন না—বেরিয়ে এসে মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছেন। ঘিরে দাঁড়িয়েছেন সকলে। ভারি জমে গিয়েছে। দাও, আরও দাও—পাঁচ-দশটা করে কতক্ষণ পারবে, বালতি উপুড় কর পাতের উপর। তাই বা কতক্ষণ! হাত-মুখের কাজ এমন দ্রুত, নজর করে দেখা মুশকিল। গুঁটিখেলা দেখেছেন—গুঁটির পর গুঁটি একনাগাড় উঠছে পড়ছে—আমার রসগোল্লা খাওয়াও নাকি তাই। ভাঁড়ারে ওদিকে তোলপাড় পড়েছে, বুঝতে পারছি। মেয়েদের ওদিকটায় রসগোল্লা দেখিয়ে কাজ নেই—কি জানি, কদ্দুরে গিয়ে ঠেকবে বোঝা যাচ্ছে না। খবর নিতে পাঠাও, নিশি ময়রার দোকানে তৈরি রস-গোল্লা কী পরিমাণ আছে। একটাও যেন বাইরে বিক্রি না করে। খেতে খেতে চোখের মণি লাল হয়ে যায় শুনেছি। তাই দেখেই সম্ভবত বড়বউ সস্নেহে বললেন, 'এই অবধি থাক বাবা—আবার একদিন নেমন্তন্ন করব।'

"তারপরে, শোনা কথা অবশ্য আমার—অবেলায় আর একবার স্নান করে নিয়ে বড় এক তোলোহাঁড়ি রসগোল্লাসহ বড়গিন্নী ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। ভোজ সারা হয়ে গেলে হাঁড়িগুলোর চাড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকবে, এই ভেবেই বোধ হয় এমন ত্বরা। রাখাল কবিরাজের শ্রাদ্ধের ভোজে এই কাণ্ড! মরার পরে আত্মা নাকি দেখতে পান সব, কেবল হাঁক পাড়তে পারেন না। কবিরাজ আমাদের সাদামাঠা খাওয়া দেখেই চক্ষু কপালে তুলতেন, 'শুনে রাখ বাপু, লোকে কখনো না খেয়ে মরে না; খেয়ে খেয়ে মরে। তুমি মরবে।' সেই মানুষ ত আগেভাগেই মরে বায়ুভূত হয়ে নিজের শ্রাদ্ধের ব্যাপার দেখলেন। স্ত্রী দরজা এঁটে দিয়ে কী কর্মে রত আছেন, তা-ও নিশ্চয় নজর এড়াল না।

"বড়বউ ঠাকরুণের প্রাতঃস্মরণীয় পিতা-মহ মুকুন্দদেবের কথাও বলি তবে। রায়তোড়ের রাজাবাবুদের বিরাট অতিথি-শালা—মুকুন্দ এসে অতিথি হয়েছেন। যথাকালে নিয়মমাফিক সিধে এসে গেল, চাল-ডাল-ঘি, নুন-মশলা, বেগুন-কাঁচকলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্তা-মা'র খাস দাসী এসে অতিথিশালার ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে যায় অতিথিদের সেবা হল কি না। কর্তা-মা হলেন বড়তরফের যিনি রাজাবাবু, তাঁর গর্ভধারিণী জননী। দাসী গিয়ে খবর দেবে প্রতিটি অতিথি পরিতুষ্ট হয়ে সেবা নিয়েছেন, কর্তা-মা তখন আহারে গিয়ে বসবেন। মুকুন্দ ঘোষাল বারান্দায় চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। সিধের আনাজপত্র যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে, মুকুন্দ স্পর্শ করেননি। দাসী দেখে অবাক, 'আড়াই প্রহর হতে যায়, ভাত রাঁধলেন না ঠাকুর-মশাই?' মুকুন্দ বেজার মুখে বলেন, 'চাল নেই—ভাত হবে কী দিয়ে?' কর্তা-মা'র কানে গেল। দেওয়ানজীর চাকরি যায় বুঝি এবারে। অতিথিশালা তাঁর দেখবার কথা, সরকারের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। রাজাবাবু খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে নিজে তদারকে চলে এলেন, 'কী ব্যাপার, চাল আসেনি কেন?' সরকার হাহাকার করে এসে পড়ে, 'যথাধর্ম বলবেন ঠাকুর-মশায়। নিজে আমি চাল মেপে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

"'কত পাঠিয়েছিলে?'

"'আড়াই পোয়া—'

"মুকুন্দ সহজভাবে হেসে বললেন, 'তাই হবে। বারকোশের একদিকে দেখলাম গোটা-কয়েক চাল। চান করে এসে খিদে পেয়ে-ছিল। কাঁচা চাল ক'টা মুখে ফেলে ঘটি-খানেক জল খেয়ে বসে আছি। ভাত রাঁধবার জন্যে যে ওই ক'টি চাল দিয়েছিলে, সেটা বুঝি কেমন করে? ভাতের জন্য চাল পরে আসছে, তাই ভেবেছিলাম।'

"হৈ-চৈ পড়ে গেল। এতদিনে খাইয়ে মানুষ একটি পাওয়া গেছে বটে! অতিথি-শালা বানানো সার্থক হল। ধামা ভরতি চাল, গামলা ভরতি ডাল এবং বড় ডেকচি এলো। বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে—দরকার মত চাল ডাল নিয়ে এ-বেলাটা খিচুড়ি হক ঠাকুরমশায়ের। রাতে তারপরে ভাল করে দেখা যাবে। স্ফূর্তিতে মুকুন্দঠাকুর রান্না চাপালেন। খাওয়া শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা। খাওয়া দেখবার জন্য লোকারণ্য অতিথিশালায়।

"রাত্রিবেলা পাকশাকের বন্দোবস্ত ভিতর বাড়িতে, অতিথিশালায় নয়। বাইরে অতিথিশালা বলে কর্তা-মা আসতে পারেননি তখন, লোক-মুখে শুধু শুনেছেন। স্বচক্ষে এবারে দেখবেন। সমস্ত আয়োজন

কর্তা-মা নিজের হাতে করেছেন। অধীর হয়ে আছেন, কতক্ষণে সেই ভোজনের শুভক্ষণ আসে। আমিষ-নিরামিশ তরকারির কড়াই, গব্যঘৃতের বোয়েম, তিন হাঁড়ি দই, মিষ্টিমিঠাই-এর ঝুড়ি—বিশাল বাঁগথালার চতুর্দিকে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে মুকুন্দ ঘোষাল বসে গেলেন। এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল অধ্যবসায়ের গুণে সবগুলো পাত্রের মাল সাবাড়। ব্রাহ্মণসজ্জনের শতঅর্ঘ্য বলে পাতে ভাত রেখে যেতে হয়। কিন্তু ভাত যে ক'টি পড়ে আছে, একটা একটা করে গুণেও এক-শ' পুরবে না কিছুতে।

"কর্তা-মা বলেন, 'মেহনত অনেক হয়েছে ঠাকুরমশায়, বিশ্রাম করুনগে। বড় আনন্দ দিলেন। সকালবেলা যাবার আগে ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে যাবেন কিন্তু। দক্ষিণা না দিলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয় না।'

"ছেলেকে বললেন, 'হাতির খোরাক বলে থাকে, মুকুন্দ-ঠাকুর ত একগণ্ডা হাতিকে তল করিয়ে দেন। ঠাকুরের কী সঙ্গতি আছে? খোরাক জোটান কেমন করে? তুমি বাবা ব্যবস্থা করে দাও, ব্রাহ্মণসন্তানকে সিকিপেটা খেয়ে না কাটাতে হয়।' মায়ের আদেশে রাজাবাবু তিরিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর দিলেন মুকুন্দ ঘোষালকে। রাজা নৃপভূষণের গিনিমোহরযুক্ত তায়দাদ বড়বউঠাকরুণের বাপের বাড়ির সিন্দুকে আজও সযত্নে রাখা আছে।

"রাখাল কবিরাজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গাঁয়ের কয়েকটি মাতব্বর বারান্দি ঘোষাল-বাড়ি গিয়েছিলেন। আমার মেজজেঠাও তার মধ্যে। বিলপারের গ্রাম বারান্দি। ওখানকার মানুষের মাছ ধান আর দুধ তিনটে বস্তুর অভাব নেই, খেয়ে ফেলে ছড়িয়েও কুলে পায় না। সেজন্য ইস্কুল-পাঠশালার তেমন রেওয়াজ নেই। বলে, চাকরি-বাকরি করব না কেউ কোনপুরুষে। শখ করে এক-আধখানা চিঠিপত্তর লেখা। সেটুকু বিদ্যের জন্য সারা দিনমান বেঞ্চিতে বসে বকম-বকম করতে হয় না। নাইতে খেতে ঘুমুতে এমনিই এসে যাবে।

"সেই জায়গায় গিয়েছেন মেয়ে দেখতে। মেয়ে পছন্দ-অপছন্দ পরের কথা—গৃহস্থবাড়ি ভদ্রলোকেরা এসেছেন, আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা? বিলপারে আবার গাভ অঞ্চলের মানুষের সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ভাব আছে। মাছ ধান দুধ অঢেল হওয়া সত্ত্বেও ভব্যতার দিকে ও'রা কিছু নিরেশ ডাঙা অঞ্চলের তুলনায়। ভব্য মানুষ স্বল্পাহারী হয়, অন্তত সেই ভাব দেখায় লোকসমাজে। অতএব খাদ্যবস্তু কর্তাব্যক্তিদের পাতে কম করে দিতে হবে। আবার এত কম নয় যে, উপোসী থেকে ফিরে গিয়ে বদনাম করবেন। অনেক বিচার-বিবেচনা অন্তে দশটা করে বড়-সাইজের পারশে মাছ ভাজা দেওয়া হল এক-একজনের পাতে। মাছ-ভাজা অবশ্য প্রথম পদের বস্তু—ঝাল-ঝোল ইত্যাদির মাছ পরে রয়েছে। মেজজেঠা জীবনভোর এই গল্প করে গেছেন। ফিরে এসে শতকণ্ঠে সকলের কাছে তারিপ করেন, 'মেয়ে ফর্সা কাল লম্বা কি ঢেঙা ও-সমস্ত বুঝিনে। এই ঘরের মেয়ে চাপাতেই হবে রাখালের স্কন্ধে। না খেয়েখেয়ে হতভাগা পয়সা জমাবে, খাউন্তি বউ খেয়ে-খেয়ে তা শেষ করবে। জমাখরচের আর জের টেনে বেড়াতে হবে না।'

"বরযাত্রী বাছাই করতে মেজজেঠা উঠেপড়ে লাগলেন। বারান্দির মত জায়গায় যাচ্ছে, উদরে দরাজ স্থান না হলে দুয়ো দেবে কুটুম্বরা, বাইরের চেহারায় কিছু যায়-আসে না—রোগা-ডিগডিগে মানুষ, দেখা গেছে, হাতির মত পালোয়ানকে নস্যাৎ করেছে খাওয়ার ব্যাপারে। মানুষটির যে ওজন, খাদ্য যা টানল তার ওজনও প্রায় তাই। এ-ব্যাপার অনেকে দেখেছেন। আমাদের ইন্দিরদা থাকতে ত হামেশাই দেখতে পেতাম। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি খোল থাকে বোধ হয় ও'দের। পাশবালিশের খোলের মতন। নইলে শুধুমাত্র একটি উদরে অত স্থান কী করে সম্ভব? ভোজ খাঁওয়ার পর ইন্দিরদা ঘাড় নিচু করতেন না, বলতেন, 'টাকরা অবধি উঠে আছে—নিচু হলেই বেরিয়ে আসবে।' একটা হজমিগুলি খাবার কথা কে বলেছিল, ইন্দিরদা বিষণ্নমুখে বললেন, 'অত ঠাঁই থাকলে একটা রসগোল্লাই ত ঢুকিয়ে দিয়ে আসতাম।' ক্ষণজন্মা এসব মানুষ—বেশী দিন মরজগতে থাকতে পারেন না। ইন্দিরদা থাকলে আজ ভাবনা কি ছিল! ভোজের আসরের ঠিক প্রথম পাতাখানায় তিনি বসতেন। তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে পরিবেশকরা তবে ত আসরের ভিতরে ঢুকবে—সেটা বড় সহজসাধ্য হত না।

"বিয়ের রাতের খাওয়াদাওয়া—ভোজ যাকে বলা চলবে না, জলখাবার। অন্নজাতীয় কিছু নয়, লুচি বা ছানা। ছানা সেকালে কর্তাদের আমলে হত, এখন লুচির চলন বেশী। সামাজিক ভোজ হল পরের দিন, বাসীবিয়ের দিনে। মাধ্যাহ্নিকক্রিয়া বলে নিমন্ত্রণ, কিন্তু হতে হতে রাত্রি দেড় পহর দু-পহর। এমনকি, ভোজ সারা হল আর পুবে ফরসা দিয়ে পাখপাখালি ডেকে উঠল, এমনও হয়ে যায় অনেক বাড়ি। বিয়ের রাতের খাওয়া খেয়ে মেজজেঠা বড় মনমরা হয়ে আছেন। অঢেল আয়োজন, উপাদেয় রান্নাবান্না—কোন রকম খুঁত বের করা গেল না। এতজনের মুখের উপর দিয়ে নিখুঁতভাবে ক্রিয়াকর্ম সেরে নামযশ নিয়ে যাবে, দল বেঁধে কি জন্য তবে বিল পার হয়ে আসা? ভোজের প্রসঙ্গ তুলে কেউ কেউ তড়পাচ্ছেন, 'আচ্ছা, দেখ যাবে আজকে সেই সময়।' মেজজেঠা কিছুমাত্র ভরসা পান না। সম্মুখ-সমরে বারান্দির লোকের সঙ্গে পারা যাবে না। কালকের ব্যাপারের পর নিঃসংশয় তিনি একেবারে। উঠতি মুলো পত্তনে চেনা যায়। পনের-বিশখানা লুচি চিবিয়ে যারা এলিয়ে পড়ে তারাই আবার লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ছে!

"আমি বললাম, 'সন্ধ্যে অবধি ভাবনায় অঢেল সময় পাবেন জেঠামশায়। ও'রা চান করতে বলছেন। ভোজে পোলাও—দুপুরবেলা চাল্ডি আঁশ-ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বলি কি, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যাক। শরীর চাঙ্গা হবে, ভোজেও বেশ টান বাড়বে।' তাই হল। ভাতের সঙ্গে তরকারি মোটামুটি সবই আছে। দু-এক টুকরো মাছও পড়বে। তবে কাজের বাড়িতে নিতান্তই আঁশমুখ করানো ছাড়া তাকে কি বলা যায়। দরদালানে বরযাত্রীরা সব খেতে বসেছি। বড়বউঠাকরুনের বাপ নিবারণ ঘোষাল মশায় দশ কাজের মধ্যেও গলবস্ত্রে এসে দাঁড়ালেন, 'নিতান্তই ডালভাত। ভোজ হতে রাত্তির হয়ে যাবে, দয়া করে কোন রকমে পিত্তিরক্ষে করে নিন।' ঘুরে ঘুরে সকলের খাওয়া দেখছেন নিবারণ। কৃষ্ণপদ ছোকরার গলার সুর মিঠে, গানবাজনা করে সে ভাল। কেবলমাত্র খাইয়ে নয়—সব রকমের একজন দু-জন থাকা উচিত বরযাত্রীর মধ্যে। কৃষ্ণপদ সেই সুবাদে এসেছে। আকৃতি মোটা; বুদ্ধিও তদনুরূপ, এই হয়েছে মুশকিল। একটু ক্ষোভেরও কারণ ঘটেছে তার। একবার ডাল দিয়ে যাবার পর কৃষ্ণপদ আবার বুঝি ডাল চেয়েছিল। পরিবেশনের লোক হয় শুনতে পায়নি, নয়ত ভেবেছে—মাছ নিয়ে আসছি, ডাল খাবে কি এখন! মোটের উপর ডাল চেয়ে পেল না কৃষ্ণপদ। গাঁয়ের মধ্যে অন্য সময়ে সে হল কেষ্টা—কিন্তু বরযাত্রী হয়ে এসে এখন সে অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণপদ হালদার, পান থেকে চুন খসলে রেহাই দেবে না। নিবারণ বিনয় করে বলছেন, 'ডাল-ভাত মাত্তোর—কোন রকমে পেট ভরে নেবেন, নইলে নিজেরাই কষ্ট পাবেন।' কৃষ্ণপদ বলে বসে, 'ডাল-ভাত—তার ডাল লাগে।'

'আঁ, সে কী কথা! ডাল পান নি আপনি? কে আছ, শিগ্‌গির ডালের বালতিটা নিয়ে এস ইদিকে।"

"এই বিপুল আয়োজন। বিয়ের ভোজে মাংস দেয় না—আর্ত জীব ভ্যা-ভ্যা করবে গলায় কোপ পড়বার সময়, শুভকর্মের সঙ্গে সেটা খাপ খায় না। ঐ মাংসটা বাদ দিয়ে পল্লীগ্রামে যত কিছু ভাবতে পারা যায়, সমস্ত আছে। আর সামান্য ডাল নিয়ে এ-হেন অপমানের কথা শুনতে হল, নিবারণ দিশাহারা হয়ে পড়লেন একেবারে। 'কী আশ্চর্য, ডাল দেয় নি আপনাদের?' চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার অবস্থা নেই নিবারণের, জ্বলতে জ্বলতে তিনি রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। কী কুরুক্ষেত্র বেধে যায় দেখ এইবার। কেষ্টাকে সকলে গালমন্দ করছে। মেজজ্যেঠা পংক্তির গোড়ায়। হুঙ্কার দিয়ে তিনি সকলকে থামিয়ে দিলেন, 'বকাবকি যা করতে হয়, বাড়ি গিয়ে। এখন অন্য ব্যাপার। কথা যখন একটা বলে ফেলেছে, কোট বজায় রাখতেই হবে। যাক প্রাণ, রোক মান—'

"কথা শেষ হল না, নিবারণ ছুটে এসে ঢুকলেন। পরিবেশনের লোক তাঁর পিছু পিছু—হাতে মালসা-ভরা ডাল। কৃষ্ণপদর কাছে গিয়ে বলেন, 'ইনি নাকি ডাল পান নি। দাও ডাল, আরও দাও—।' পাঁচ হাতা দেওয়া হয়ে গেছে, নিবারণ শুনবেন না। ক্রমাগত বলছেন, 'দাও ডাল—আরও, আরও। ডাল-ভাতের খাওয়া—তা বলছেন, ডাল নেই মোটে।' কৃষ্ণপদ বিপন্নমুখে এদিক-ওদিক তাকায়। ডালের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় বে একেবারে! গতিক বুঝে মেজজ্যেঠা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'শুনুন ও বেহাইমশায়, ডাল ত আমরাও পাইনি। শুধু একজনকে দিলে হবে না।'

'ও, আপনিও পান নি? এদিকে আন মালসা, এঁকে দাও।'

'শুধু আমি কেন, কেউ পায়নি আমাদের মধ্যে। আর ঐ দু-হাতা চার হাতা কী দিচ্ছেন মশায়। মালসা নিয়ে এসেছেন—অমনি মালসা এক-একটা রেখে যান সকলের পাতের কাছে। তার পরে জিজ্ঞাসা করবেন কে আর ক'টা নেবে।'

"নিবারণ হতভম্ব হয়ে যান এক মুহূর্ত। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। বড় ভোজের ডাল নেমে গেছে, তবে আর ভাবনা কিসের? সেই ডালে মান রক্ষা হক, ভোজের জন্য পরে রান্না হবে। কিন্তু বসেছেন ষাটজনে, অত মালসা পাওয়া যায় এখন কোথা? কুমোরবাড়ি লোক ছুটল, সেখান থেকে কতকগুলো আনল। আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি নতুন পুরনো মিলিয়ে জোগাড় হয়ে গেল।

"কন্যাপক্ষ ঐ ব্যাপারে ছুটোছুটি করছেন, আর মেজজ্যেঠা ছেলেদের তাতিয়ে দিচ্ছেন এদিকে, 'ভাবনা কোর না বাপ-সকল। পেট নয়, চামড়ার থলি। দেখতেই ছোট—যত খাবে, ফুলে ফুলে আরও জায়গা করে দেবে। জন প্রতি গড়ে দু-মালসা করে সাপটানো যাবে না? তা হলেই হবে। কোন রকমে গলা দিয়ে নামিয়ে দাও, তার পরে বটতলায় ধীরেসুস্থে বসে বিলের জলে না হয় উগরে দিও। যাক প্রাণ, রোক মান। আমি বুড়োমানুষ মুখ-পাতে আছি—আমি যদি পারি, জোয়ান-যুবো তোমাদের হেরে গেলে হবে কেন?'

"মালসা দেওয়া হল প্রতি পাতার পাশে। ডাল ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে মালসায়। পুরো মালসা নয়, অর্ধেক আন্দাজ। বলে, 'খেতে লাগুন না। যেমন যেমন খাবেন, আবার দিয়ে যাব।' ডাল আর কতই বা রান্না হয়, দশটা ভাল ভাল তরকারির মধ্যে কতটুকুই বা খায় লোকে ডাল! ভোজের ডালও কাবার হয়ে যায়-যায়। দু-হাতে মালসা ধরে চুমুক দিচ্ছি আমরা ডালে। শেষ করে বলি, 'কই—নিয়ে আসুন। ভাতের ফ্যান মিশিয়ে বেশি করছে ডাল, ফ্যান নেই গরম জল মেশায়। ভাতেও কুলায় না। দোকানে ছুটোছুটি করে এর মধ্যে ডাল কিনে নিয়ে এসেছে—কিন্তু কাঁচা ডাল রান্না করবার সময় চাই ত একটা। ততক্ষণে পাত কোলে করে বসে থাকবে মানুষগুলো—বিশেষ করে এই সব বরযাত্রী মানুষ? সময় বুঝে মেজজ্যেঠা আবার একটু ঠাট্টা ছাড়লেন নিবারণের দিকে, 'ও বেহাই মশায়, শুধুই যে হলুদ-গোলা আপনাদের রাঁধা ডাল। জলের মধ্যে ডাল ছাড়তে ভুলে গিয়েছিল নাকি?'

"নিবারণ ঘোষালের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। বরযাত্রী আমরা বুঝতে পারছি, অবস্থা সঙ্গিন। মরি-মরি করে আর দু-পাঁচটা মালসা টানতে পারলেই রণজয় নির্ঘাৎ। পরিবেশনের লোক বলে, 'মাছের কালিয়া একটু চেখে দেখুন না মাঝখানে। নিয়ে আসব? মুখ বদলে নিন। খেলে দেখবেন আরও স্বাদ লাগবে তখন।' এ চালাকি একটা শিশুও বোঝে। সময় চাচ্ছেন ও'রা। মাছের কালিয়া খাওয়া চলবে, বারম্বার এসে এসে মাছ যাচাই হবে—আর সেই ফাঁকে দাউদাউ করে উনুন জ্বালিয়ে ডাল ফোটানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। অন্তত দুটো কড়াই যদি নামিয়ে নিতে পারেন, কোনক্রমে আর পারা যাবে না। হুল্লোড় লাগিয়েছি আমরা অতএব, 'মুখ বদলাতে কে চায় মশাই? ডাল চলছে, তাই আনুন না। ডাল চাই—আরও ডাল। ডালের যোগাড় নেই ত মুখে জাঁক করা কেন ডাল-ভাত বলে?'

"পরিপূর্ণ পরাজয়। নিবারণের আর দেখা নেই। ঘরে দরজা দিয়েছেন, কিম্বা কোন জঙ্গলে গিয়ে বসে আছেন। এত রকম আয়োজন করেও মাথা হেঁট হয়ে গেল ডালের কারণে। একবার আমাদের গ্রামে এসে নিবারণ ঘোষাল মেজজ্যেঠাকে বললেন, 'আস্ত রাক্ষস সব ধরে ধরে বর-যাত্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকে মাছ-মাংস খায়, দই-মিষ্টি খায়। পায়সও খায় কেউ কেউ। কিন্তু মুখপাতে ডালই খেতে লাগল এক মালসা দেড় মালসা। এমন ত জন্মে দেখি নি—।' মেজজ্যেঠা খানিকক্ষণ ধরে হেসে নিলেন, 'কী বলছেন বেহাই মশায়? গিয়েছিল ত রোগাপটকা নিখাউন্তি কতগুলো। থাকত আমাদের ইন্দির—খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দিয়ে আসত। দশ গ্রামের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকত।' আমার পিঠে থাবা মেরে মেজজ্যেঠা বলেন, 'এই আমার ভাইপো। মাছ নইলে ভাত রোচে না। পাকা রুই কিম্বা কাতলা। আশা আছে, কিন্তু খায় কতটুকু? এ-বেলা তিন-চার গণ্ডা দাগা, ওবেলাও তাই। ওজনে কত আর দাঁড়াবে—দেড় সের, সাত পোয়া? এ ছোঁড়াও সেজেগুজে বরযাত্রী হয়ে চলল। ছ্যা—ছ্যা—এ কি আর লোকের কাছে পরিচয় দেবার মতন?'—"

আলো জ্বলে উঠল চারিদিকে। বিদ্যুতের সরবরাহ চালু হয়ে গেছে। খাওয়ার গল্প সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। মানুষগুলো আমার দিকে চেয়ে আছে। শহুরে বাবুভেয়েদের ঠেস দিয়ে গল্পের শুরু—অতএব আমিই ত আসামী একজন। বক্তা লোকটি উঠে আমার কাছে এল, "সার্, কিছু মনে করবেন না। আমরা ভিক্ষুক নই। কিন্তু পুরো দিন পেটে কিছু পড়েনি, চুপ করে থাকতেও পারছি নে।"

টিফিন-কেরিয়ারের দিকে লোলুপ চোখে তাকায়।

বললাম, "আমি রেস্তোরাঁয় খাব। বাড়ি থেকে এটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। খুলে দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু মাছ নইলে যে মশায়ের রোচে না। দু-বেলায় দেড় সের পৌনে দু সের রুই-কাতলার দাগা। আর টিফিন-কেরিয়ারে বোধ হয় মাছই দেয়নি মোটে।"

লোকটা জিভ কাটে, "ছি-ছি, ঐ সব শুনলেন বুঝি? মিছে কথা স্যর্, একেবারে বানানো। বড়বউঠাকরুনের কথা হচ্ছিল—চেয়ে দেখুন তাঁকে, না খেয়ে খেয়ে শুকনো সলতে হয়ে আছেন।" সকাতরে বলে, "মিছে কথায় কান দেবেন না। পেটে কিছু নেই, তখন খাওয়ার কথা বলে বলেও সুখ। সারের কোন দিন যেন উপোস করতে না হয়। হলে তখন গরিবের এই কায়দাটা পরখ করে দেখবেন। খাওয়ার গল্প করবেন, বানিয়ে বানিয়ে বলে যাবেন—পেট খানিকটা ভরা-ভরা মনে হবে।"

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

যা কে বলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ডুবে মরা। পরানের তাই হয়েছে।

বুড়ো মানুষের পকেটে সে হাত দেয় না। দিতে তার পৌরুষে বাধে। বুড়ো মানুষের পকেটে হাত দোব! যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না! তেমন হাত কেটে ফেলাই ভাল।

গোঁফ বেরুনোর পর সে হাত দেওয়া দূরে থাক্, বুড়ো মানুষের পকেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে চায়নি কখনও। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস, সেই বুড়ো মানুষের পকেটেই তাকে হাত দিতে হল, নিতান্ত নাচার হয়ে। এবং ব্যাগটা বের করে সরিয়ে ফেলার আগেই হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

ধরলে সেই বুড়ো ভদ্রলোক নয়। গায়ে ধোপ-দুরস্ত সাদা চাইনিজ কোট, তার উপর চাদর চাপিয়ে তিনি তাঁর আসনে নিশ্চিন্ত বসে। ধরলে তাঁর সামনের বেঞ্চের একটি ছোকরা।

পরানের ভাব-ভঙ্গিতে তার বরাবরই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কয়েক বারই পরান বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির পকেটের দিকে হাত বাড়িয়েই আবার সরিয়ে নিচ্ছিল। ছোকরাটি ভাবছিল, সুবিধা হচ্ছিল না বলে বোধ হয় পরান হাত সরিয়ে নিচ্ছিল। পরানের মনের দ্বিধার খবর সে জানবে কী করে? পকেট-মারেরও যে আবার পৌরুষের অভিমান আছে একথা কে ভাবতে পারে বলুন।

কিন্তু ছোকরাটির বেশ ভাল লাগছিল। মৎস্যশিকারীর মাছ ধরা দেখতে যেমন আমোদ লাগে, কেমন একটা নেশা ধরে যায়, তেমনি চিরদিন শুনে এসেছে, পকেটমারে পকেট মারে। স্টেশনে, ডাকঘরে সাইন-বোর্ড দেখেছে: 'পকেটমার হইতে সাবধান!' 'সাবধান! পকেটমার আপনার কাছেই আছে।'

কিন্তু পকেটমার যে সত্য সত্যই এত কাছে থাকতে পারে, এরকম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি।

পরান একবার সন্তর্পণে হাত বাড়িয়েই টেনে নিচ্ছে। যেন ছিপের ফাতনা টিপ টিপ করছে, অথচ ডুবছে না। ট্রামের মধ্যে অসম্ভব ভিড়। সেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ছোকরার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। এই ভিড়, ভিড়ের ঠেলাঠেলি কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারছে না। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সে একাগ্র দৃষ্টিতে পরানের হাতের দিকে চেয়ে। নেশা জমে গিয়েছে তার।

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় কী যেন একটা হয়ে গেল।

ভূমিকম্পে ট্রামটা যেন দুলে উঠল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পরান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন খোলের ভিতর থেকে কাছিমের মুখের মত একখানা শীর্ণ, দীর্ঘ হাত বেরিয়ে এল বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের পকেট পর্যন্ত।

হাত নয়, যেন হাতের ছায়া। তার স্পর্শ নেই। এবং এক পলকের জন্যে।

কী হল?

ধাক্কার মধ্যে ছোকরাটির দেহ নড়েছে, কিন্তু চোখ নড়েনি।

কী হল? হয়ে গেল? খেলা খতম?

ছোকরাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। হয়ে গেল কী? এরই মধ্যে হয়ে গেল! তার মন বললে, গেল। কাজ হয়ে গিয়েছে।

পরান সরে পড়বার জন্যে কেবল পিছু হটছে। ছোকরাটি সেই ভিড় যেন তীরের মত ভেদ করে পরানের উপর লাফিয়ে পড়ল।

পরান গর্জন করছে। যাত্রিদল হতচকিত।

কী হল? কী হল?

পকেটমার!

বাস্, আর দেখতে হল না। ট্রামে যে যেখানে ছিল, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে, বাদুড়ের মত ঝুল্যমান অবস্থায়, সব ঝাঁপিয়ে পড়ল পরানের উপর এবং—

এবং যে-মারটা চলল, চড়-কিল-ঘুঁষি,

'চোর কোথাকার, হাজতে তেল আরও মরবে"

সে-মার গর্‌মোষেও সহ্য করতে পারে না, শুধু পকেটমারেই পারে।

পরান গোড়ায় গোড়ায় গর্জন করেছিল। চোখ রাঙিয়েছিল। কিন্তু ট্রামশুদ্ধ লোক ঝাঁপিয়ে পড়ার পর চুপ করে গিয়েছিল।

দূর থেকে কে যেন একবার বলেছিল, "যাকগে মোসাই, ব্যাটার খুব সিখ্যে হয়েছে। এবার দুটো লাথি মেরে নাবিয়ে দিন।"

আর যায় কোথায়?

সবাই চিৎকার করে উঠল, "ওটাকেও মশাই। এর সঙ্গী ও। পাকড়ান, পাকড়ান।"

কিন্তু পাকড়াবে কে? তার গায়ে হাত পড়বার আগেই লোকটা বিদ্যুদ্বেগে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্রাম এসে থামল থানার সামনে।

সেইখানে পরানকে নামানো হল। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবিটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পরিধেয় বস্ত্রেরও সেই অবস্থা। মাথার চুল বিপর্যস্ত।

পরান ট্রাম থেকে নেমেই শিথিল বস্ত্র ঠিক করে নিয়ে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে একটা বিড়ি ধরালে।

বললে, "চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

লোকেরা (মানে নিরীহ লোকেরা নয়। তারা যে-যার সরে পড়েছে। উৎসাহী লোকেরা, যারা থানা-কোর্ট পর্যন্ত অগ্রসর হতে প্রস্তুত) তারা মার বন্ধ করেছে। দয়ায় নয়, ক্লান্ত হয়ে। তখন তারা হাঁফাচ্ছে। ঠেলতে ঠেলতে তারা পরানকে থানার দিকে নিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে একটা ট্রাফিক পুলিস এসে পরানের ভার নিয়েছে।

আগে পরান এবং তার হাত ধরে কনস্টেবল। পিছনে রীতিমত একটা জনতা। এরা সবাই যে ট্রামে ছিল, তা নয়। কিছু রাস্তায় জুটেছে। এবং অধিকাংশই থানা পর্যন্ত যাবেও না।

সবাই মারমুখী। সকলেরই হাত নিশ-পিশ করছে। কিন্তু পুলিসের জন্যে পরানের গায়ে হাত দিতে পারছে না। শুধু মুখেই শাসাচ্ছে।

কিন্তু পরানের এই সমস্ত শাসানি এবং নানা প্রকার শ্রাব্য-অশ্রাব্য মন্তব্যের দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন কটূক্তি-বর্ষণটা অন্য লোকের উপর চলছে, তার উপর নয়। সে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে। চেষ্টা করছে হন হন করে চলবার। কিন্তু প্রহার-জর্জর দেহটা ঠিক পারছে না।

প্রশস্ত রাস্তায় প্রবল জনস্রোত। বেশীর ভাগই অফিস-ফেরত বাবুদের দল। তাদের কেউ পরানকে একবার চেয়ে দেখেই চলে যাচ্ছে। কেউ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জেনে নিচ্ছে ব্যাপারটা কী। কেউ বা শেষ পর্যন্ত দেখবার আগ্রহে জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পরানের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই।

"এইখানে চাঁদা করে একদফা হয়ে যাক না, ও কনস্টেবল সাহেব!" —দূরের থেকে দোকানের কোন ছোকরা প্রস্তাব করলে।

জনতার এবিষয়ে আগ্রহের অভাব নেই। বস্তুত এইখানে ট্রামের মত একপ্রস্থ হয়ে গেলে জনতার অনেকে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কনস্টেবলটার জন্যে সে সুবিধা নেই।

জনতার উপর পুলিসের ভয় আছে। এইখানে সত্য সত্যই চাঁদা করে একপ্রস্থ হয়ে গেলে তার সাধ্য নেই পরানকে রক্ষা করে। কিন্তু পুলিসের উপর পরানের প্রচুর আস্থা আছে। চারিদিকের বিরুদ্ধ মন্তব্য এবং ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও সে তাই নিশ্চিন্তে চলেছে বিড়ি টানতে টানতে।

বাঁ দিকের সরু গলিটা তার চেনা গলি। খানিকটা গিয়ে ডান দিকে বেঁকেই একটা জানা বস্তি। সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে কাকে ধরে কে? কিন্তু এই দেহ নিয়ে পারবে কি?

এবারে ভয় তার পুলিসের জন্যে নয়। ভারী-বুট-পরা কনস্টেবলের সাধ্য নেই দৌড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ভয় তার জনতাকে। তারা ঠিক ধরে ফেলবে। এবং পুলিসের আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় পেলে এই মারমুখী জনতা তাকে আর আস্ত রাখবে না।

সুতরাং গলিটার দিকে একবার চেয়েই সে-সংকল্প পরিত্যাগ করল।

পালাবার লোভটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্যে সে পা চালিয়ে চলতে গেল। সামনেই একটা জীর্ণ ভিখারিণী।

'ভাগ্!',

পরান এমন করে গর্জন করে উঠল যে, পাশের কনস্টেবলটা চমকে উঠল। পিছনের জনতা ইতিমধ্যে খানিকটা হালকা হয়েছে। গর্জনে তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিয়ে কনস্টেবলটা ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিলে, "কেয়া হুয়া?"

ওর প্রশ্ন পরানের কানে গেল কি-না সন্দেহ। তার চোখে ক্রোধ এবং ভ্রূকুটিঃ "হারামী কা বাচ্চা কাঁহাকা!"

ভিখারিণীটাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ত কিছু করেনি। ভিক্ষাও চায়নি। পরানের কাছ-বরাবর গিয়েছিল বটে, হয়ত ভিক্ষা চাইতেই। কিন্তু তখন ও কনস্টেবলটাকে দেখেনি। বুঝতে পারেনি, পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে একটা চোরকে। তা হলে ওর কাছ-বরাবর যাবেই বা কেন?

কিন্তু হতচকিত ভাবটা কাটতে দেরি হল না। ভিক্ষা করলেও সে যে সামান্য নয়, অন্তত একটা পকেটমারের চেয়ে বেশী, এই সামাজিক বোধটা ওর মনে জেগে উঠল।

কোমরে সেই মলিন ছেঁড়া কাপড়ের একটা প্রান্ত জড়াতে জড়াতে সেও গর্জন করে উঠল, "তুই হারামীর বাচ্চা। চোর কোথাকার। মারের চোটে গতর ভেঙে দিয়েছে। হাজতে তেল আরও মরবে।"

কিন্তু এসব কথা পরানের কানে গেল বলে মনে হল না। সে তখন খানিকটা দূর চলে গিয়েছে।

জনতার অবশিষ্ট অংশ, যারা থানা অবধি

যেত না, তারা এইখানেই মজা পেয়ে গেল। তারা ভিখারিণীকে তাতিয়ে আরও নতুন নতুন মুখরোচক গালাগালি শুনতে লাগল। যদিও যার উদ্দেশে গালাগালি সে তখন প্রায় থানার কাছে।

ছেলেবেলার কথা পরানের ভাল মনে পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে পশ্চিমের একটা শহর, সর্দার বলে আলিগড়, উলঙ্গ দেহে সেখানকার ধুলোভরা রাস্তায় খেলা করত আরও পাঁচটা ছেলের সঙ্গে। সেখানে একটা আম্মা ছিল। অত্যন্ত রুগ্ন একটি আম্মা, দিন-রাত্রি খকখক করে কাশত। আর একটি বাপও ছিল। প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা জাঁদরেল একটা বাপ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। মাকে প্রায়ই ধরে ধরে মারত, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। সেও বাদ যেত না। মারের চোটে মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠত। অজ্ঞান হয়ে যেত। জ্ঞান হলে দেখত, আম্মা চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে। পাশে একটা জলের লোটা। বোধ হয় তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দেবার জন্যে।

বাপকে খুব বেশী দেখতে পেত না। মাঝে মাঝেই কোথায় চলে যেত। আম্মা বলত, "কলকাতা গেছে সওদা করতে।" কী সওদা করতে সে-ই জানে। কিন্তু টাকা-পয়সা জিনিসপত্র আনত অনেক। কদিন খুব খাওয়া-দাওয়া হত। তারপর আবার একদিন বাপ উধাও হয়ে যেত।

সেই সময়টা খুব আনন্দে কাটত। আম্মারও, ওরও। যখন বাপ থাকত না।

যখন বাপ থাকত, ও ত পারতপক্ষে তার ছায়া মাড়াত না। বাইরে বাইরেই থাকত। কিন্তু আম্মার ত সে সুবিধা ছিল না। তাকে থাকতে হত কড়া পর্দায়। সুতরাং মার জুটত কথায়-কথায়, একটু কিছু ত্রুটি হলেই।

মনে পড়ে, একদিন বাইরে থেকে খেলা করে ফিরে এসে দেখে, আম্মা মাটির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। বেশী রক্ত অবশ্য নয়। বেশী রক্ত তার ছিল না।

কী যে করবে সে ভেবে পায়নি। পাশের বাড়ির লোকদের জানানো নিষেধ ছিল। জানালেও বাপের ভয়ে কোন পড়শী আসতে সাহস করত না। পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে ভয় করত।

এটুকু জেনেছিল, চোখে-মুখে জলের ছাট দিলে জ্ঞান হয়। তাই দিয়েছিল। একটু পরে আম্মার জ্ঞান হয়েছিল। তখনই কপালের রক্ত ধুয়ে ফেলে আবার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না চড়িয়েছিল।

আশ্চর্য এই আম্মা! মার খেয়ে কখনও চিৎকার করত না। সবসময় সারা মুখ ঘোমটায় ঢাকা। বড় বড় নীল দুটি রক্তহীন চোখ, কখনও কাঁদত কিংবা হাসত বোঝবার উপায় ছিল না।

আলিগড় না কী শহর কে জানে, সেখানকার আর-কিছুই পরানের মনে নেই। শুধু আম্মাকে মনে পড়ে।

সেই আম্মার কান-নাক কী রকম ফুলে উঠল। বোধ হয় সেই জন্যেই দিনরাত মুখ ঘোমটায় ঢেকে রাখত। তারপর একদিন হাতে-পায়ে ক্ষত দেখা গেল।

পরানের ধারণা হয়েছিল, মারের জন্যে ঘা বুঝি।

কিন্তু আম্মাই একদিন তাকে বুঝিয়ে দিল, মারের ঘা নয়, খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না। এইবারে সে মরে যাবে। মরে গেলেই অবশ্য বাঁচে। কিন্তু পরানের কী হবে?

ঘায়ের দিকে চেয়ে পরান শিউরে উঠেছিল। তারপরে মরার কথা শুনে, পরানের এখনও মনে পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কেঁদেছিল সে।

লুকিয়ে লুকিয়ে মানে সে-পরিবেশে কান্না নিষেধ, জোরে কান্না একেবারেই নিষেধ। আম্মা কাঁদত না, পরানও কাঁদত না। কান্না পরানের আজও আসে না।

এর পরে পরান চলে এল কলকাতায়। এই আড্ডায়। তার বাপ একদিন এসে সেই যে দিয়ে গেল আর আসেনি। আর তাকে দেখেনি। তার জন্যে তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু আম্মার জন্যে অনেক দিন পর্যন্ত তার মন-কেমন করত। সেই ঘায়েভরা আম্মা, তার বড় বড় নীল রক্তহীন চোখ। তার শব্দহীন অস্তিত্ব যেন মুখর হয়ে উঠত।

তারপরে এই আড্ডা।

এখানকার পরিবেশ অন্য রকমের। যে বুড়ো সর্দারের অধীনে তারা পাঁচ-ছটি ছেলে থাকত, তার মায়া-মমতা কিছু ছিল। সময়-সময় নিষ্ঠুর প্রহার দিত সত্যি, প্রায় সেই আলিগড়-না-কোথাকার বাপের মতই, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ওদের নিয়ে খেলাও করত।

সেই সর্দারের কাছেই শুনেছিল, আলিগড়ের আগেও তার একটা জীবন ছিল। ওরা তার সত্যকারের বাপ-মা নয়।

ওর বাপের কাছেই সর্দার শুনেছে, এই কলকাতাতেই ওর বাড়ি। হয়ত বস্তির স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে কোন ঝিয়ের কোলে জন্মেছে সে। কি হয়ত নিম্নমধ্যবিত্ত কোন গৃহস্থ-পরিবারে। খেলা করছিল রাস্তায়। সেখান থেকে ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। তার কাছ থেকে পায় ওর বাপ।

শোনার পর থেকে পরানের মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই খোলার ঘর কিংবা অন্য কোন ঘর, যেখানে ও জন্মেছে, সেটা যদি একবার দেখতে পেত! ফিরে যাবার জন্যে নয়। এই জীবন ছেড়ে আর কোথাও ফিরে যাবার তার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই।

কিন্তু যদি একবার দেখতে পেত!

ফিরে যাবার উপায় যখন নেই, ইচ্ছাও নেই, তখন দেখে দূর থেকেই হক আর কাছ থেকেই হক—শুধু দেখে কী যে তার স্বর্গলাভ হত, তা সে বলতে পারে না।

তবু ইচ্ছা হয় দেখবার, তার সত্যকারের মা-বাপ-ভাই-বোনকে। তারা কে কেমন জানবার ইচ্ছা হয়। জেনে লাভ নেই, তবু ইচ্ছা হয়। যেমন সকল মানুষেরই গত-জন্মের আত্মজনদের দেখবার ইচ্ছা হয়। সকল সময় নয়, মাঝে মাঝে, কচিৎ কোন আশ্চর্য মুহূর্তে।

এইখানে সর্দারের শিক্ষায় তার হাত পাকতে লাগল।

এমন পাকল যে, সর্দার পর্যন্ত অবাক। প্রথম প্রথম সর্দার নিজে সঙ্গে থাকত। মক্কেল দেখিয়ে দিত। বুঝিয়ে দিত, কী করে জানা যায়, কার পকেটে মাল আছে, কোথায় আছে। কী কৌশলে তা মারা যায়, গোড়ায়-গোড়ায় হাত সাফাইয়ের সেই কায়দাটা নিজে মেরে দেখিয়ে দিত।

তারপরেও কিছুদিন নিজে সঙ্গে থাকত। নিজে মারত না, ওদের মারতে দিত। নিজে সুসজ্জিত বেশে মক্কেলের পাশে বসত। ওদের হাত-সাফাই পর্যবেক্ষণ করত। ভুল-ভ্রান্তি হলে বাড়ি ফিরে সংশোধন করে দিত।

এমনি করে যে-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গৃহকোণে, বাইরের জগতে তা সম্পূর্ণ হল।

প্রথম প্রথম পরানের ভয় করত। হাত কাঁপত, বুক শুকিয়ে যেত। কিন্তু সাফল্যেই সাহস বাড়ে। পরানেরও বাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে পকেটমারার ক্ষেত্রে সে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল।

সর্দার বলত, "আঙুল ত নয়, যেন পালকের ছুরি।"

বলত, "ওর চোখে এক্স-রে আছে। হাজার লোকের মধ্যে কোন লোকটির ফতুয়ার পকেটে মাল আছে, ওর চোখের আলো নির্ঘাত সেখানে গিয়ে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে পালকের ছুরি কাজ হাঁসিল করে ফেলবে। মাছিটি পর্যন্ত টের পাবে না।"

এর কিছুকাল পরে সর্দার বিছানা নিলে। সবাই তাকে ফেলে যে-যার সুবিধামত সরে পড়ল। কিন্তু সে তাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে পালাল না। রয়ে গেল।

সকাল-সকাল রেঁধে-বেড়ে তাকে খাইয়ে সওদা করতে বেরিয়ে পড়ে। বিকেলে ফিরে এসে আবার তার সেবা-যত্ন করে।

তারপরে আজ ধরা পড়ে গেল। পালকের ছুরি, কিংবা এক্স-রে কোনটাই কাজে এল না।

সর্দারের জন্যে দুটো ডাব কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা। বুড়ো হয়ত অপেক্ষা করে আছে সেই জন্যে।

কনস্টেবলের সঙ্গে চলতে চলতে সেই কথা মনে পড়ে পরান হেসে ফেললেঃ মর শালা বুড়া! আমি আর ফিরছি না।

মরবে ত নিশ্চয়ই। সর্দারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবু আরও কটা দিন বাঁচত হয়ত, যদি পরান ধরা না পড়ত। হয়ত একটু আরামে মরতে পারত।

তা আর কী করা যায়!

সে ত আর ইচ্ছা করে জেলে যাচ্ছে না! ধরা পড়া গেলে আর করবে কী? বুড়ো সর্দারের অদৃষ্ট। নইলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে এই সামান্য গোষ্পদের জলে ডুববে কেন?

বুড়ো সর্দারেরই অদৃষ্ট। এমনি করে অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু আছে, কে খণ্ডাবে!

সন্ধ্যার মুখে পরান প্রতিদিনই সর্দারের জন্যে একবার ফেরে। তার পরে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কোনদিন আবার বেরয়, কোনদিন বা আর বেরয় না।

সন্ধ্যেবেলাটা আজও বুড়ো তার জন্যে অপেক্ষা করবে। হয়ত তার জন্যে নয়, ডাবের জন্যে, সন্ধ্যের আহারের জন্যে। তাকে ফিরতে না দেখে ভাববে হয়ত। রাত দশটা পর্যন্ত ভাববে। তারপরে বুঝবে, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এবং অঘটনটা কী হতে পারে, তার মত ঘুঘু পকেটমারের বুঝতে বিলম্ব হবে না। তখন, তখন কী করবে সে?

মরু শালা ছটফট করে!

থানায় এসে হাজতে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। দারোগাবাবু বেরিয়ে-ছিলেন। তিনি ফিরতে পরানকে তাঁর সামনে হাজির করা হল।

ডায়েরির বই টেনে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম কী?"

'আজ্ঞে, পরান।'

"পরান কী?"

"আজ্ঞে, আর কিছুই নয়, শুধু পরান।"

"বাপের নাম কী?"

"সে সব জানি না মোসাই।"

"বাপের নাম জানিস না?"

"না মোসাই, ওসব পাট নেই।"

তারপর আবার বললে, "ওসবে কী হবে মোসাই! যাব ত আমি জেলে। বাপের নাম যাই হক না কেন?"

"হুঁ।"

"আজ্ঞে। বাপের নাম জানি না। আমার নাম পরান। পরান বক্সও লিখতে পারেন।"

"বক্স আবার কী করে হল?"

"আজ্ঞে হয়, গেরোর ফের থাকলে সবই হয়।"

দারোগা লিখে নিলেন—পরান বক্স, বাপের নাম অজ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা করলেন, "পকেট মারতে গিয়ে-ছিলি?"

"আজ্ঞে আর বলেন কেন হুজুর, ও এক ঝকমারি হয়ে গেল।"

"ঝকমারি! কী রকম?"

পরান এতক্ষণ বেশ শান্ত ছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, "ঝকমারি নয়ত কী! এই আঙুল দেখছেন স্যার? সর্দার বলত পালকের ছুরি।"

দারোগা হেসে ফেললেন, "তা পালকের ছুরি ভোঁতা হয়ে গেল কী করে?"

"তবে আর বললুম কী স্যার! ঝকমারি। মাইরি বলছি, গোঁফ বেরুবার পর থেকে বুড়ো মানুষের পকেট আমি ছুঁই না।"

"তবে ছুঁলি কেন?"

"আজ্ঞে, গেরো।"

"গেরো?"

"না ত কী বলুন স্যার। গেরো। আর সেই ঘেয়ো মাগী।"

বিস্মিত কণ্ঠে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘেয়ো মাগী আবার কোথায় পেলি?"

"আজ্ঞে, গেরোর ফেরে জুটে গেল।"

"কোথায়?"

"পথে। ঘেয়ো মাগী আর কোথা জুটবে?"

পরানের কণ্ঠস্বরে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ পেল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কী করলে?"

"কী আর করবে মোসাই। করেনি কিছুই। একটা ঘেয়ো মাগী আর কী করতে পারে?"

"তবে?"

"তা হলে বলি শুনুন।"

থানার সেই হল-ঘরের মেঝেয় দারোগার টেবিলের নীচে পরান উবু হয়ে বসে পড়ল। বলতে লাগল ঃ

"তিনটে আন্দাজ একটা শিকার জুটে গেল। মাল বেশী ছিল না। খুচরো পয়সাতেই ব্যাগটা ফুলে উঠেছিল। খানকয়েক এক টাকার নোট আর সব খুচরো।"

"কোন্ ট্রামে?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরান বললে, "সে একটা স্যামবাজার যাবার ট্রামে।"

"তারপরে?"

"সেইটে হাতিয়ে ফুর্তিসে সিস্ দিতে দিতে চলছি—সামনে একটা ঘেয়ো মাগী আলুমিনামের ফুটো বাটি, হাতে দাঁড়াল।"

"তারপরে?"

"দিয়ে দিলাম।"

"কী দিয়ে দিলি?"

বিরক্তিভরে পরান উত্তর দিলে, "আর কী দোব মোসাই, বেগটা।"

"গোটা ব্যাগটা দিয়ে দিলি?"

"দিলাম বইকি!"

হঠাৎ পরানের চোখটা যেন জ্বলে উঠল ঃ "জানেন মোসাই, ঘেয়ো আমি একেবারে সইতে পারি না। সঙ্গে যা থাকে দিয়ে দিই। কতবার দিয়েছি। আর সওদাতে বেরুতাম না হয়ত। কিন্তু সর্দারের জন্যে আবার বেরুতে হল। গেরো আর কাকে বলে?"

কিন্তু শেষের কথাগুলো দারোগাবাবুর বোধ হয় কানেই গেল না। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"ঘেয়ো মাগী দেখলে সব দিয়ে দিস?"

"বললুম তো স্যার, কতবার দিয়েছি।"

"কেন দিস?"

"তা জানিনে মোসাই।"

পরানের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেল ঃ আলিগড়-না-কোন্ শহরের সেই খোলার বাড়ি। ছোট্ট উঠান। আলো ঢোকে না। সেখানে সেই সর্বদা-ঘোমটায়-মুখ-ঢাকা আম্মা। সেই রক্তহীন নীল চোখ। যে কখনও কাঁদে না, কাঁদতে জানে না। স্বল্পভাষিণী। হাতে-পায়ে ঘা...

মায়ের ঘা নয়। খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না।

পরান দারোগার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কাঁপা গলায় বললে, "ওরা বেশী দিন বাঁচে না মোসাই।"

লঙ্গমা? আমি চমকে উঠে বললুম, "এর মানে কী? এমন শব্দ ত কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।"

সাংবাদিক বন্ধু তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত হাসিটি মুখের উপর মেলে দিয়ে বললেন, "শুধু আপনি কেন—কোন আভিধানিকও কখনও পেয়েছেন বলে জানি না। তিলে তিলে গমন করে যে নারী এমনি একটা ব্যুৎপত্তি করে নিতে পারেন।"

"আধুনিক কবিদের কী যে হয়েছে"—আমি গজগজ করে উঠলুম।

"আধুনিক কবিদের উপর আগে থেকেই অবিচার করবেন না—" বন্ধু আবার হাসলেন। বললেন, "আমার এই রিভিউটা প্রথমে পড়ে নিন, তারপরে যা বলবার, বলবেন।"

অগত্যা পড়তে আরম্ভ করলুম। বেশ দীর্ঘ সমালোচনা। লাইনে লাইনে প্রশংসার উচ্ছ্বাস। তা থেকে যে তত্ত্ব মোটের উপর পাওয়া গেল, তা এই রকম :

"এ এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর ভাষা নতুন, ছন্দ নতুন, বক্তব্য নতুন। এমন ভাষা-ছন্দ-ভাব বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ ব্যবহার করেননি—রবীন্দ্রনাথের মত মহাপ্রতিভাও এর কল্পনা করতে পারেননি (আলোচনার এই জায়গাটায় এসে আমি বিষম খেয়েছিলুম) আজকের দিনের সাধারণ পাঠক বা সমালোচক 'তিলঙ্গমা'র মর্ম বুঝবে না; কিন্তু যেমন বোদ্‌লেয়ার অনেক পরে তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন, যেমন জেমস জয়েসের স্ট্রীম অফ কনসাসনেস্ অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে নিজের মহিমার আসন পেয়েছে, তেমনি একদিন হয়ত এই কাব্য আজকের সমস্ত উপেক্ষা-উপহাসের মেঘাবরণ ছিঁড়ে সূর্যের মত বেরিয়ে আসবে। এই বই থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি দেবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি মনে করি—সম্পূর্ণ বইখানিই উদ্ধৃতিযোগ্য।"

আমি হাঁ করে রইলুম কিছুক্ষণ।

"সত্যিই কি এমনি নিদারুণ প্রতিভা জন্মেছে নাকি বাংলা দেশে?" —অস্বস্তিভরে বললুম, "কাগজ-টাগজগুলো আমিও ত পড়ি—কিন্তু এ-কবির কোনও কবিতা ত কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।"

"এর কবিতা কোন কাগজে ছাপা হয়নি। কবি কখনও পাঠাননি।"

"বোধ হয় ভাবেন, তাঁর কবিতা কেউ বুঝবে না?"

"না, তাও নয়। তিনি শুধু নিজের মনেই লিখে যান। বইখানি ছাপিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।"

আমার ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বছর দুয়েক আগে নিজের খরচে আমি একখানা উপন্যাস ছেপেছিলুম। পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হয়নি আজ পর্যন্ত। আর সেজন্য আমার স্ত্রী যা বলে থাকেন, তা প্রকাশ্যে শোনাবার মত নয়।

"ভাগ্যবান স্বামী!" আমি শীর্ণ স্বরে বললুম, "আর এমন স্বামীর স্ত্রীও ভাগ্যবতী।"

"স্ত্রীও ভাগ্যবতী?" —বন্ধু বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন : "খুব সম্ভব। কিন্তু আপনাকে আর ধোঁয়ার মধ্যে রেখে লাভ নেই। আগে কবিতার বইখানা আপনাকে একবার দেখানো দরকার।"

ব্যাগ থেকে বইটি বের করে এনে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে : "পড়ুন।"

ছোট বই। রেক্সিনে বাঁধানো—সোনালী হরফে জ্বলজ্বল করছে নাম : তিলংগমা—সোমেন দে চৌধুরী। দামী বিলিতি কাগজে চমৎকার ছাপা।

"টাকা আছে অনেক।"

"না, স্ত্রীকে গয়না বেচতে হয়েছে।"

আমার আর একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমার স্ত্রী কুন্তলার কথাগুলো একবার শোনা উচিত ছিল। কিন্তু আপাতত সে বাড়িতে নেই—হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কোন বান্ধবীর কাছে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আমি বইয়ের পাতা

ওল্টাচ্ছিলুম। কিন্তু চোখের দৃষ্টি থমকে থেমে গেল। একটি কবিতার নাম হল "চণ্ডলিতা হিণ্ডলিকা"। আর তার লাইনগুলো এই:

"পর্যুদস্ত পাশুটে বিকেল
খ্যাচাং খ্যাচাং খ্যাচাং ট্রন্বের তেল।
টিং টিং —কার্বালির হিংঃ
সবুজ চায়ের পেয়ালা—
বীবর্ণ প্রাণে লাল নীল শিং।
বাগিচায় বুলবুলি তুই—
ম্যাণ্ডোলীনা কচী কচী কাটা
নিয়ে আয় খাঁরা বলী দেব,
ওঁ কালিঘাটের ভৌ ভৌ
(পাঁটা—পাঁটা!)"

আমার হাত থেকে বইখানা খসে পড়বার উপক্রম হল।

"কী কাণ্ড মশাই!"

"ভাল লাগল না?"

"ভাল! পাউণ্ডের ক্যাণ্টোজ থার্টি সেভেন উলটেছি। হেনরি মিলারের রোজি ক্রুসিফিকেশন নিয়ে চেষ্টা করেছি—কিন্তু এ-কবিতা পড়লে যে ভৌ-ভৌ করে লোককে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে!

"আমার সমালোচনার সঙ্গে মত মিলছে?" —বন্ধুর ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসি দুলে উঠল একটুকরো।

"এক দিক থেকে মিলছে বইকি!" আমি তিক্তগলায় বললুম, "ঠিকই বলেছেন, এই বস্তু—এই বানান রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারতেন না। যেমন হয়েছেন আপনারা সমালোচকেরা, তেমনি এই আধুনিক কবির দল—"

"বলেছি ত, আধুনিক কবিদের উপর আগে থাকতেই অবিচার করবেন না। তাঁদের কোনও দোষ নেই।"

"কিন্তু এ যে পাগলের কাণ্ড!"

"ঠিক।" —বন্ধু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেনঃ "আধুনিক কবিরাও এই কবিতাগুলো পড়ে ওই কথাটাই বলবেন। আর ওই কথার প্রতিবাদ একজন বিশেষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই এই সমালোচনা আমাকে লিখতে হয়েছে।"

"কে সেই বিশেষ মানুষটি?"

"লীলা দে চৌধুরী। আগে ছিল লীলা মিত্র।"

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাকালুম।

"সমস্ত জিনিসটাকে এমন জটিল করে তুলেছেন যে, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"জটিলতার জাল এখুনি খুলে দিচ্ছি। লীলা মিত্রের গল্পই বলি। 'তিলঙ্গমা'র সমস্যা তা হলে সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।"

বন্ধু ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরালেন। সামনের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন লীলা মিত্রের গল্প।

কলকাতার কোন মিশনারি কলেজে লীলা মিত্র ছিল আমাদের সহপাঠিনী। শুধু আমাদের ক্লাসেরই নয়—সারা কলেজের ছাত্রেরাই লীলা মিত্রকে একটা বিশেষ চোখ দিয়ে দেখত। এমনকি, কখনও কখনও অধ্যাপকেরা পর্যন্ত রোল-কল করতে করতে মাথা তুলে লক্ষ্য করতেন সেভেনটি ফাইভ যথাস্থানে হাজির আছে কি না! অনুপস্থিত মেয়েদের রোলে অযাচিতভাবে রেসপণ্ড করে যে-সব ছেলেরা শিভালরির পুলক অনুভব করত, তারাও কোনদিন লীলা মিত্রের প্রক্সি দিতে সাহস পেত না।

এ থেকে মনে হতে পারে, লীলা মিত্র অসাধারণ সুন্দরী ছিল। না, তা নয়। রঙ কালোর দিকেই—চলনসই চেহারা। পড়াশুনোতেও সাধারণ ধরনের। সাহিত্যে বা সঙ্গীতে তার যে কোন বিশেষ দক্ষতা আছে, সে পরিচয়ও কেউ পায়নি। তবু সব মিলিয়ে কী যে তার মধ্যে ছিল—তার উপর চোখ না পড়েই পারত না।

এখন বুঝতে পারি, ওটা ব্যক্তিত্ব। খুব সাধারণ কথা—খুব সহজে বলে ফেললুম। কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। চেহারায় বৈশিষ্ট্য অনেকেরই থাকে—কিন্তু ব্যক্তিত্ব হল 'কোটিকে গুটিক'। চেহারা থেকে অনেকেরই স্বভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু চরিত্রের দীপ্তি জ্বলে ওঠে না। লীলা মিত্রের মুখে ছিল চরিত্রের শিখা—তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত ব্যক্তিত্বের আলো।

শুনেছি, অ-বাঙালীরা নাকি বাঙালী মেয়েদের পছন্দ করেন। আমার মনে হয়, বাঙালী মেয়ের চোখই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। কারও চোখ গাছের পাতায় শিশিরের মত কান্নাকে ছুঁয়েই আছে, একটু ছোঁয়া লাগলেই টুপটাপ করে ঝরে পড়বে: কেউবা রবীন্দ্রনাথের 'আনমনা'—নিদ্রা-নীরব রাত্রে অন্ধকার শালের বনে ঝিঁঝির ডাকের মত সুরবাঁধা সান্ত্বনাই হয়ত তার মগ্ন চোখকে জাগিয়ে তুলতে পারে; কারও বা মনের বসন্ত ছায়া-আলোতে কালো তারার উপরে কেঁপে কেঁপে উঠছে; কারও চোখ কঠিন-গম্ভীর —অনেক পরীক্ষা দিয়ে তবে তার মনের দরজায় পৌঁছনো যাবে।

কথাগুলো যদি রোম্যাণ্টিক শুনিয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে ছাড়া লীলা মিত্রকে আমি বোঝাতে পারতুম না। তার চোখেও একটা আলো ছিল—উপমা দিয়ে বলতে পারি, হীরের আলো। তা হীরের বাইরে জ্বলছে না; হীরের ভেতরেও নয়—ভেতরে বাইরে সবটাই জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। যে সহজ, উজ্জ্বল, তাকে বুঝতে, তাকে চিনতে এক মিনিটও দেরী হয় না।

একটা উদাহরণ দিই। খুব বৃষ্টি নেমেছে একদিন। ছুটির পরে আমরা অনেকেই আটকে পড়েছি, কারণ সামনের পার্কটার ভেতর দিয়ে সর্টকাট করলেও ট্রাম লাইন পর্যন্ত পৌঁছতেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দেবে।

ছাতা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল লীলা মিত্র। একটি ছেলে ফস করে বলে ফেলল, 'ইস্, ছাতার তলায় যদি এগিয়ে দিত ট্রাম পর্যন্ত।'

তখুনি ফিরে দাঁড়াল লীলা। বললে, 'আসুন।'

ছেলেটা অপ্রস্তুতের একশেষ। জিভ কেটে বললে, 'কিছু মনে করবেন না—ঠাট্টা করেছিলুম।'

'ঠাট্টা কেন হবে? আসুন না—এগিয়ে দিই।'

'না-না, ছোট ছাতা আপনার, দুজনেই ভিজব।'

'আধখানা করে ভিজব। একা যেতে গেলে আপনি সবটাই ভিজবেন। আসুন—'

লীলার চোখে সেই সহজ, উজ্জ্বল—সেই হীরের আলোটা জ্বলছিল। বাধ্য হয়ে এগোল ছেলেটা। কোন বলির পাঁটাকেও অমন অনিচ্ছার সঙ্গে হাড়িকাঠের দিকে এগোতে দেখিনি।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওর দুর্গতি দেখছিলুম। বেচারার ট্র্যাজেডি ওখানেই শেষ নয়। ওইটুকু লেডীজ ছাতার তলায় সে যত স্পর্শ বাঁচাতে চেষ্টা করে—লীলা তত বেশী রক্ষা করতে চায় তাকে। শেষ পর্যন্ত আর পারল না—অর্ধেকটা যেতে-না-যেতেই টেনে দৌড় লাগাল, এক লাফে উঠে পড়ল একটা চলন্ত ট্রামে।

এই রকম কোন মেয়ে কি আমাদের মনে কোন রোমান্স সৃষ্টি করতে পারে? এত স্পষ্ট—এত সহজ? বোধ হয় না। এমন একটি মেয়েকে আমরা পেতে চাই যে পাতায়-ঢাকা ফুলের মত—এক-একটি করে পাতা সরিয়ে যাকে দিনের পর দিন আবিষ্কার করতে হয়। সেই একটু-একটু করে জানার আকুলতাই প্রেম, সেই তিলে তিলে অবগুণ্ঠন সরানোই রোমান্স। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে চেনা হয়ে গেল, সে অন্তরঙ্গা হতে পারে, অন্তরতমা হয় না।

আজ বুঝতে পারি, লীলা মিত্র সম্পর্কেও এইটিই আমরা অবচেতনভাবে অনুভব করেছিলুম। আমরা জানতুম, ও আশ্চর্য। ওর জন্যে আসবে আলাদা পুরুষ—একটি চরিত্র, একটি ব্যক্তিত্ব। আবরণ মোচন করবার ধৈর্য যার নেই—সে এসেই হাত বাড়িয়ে ওকে জয় করে নেবে।

ভীরু চিত্তে অর্ঘ্য সাজাবে না—সঙ্গে সঙ্গে দাবি জানাবে।

লীলাকে একটু বিশেষভাবেই জানতুম আমি। জানবার কারণও ছিল।

একদিন আবিষ্কার করলুম, আমাদের স্টপ থেকেই ও ট্রামে উঠছে। আরও আবিষ্কার করলুম, পাড়ায় যে বিরাট একটা চারতলা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে, তারই একটা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হয়ে এসেছে ওরা।

একসঙ্গেই প্রায় কলেজে আসি—একই ট্রামে প্রায়ই ফিরতে হয়। ট্রামেই আলাপ হল।

অফিস-ফেরত ভিড়, লেডীজ সীটে বসবার জায়গা পেয়েছে লীলা—আমি রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি কাছাকাছিই। এমন সময় লীলার পাশের মেয়েটি নেমে গেল। স্পষ্ট, পরিষ্কার গলায় লীলা আমাকে বললে, 'আসুন, বসুন না এখানে।'

আমি বসে পড়লুম। ছাতার তলা থেকে পালানো সেই দুর্বলচিত্ত ছেলেটার মত আমি নই। আমি জানতুম, লীলা এত সহজ—এত স্পষ্ট যে, ওর সম্পর্কে কোন দ্বিধার প্রশ্ন কোথাও নেই। ও যত সাধারণ, ততই অসাধারণ, যত কাছে, তত দুর্লভ। তাই ওর পাশে বসে স্বচ্ছন্দে গল্প করতে পারি—তাতে আমারও ভয় নেই; ওরও ভাবনা নেই।

লীলা বললে, 'আপনাদের পাড়ায় এসেছি—জানেন ত?'

'জানি। উনিশ নম্বরের একটা ফ্ল্যাটে আছেন।'

'তেতলায় উঠে ডানদিকের ফ্ল্যাটটা। আসুন না একদিন। আমারও স্বার্থ আছে।'

'কী স্বার্থ বলুন।'

'আপনি ইংরেজী অনার্সের ছাত্র। আমার আবার ইংরেজীকে দারুণ ভয়। ডি-কুইন্সি একদম বুঝতে পারি না। দেবেন একটু পড়িয়ে?'

এইভাবে আলাপ। তারপরে ওদের বাড়িতেও আসা-যাওয়া চলত। লীলার বাবা ছিলেন না। দাদা একটা ভাল গোছের চাকরি করতেন রাইটার্স বিলডিঙে—স্বল্পভাষী মানুষ, অবসর সময়ে বসে বিলিতী পত্রিকার ক্রস-ওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামাতেন। মা ছিলেন কোন্ এক জমিদারবাড়ির মেয়ে—বাপের বাড়িতে হাতি ছিল, তার গল্প করতেন; ওর বৌদি ক্লাসিকাল গান গাইতেন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারতুম ও বস্তু তাঁর কোনদিন হবার নয়। ফার্স্ট-ইয়ারে-পড়া লীলার ছোট ভাই ডন ব্র্যাডম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখত আর লীলার প্রকাণ্ড মোটা দিদি মধ্যে মধ্যে মুখ ভর্তি পান চিবোতে চিবোতে শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা বড় মোটরে চেপে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসতেন।

এইটে বুঝেছিলুম, পরিবারটা একটু দাম্ভিক, একটু স্বতন্ত্র। ওর মা এসে গল্প করতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক কথার ভেতরে বাপের বাড়ির হাতিটা এসে উঁকি মারত। বাকী সবাই স্বল্পভাষী, সবাই আত্মকেন্দ্রিক। লীলার বৌদির সঙ্গে অবশ্য আমার কথাবার্তার সুযোগ হয়নি।

আপনি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন।

দেখতুম, হীরের আলোর ওপর আর-একটা কিসের আভা পড়েছে

ভাবছেন, 'তিলঙ্গমা' দিয়ে আরম্ভ করে আমি এ কোন্ শিবের গীতে এসে পৌঁছেছি! কিন্তু এই পরিবারের যে একটা চাপা অহমিকা—একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ—লীলা সেইটেকেই নিজের মধ্যে আশ্চর্য সহজ অথচ অদ্ভুত সুদূরতায় রূপায়িত করেছিল। এদের মনে আভি-জাত্যের যে অঙ্গার ধিকি ধিকি করছে, সেইটেই জ্বলতে জ্বলতে লীলার ক্ষেত্রে হীরে হয়ে উঠেছিল।

ডি-কুইন্সি পড়েছি, নিও রোম্যান্টিক কবিদের নিয়ে আলোচনা করেছি, ব্যাখ্যা করেছি ম্যাথিউ আর্নল্ড, শেক্সপীঅরের সূত্র ধরে জার্মান স্কলারদের কাছাকাছি পৌঁছেছি। ভালই লাগত। নিজেরও পড়াশোনা হত। লেখাপড়ায় লীলা যতই সাধারণ হক, সেই অসাধারণ মেয়ের কাছে আমি অন্তত সাধারণ হতে পারতুম না। আত্মমর্যাদায় বাধত।

বন্ধুরা আমাদের অন্তরঙ্গতার খবর জানত। কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটা হাল্কা ঠাট্টাও কোনদিন করেনি। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলতুম। তবুও এ-কথা কারও মনে হয়নি— একান্ত সহজ পরিচয় ছাড়া আমাদের মধ্যে আর-কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

শেষ পর্যন্ত সেই অসাধারণ এল। সোমেন দে চৌধুরী। এই 'তিলঙ্গমা'র কবি।

কী বললেন? এই রকম অদ্ভুত কবিতা লিখে সে লীলা মিত্রের মন জয় করেছিল? না—না। সোমেন দে চৌধুরী তখন কবিতা লিখত না। কবিতা সে পড়ত বলেও মনে হয় না। যুদ্ধের তখন প্রথম মুখ—সে এয়ারফোর্সে চাকরি নিয়েছিল।

লীলাদের বাড়িতেই আলাপ। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ব্রাইট। দূরসম্পর্কের কী আত্মীয়তার সূত্রে আসা-যাওয়া করত ওদের ওখানে। আর-এ-এফ-এর গল্প করত সোমেন। বলত, ওদের অভিজ্ঞতার কথা।

মালয়ের যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। কলকাতার আলো তখনও ব্ল্যাক আউটের ঠোঙা পরেনি। ওদের তখন ট্রেনিং আর মহলা। সোমেন এমনভাবে তারই গল্প জমিয়ে বলতে থাকত যে শুনে রোমাঞ্চ হত।

আর সেই গল্প শুনতে শুনতে লীলার দিকে দৃষ্টি পড়ত আমার। দেখতুম, হীরের আলোর ওপর আর-একটা কিসের আভা পড়েছে।

বলত, 'ভয় করে না সোমেনবাবু?'

'কিসের ভয়?'

'প্যারাস্যুট জাম্পে বিপদের সম্ভাবনা নেই?'

'থাকবে না কেন? কর্ড টানলুম—প্যারাস্যুট হয়ত খুললই না। তার মানে সোজা পাঁচ সাত হাজার ফুট থেকে মাটিতে আছড়ে পড়া। কিংবা কখনও আগেই খুলে গেল প্যারাস্যুট—ফেঁসে গেল ডানায় লেগে—বাস্, আর দেখতে হল না!'

'এ ত মরণকে সঙ্গে নিয়ে চলা!'

'তবু ত এ ট্রেনিং! এর পরে আছে অ্যাকচুয়াল অপারেশন। এনিমি এরিয়ায় যেতে হবে বোমা ফেলতে। অভ্যর্থনা করবে অ্যাক্ অ্যাক্ ব্যাটারি। ফাইটার প্লেন তাড়া করবে মেশিন গান নিয়ে। তখন জ্বলন্ত প্লেন নিয়ে আকাশ থেকে হেড্‌লং ডাইভ—অ্যান্ড অফ্ এ মিটিওর!'

লীলা কথা বলতে পারত না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত সোমেনের দিকে—হীরের উপর আর-একটা কিসের ছায়া কাঁপত। আমি বুঝেছিলুম। ও ছায়া ভালবাসার।

ডি-কুইন্‌সি ছেড়ে লীলা সিনেমায় যেতে আরম্ভ করল। সোমেন কলকাতায় এলে ওর কলেজে আসা বন্ধ হয়ে যেত। রোল কল করতে করতে অধ্যাপক হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতেন সেভেন্‌টি ফাইভ যথাস্থানে আছে কিনা: অনুপস্থিত মেয়েদের রোলে সাড়া দিয়ে যে-সব ছেলে শিভাল্‌রির পুলক অনুভব করে, তারাও ওর প্রক্‌সি দিতে সাহস পেত না।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মতলব কী? পরীক্ষা দেবে না?'

'না।'—পরিষ্কার জবাব দিলে লীলা।

'কী করবে তবে?'

'বিয়ে করব।'

'সোমেন দে চৌধুরীকে?'

'নিশ্চয়। নইলে তোমাকে নাকি?'—লীলা হেসে উঠল : 'তা হলে বিয়ের রাত্রেও তুমি আমাকে ডি-কুইন্‌সি পড়াতে চেষ্টা করবে।'

আমিও হেসে বললুম, 'এক পাতা ইংরেজী লিখতে যার পাঁচটা গ্রামার আর স্পেলিঙের ভুল হয়—তার মত বাজে ছাত্রীকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।' লীলা ভ্রূকুটি করে বললে, 'আচ্ছা দেখব, কোন্ লেডী নেস্‌ফিল্ড তোমার বরাতে এসে জোটে।'

'দেখো। কিন্তু বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

'হবে—হবে এত ব্যস্ত কেন? ভোজের জন্যে এখুনি ছট্‌ফটিয়ে উঠেছ বুঝি? কায়েতের ছেলে হয়ে তুমি যে বামুনের নোলাকেও ছাড়িয়ে উঠলে।"

বেশী দিন দেরী করতে হল না। আরও মাস কয়েকবাদে অসাধারণ লীলা মিত্রের সঙ্গে অসাধারণ সোমেন দে চৌধুরীর বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বছর চারেক আর খবর জানি না। এম এ পড়তে পড়তে একটা নিউজ এজেন্সির চাকরি নিয়ে লাহোরে চলে যাই। সেখান থেকে যখন কলকাতার এই কাগজটায় এসে যোগ দিলুম, তখন লীলা দে চৌধুরী মন থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। বার্মা মণিপুরের বনে জঙ্গলে লড়াই চলছে পুরোদমে—বোমার ভয়ে অন্ধকার কলকাতা প্রায় জনশূন্য। মিত্র শক্তির অবিমিশ্র মিথ্যে প্রোপ্যাগাণ্ডা সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছে বাংলা দেশের অবস্থা খুব আশ্বাস পাওয়ার মত নয়। ওদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গর্জন উঠছে রেডিয়োতে। সারা ভারতবর্ষের স্নায়ু থরথর করে কাঁপছে—তখন কোথায় লীলা, কোথায় কে?

একদিন ওর দাদার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়েছিল।

'ভাল আছেন?'

'ভাল আছি।'

লীলার কথাটা জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবতে ভাবতে দেখলুম, আমার টার্মিনাস এসে গেছে। নেমে পড়তে হল। আর তখুনি শুনলুম পাশের পানের দোকানের রেডিয়োতে উইন্‌স্টন চার্চিলের বক্তৃতার 'রিলে' চলছে। 'দরকার হলে আমরা ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমে যুদ্ধ করব, তবু নাৎসীদের কোনও শর্ত গ্রহণ করব না।'

আর আমার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বোমারু উড়ে গেল—খুব সম্ভব ফ্রণ্টের দিকে। লীলার কথা ভাববার মত সময় কোথায় তখন?

আরও অনেক জল গড়িয়ে গেল তারপর। আরও আট বছর। যুদ্ধ শেষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, পাকিস্তান, রিফিউজিসমস্যা। আবার একদিন লীলার দাদার সঙ্গে দেখা ড্যালহাউসি স্কোয়ারে।

'এই যে, চিনতে পারেন?'—ভদ্রলোক নিজেই আমাকে সম্ভাষণ করলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক বদলে গেছেন লীলার দাদা। মাথার আধখানা জুড়ে টাক পড়েছে, রগের দু ধারে চিক চিক করছে দু গোছা সাদা চুল। চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত আবার কোমল, সেই চাপা অহমিকার দীপ্তিটা নিবে গেছে। বোঝা যায় এর মধ্যে অনেক পোড় খেয়েছেন, জীবনের দায় অনেক বেশী চেপে বসেছে, আরও দশজন সাধারণ চাকুরে বাঙালীর সঙ্গে তাঁর আর-কোনও পার্থক্য অবশিষ্ট নেই।

বলা দরকার, আমি যখন লাহোরে, তখনই বাবা উত্তর ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছিলেন।

বললুম, 'চিনতে পারব না কেন? তা ভাল আছেন?'

ভদ্রলোক একটা আধপোড়া চুরুট বের করে ধরালেন। বললেন, 'ভাল আর কী করে থাকা যাবে মশাই—যা দিনকাল।'

ওই সর্বজনীন ক্ষোভের জেরটা আমি আর টানলুম না। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখনও এই শ্যামবাজার অঞ্চলেই আছেন?'

'হ্যাঁ, সেই ফ্ল্যাটেই। ভাড়া অবশ্য অনেক বাড়িয়েছে। এই বাড়িওলাগুলো যা হয়েছে, বুঝলেন—'

আবার সেই মধ্যবিত্ত অসন্তোষের গুঞ্জন। আমি সংক্ষেপে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'তা বটে। ভাল কথা, লীলার খবর কী? কেমন আছে? কোথায় আছে সে?'

লীলার দাদার মুখে ছায়া পড়ল।

'আপনি জানেন না? খুব স্যাড্ ব্যাপার—বুঝলেন!'

আমার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল। লীলা কি মারা গেছে?

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মনের চেহারাটা দেখতে পেলেন। বললেন, 'লীলা এখন কলকাতাতেই আছে—আমাদেরই ওই বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে। কিন্তু জীবনটা ওর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে? আমি আবার চমকে উঠলুম—আর-একটা সম্ভাবনা তৎক্ষণাৎ দেখা দিল সামনে। আর-এ-এফ্-এ যোগ দিয়েছিল সোমেন দে চৌধুরী। তা হলে কি একদিন কৌতুকের ছলে যে-কথা বলেছিল, সেইটেই সত্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত? জ্বলন্ত বিমান নিয়ে সে মিলিয়ে গেছে আরাকানের কোন দুর্গম জঙ্গলে, কিংবা বে অব বেঙ্গলের হাঙর-ভরা কালো জলে? দি এণ্ড অফ্ এ মিটিওর?

'সোমেন পাগল হয়ে গেছে।'

'পাগল!'

লীলার মৃত্যু নয়—সোমনের মৃত্যু নয়—তারও চাইতে বড়, তারও চাইতে অনেক ভয়ংকর আঘাত। লীলা মিত্রের এমন পরিণাম—অসাধারণ, আশ্চর্য লীলা মিত্রের এই ইতিহাস সেদিন কলেজের দু হাজার ছেলেমেয়ের একজনও কি কল্পনা করতে পারত? ভাবতে পারতেন কোন অধ্যাপক—রোল কল করতে করতে যাঁর চোখ নিজের অজ্ঞাতেই একটি বিশেষ জায়গায় ঘুরে আসত একবার?

'আর বলেন কেন—স্রেফ্ উন্মাদ। পারেন ত একবার যাবেন, আপনাদের দেখলে তবু মেয়েটা একটুখানি সান্ত্বনা পাবে। আপনাকে ত ও খুব শ্রদ্ধা করত!'

সামনের বাসটার দিকে দ্রুত এগোতে

এগোতে বললেন, 'আচ্ছা—নমস্কার।' কিন্তু আমি আর নড়তে পারলুম না। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ওখানে।

ভেবেছিলুম যাব না, লীলার মত মেয়ের এত বড় দুর্ভাগ্যের চেহারাটা কোন মতেই আমি সইতে পারব না। তবু যেতে হল। একটা কঠিন টান পড়েছিল বুকের নাড়ীতে।

আমাকে দেখে লীলা হাসতে চেষ্টা করল। বললে, 'এস কমল। এক যুগ পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে।'

লীলার চোখের দিকে তাকালুম। সেই হীরে দুটোর উপরে যেন ধুলোর স্তর জমেছে—যে আলো না বাইরে না ভেতরে সেই অপরূপ জ্যোতির্ময়তার উপরে নেমে এসেছে একটা অস্বচ্ছ আবরণ। আর ওরও সিঁথির একটা পাকা চুল রুপোর তারের মত চিক চিক করে জ্বলছে।

জোর করে বললুম, 'ভাল আছ লীলা?'

'খুব ভাল আছি।'

ঠাট্টা করছে? নিজের তিক্ততাকে বোঝাতে চাইছে 'খুব ভাল'র উপর জোর দিয়ে? কিন্তু তা ত নয়। স্পষ্ট, স্বাভাবিক ভাষায় বলছে—চমৎকার আছে সে।

'বোস, চা আনি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে লীলা একবার থমকে দাঁড়াল: "ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে দেবার উপায় নেই, উনি আজকাল নিজের সাধনা নিয়েই রাতদিন থাকেন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তুমি কিছু মনে কোর না।'

লীলার দাদার কথা কানে বেজে উঠল। সোমেন পাগল হয়ে গেছে। অথচ লীলা ত সে-কথা বলল না! সোমেন সাধনা করছে—বরং এই কথাটা বলতে একটা চাপা গর্বের আলোয় মুখ ভরে উঠল তার।

আমি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই লীলা চা আনতে গেল।

তারপর সব কথা শুনলুম চা খেতে খেতে।

যুদ্ধ থামবার পর স্বাধীন-ভারতে সোমেন পোস্টেড্ হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানেই ক্রমশ তার ভাবান্তর ঘটতে থাকে। রাতদিন চুপচাপ বসে থাকে, কাজ-কর্ম করে না, আর কেবল বলে, 'ঈস্—রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন! তা হলে আর ভারতবর্ষের রইল কী!'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—না, ঠিক আমার মুখের দিকে নয়—আমাকে পার হয়ে লীলার চোখ সুদূরের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল: 'ওরা ও'কে ছাড়িয়ে দিলে। বললে, মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট্। বুঝলনা—উনি একটা নতুন জগতে চলে এসেছেন। ও'র অসামান্য শক্তি একটা নতুন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।'

লীলা বলে চলল, 'আমরা কলকাতায় এলুম। আর যেদিনই এলুম—সেইদিনই উনি চলে গেলেন নিমতলার শ্মশানঘাটে। যেখানে রবীন্দ্রনাথকে দাহ করা হয়েছিল, এক মুঠো মাটি তুলে আনলেন সেখান থেকে। তারপর থেকে রোজ ভোরে সেই মাটির একটা ফোঁটা কপালে পরে উনি কবিতা লিখতে বসেন। সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কবিতা লিখে চলেন। অদ্ভুত—অসাধারণ সে কবিতা।। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবি সে-রকম কবিতা কখনও লিখতে পারেননি। দেখবে দু-একটা?'

লীলা উঠে গেল, ফিরে এল চমৎকার নীল কাগজে মুক্তোর মত হরফে লেখা কতগুলো কবিতা নিয়ে। সে কবিতা-গুলো কী রকম, আশা করি, তা আপনাকে আর বলবার দরকার নেই। 'তিলঙ্গমা'র পাতা খুলেই বোধ হয় আপনি তার কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম কাগজগুলোর দিকে।

লীলা বললে, 'জানো—বড় প্রতিভাকে কেউ বুঝতে পারে না, তাকে তুচ্ছ করে—তাকে অপমান করে। সেইটেই হল মূর্খের সান্ত্বনা—তার আত্মতৃপ্তি। দাদা বলে, ওর মাথা খারাপ; বউদি বললে, রাঁচীতে পাঠানোর কথা; মা কাঁদেন, বলেন, লীলার সর্বনাশ হয়ে গেল! কিন্তু আমি কেমন করে ওদের বোঝাব ও'র এই আশ্চর্য সৃষ্টি একদিন পৃথিবীতে হয়ত যুগান্তর আনবে—হয়ত নোবেল-প্রাইজের মত সম্মান ও'রও জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি শুধু ভাবছিলুম, অসাধারণ লীলা মিত্র কিছুতেই হার মানবে না: যে অসামান্য পুরুষকে সে জীবনে বেছে নিয়েছিল, এক-বিন্দু ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না তার মহিমা।

লীলা বললে, 'দাদা বলে, পাগলই যদি না হবে—তবে কেন অমন ছাইপাঁশ লেখে—যার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না? আমি বলি, এ তোমার ক্রসওয়ার্ড পাজল নয় যে 'মুড' আর 'হুডের' সমাধান করতে পারলেই হল। বউদি আরও ব্লাণ্টলি বলে, মাথা খারাপ না হলে তোমার গায়ে কেন হাত তোলে? আমি জবাব দিই, লেখার ধ্যানে ও যখন ডুবে থাকে তখন আমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ওকে বিরক্ত করি—ওর চিন্তার সুতো কেটে যায়—মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। যারা সত্যি-কারের শিল্পী, তারা এমন করে সংসারের হিসেব মেনে চলে না।'

এইবার আমার চোখে পড়ল। লীলার গলার কাছে একটা বন্যজন্তুর আঁচড়ের মত কতকগুলো নখের দাগ শুকিয়ে আছে। ওটা যে কিসের তা আর জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল না।

'তুমিই বল কমল। সাহিত্যের ভাল ছাত্র তুমি, শুনেছি লেখক হিসেবেও তোমার খুব নাম হয়েছে এখন। এগুলো কি সত্যিই পাগলের প্রলাপ? এগুলো কি সেই রকমের কবিতা নয়—যা সব ভাষা, ছন্দ, সংস্কারকে ছাপিয়ে নিজের ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে?'

আমি দেখলুম, দুটো হীরের উপর সেই অস্বচ্ছ আবরণটা কাঁপছে। যে আলো না-বাইরে, না-ভিতরে, স্থির জ্যোতির্ময়তার মহিমায় যা এতদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকত—এখন মনে হল, সেটা একটা প্রদীপের ম্লান শিখায় পরিণত হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে আমিই ওটাকে নিবিয়ে দিতে পারি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তুমি ঠিকই বুঝেছ লীলা। তোমার পরের কথাটাই সত্যি।'

দেখলুম, অনেক বছর আগেকার হীরক-দীপ্তি আবার ঝকমক করে উঠল। লীলার গলায় নখের হিংস্র আঁচড়গুলোকে একটা দুর্মূল্য গজমোতির হারের মত মনে হল এখন।

লীলা বললে, 'আমি ওর একটা পাণ্ডুলিপি ছাপব কমল। তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

একবারের জন্যে আমি দ্বিধা করলুম। তারপর লীলার চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বললুম, 'সে ত খুব ভাল কথা। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।'

সাংবাদিক-বন্ধু চুরুটটাকে অ্যাশ-ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, "এই সেই কাব্য—"তিলঙ্গমা"। আপনি ভাববেন না—এ সমালোচনা ছাপা হবে না কোথাও। শুধু এর একটি কপি থাকবে লীলা দে চৌধুরীর কাছে। সোমেনের পরেই পৃথিবীতে আমাকে সে সব চাইতে বিশ্বাস করে—দুনিয়ার সবাই চিৎকার করে সোমেনকে পাগল বললেও অসাধারণ লীলা জানবে, সোমেনের এই অসামান্য কবিতা একদিন বিশ্বসাহিত্যে বিপ্লব আনবে।"

একটু হেসে বন্ধু আবার জুড়ে দিলেন: "আর কে বলতে পারে, ভবিষ্যতের সমালোচক এই কবিতার মধ্যেই আরও বড় বোদলেয়ার, আরও বড় জেমস জয়েসের সন্ধান পাবেন কিনা!"

রাজভবনে নিমন্ত্রণ। পত্রের শিরোদেশে তারিখ রয়েছে ১লা অক্টোবর, ১৭৭৯। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী হেস্টিংস তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দনসহ শ্রীযুক্ত অমুককে আগামী বৃহস্পতিবারের খানাপিনা ও গান-বাজনার অনুষ্ঠানে সবান্ধবে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কিন্তু পত্রের পাদদেশে এক আশ্চর্য সাবধানবাণী। একমাত্র হুঁকোবরদার ছাড়া শ্রীযুক্ত অমুকের সঙ্গে অন্য কোন ভৃত্য থাকা চলবে না। প্রশ্ন উঠবে, সবাইকে বরবাদ করে হুঁকোবরদারের প্রতি এমন ঢালাও দরদ কেন? প্রশ্ন করব, ব্যাপারটা কি খুব ধোঁয়াটে লাগছে? আসলে ধুমধামের ব্যাপারে ধূমপানের ঘনঘটা ঘটানোই যে ছিল সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ধরন।

ইংরেজ উপনিবেশের আদিযুগের যে-কোন ভ্রমণ-কাহিনী কিংবা স্মৃতিকথার নীরস তথ্যের তেপান্তরে এগোতে এগোতে যখন ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে পড়েছে আপনার দৃষ্টিচারণ, তখন হঠাৎ বহুবিশেষণভূষিত এমন একটি বস্তুবিশেষের বর্ণনা আপনার চোখে পড়বে, যাকে হুঁকো বলে মেনে নিতে আপনার কিঞ্চিৎ বিস্মিত বা বিচলিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। আপনার ম্লান দৃষ্টি উস্কে-দেওয়া প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেখানটায়। আপনি পড়ে যাবেন—"নিঃসন্দেহে হুঁকোকে বলা চলে 'হৃদয়-সখা।' তা সে ক্লান্ত পথিক বা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী যারই কাছে হক। হুঁকোই আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি জীবনের গোপন ঘটনাবলী। আবার হুঁকোই হল আমাদের জীবনে সেই রকম এক পরামর্শ-দাতা, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যার মতামতে আস্থা রাখা যায়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা সংসারে সে হল সামগ্রী হিসেবে সুশ্রী ও সুরুচিকর। আবার দেখুন, জনসমাবেশে বা উৎসবে আনন্দ-দানের উৎস হিসেবে তার সহযোগিতা কেমন সুস্বাদু। হুঁকোর মৃদু-মধুর গুঞ্জন নাইটিঙ্গেলের কুজনকে লজ্জা দেয়। গোলাপের গালে লজ্জার আভা ফোটায় তার সুবাসের ছটা। তাকে যখন নিশ্বাসে গ্রহণ এবং প্রশ্বাসে বর্জন করছি, তখন বারে বারে মনে হয়—জীবন সুধাপান করে চলেছে।"

বিজিত দেশের নিষ্কাষিত তরবারি আর পরিপূর্ণ কোষাগারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে প্রবল ইংরেজ যেদিন এদেশে গদিয়ান হয়ে বসল, সেদিন তার চোখের মধ্যে ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের সুদূরব্যাপী স্বপ্ন, আর চোখের সামনে ছিল আরাম উপভোগের অতুল ঐশ্বর্যরাশি। অধিকৃত রাজ্যের উপরতলায় জীবন উপভোগের যে-সব বৈচিত্র্যে-ভরা বিলাস-ব্যবস্থা সেকালে স্বগর্বে ও স্বমহিমায় প্রচলিত ছিল, সেদিকে তাকিয়ে অধোবদন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত ইংরেজ সমাজের লাল মুখ। বক্ষদেশে এক গভীর অসমকক্ষতার জ্বালা নিয়েই তারা ভাবত, যদি না রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহের চালে দিন কাটানো যায়, তা হলে জীবন তুচ্ছ, দেশাধিকারে ধিক।

ফলে বেশ দ্রুতগতিতেই ইংরেজদের চোখ পড়ল বঙ্গের গৃহস্থ-সংসারের চন্দ্রপুলি আর নারকেল-নাড়ুর দিকে। বাঙালীর পান-সুপুরিতে রাঙা হল তাদের ওষ্ঠাধর। লেবুর রসের মিশেল-দেওয়া শীতল শরবত জুড়িয়ে দিল তাদের গ্রীষ্মের দাহ। তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করল বাঙালীর কালী-পুজো আর কীর্তন। তাদের কর্মহীন ক্লান্তিকর অবসরকে মুখরিত করল বাঙালীর টপ্পা-ঠুংরী, খেউড়-খেমটা। অবশেষে তাদের অন্তঃপুরে এল বাঙালীর হুঁকো। হুজুরের হুকুমে হুঁকোবরদার হুঁকোর কপালে রাজটীকা দিলে। হুঁকো মুখে দিয়ে ইংরেজরা 'হঠাৎ-নবাব' হয়ে উঠল। আসলে কিন্তু ইংরেজ হঠাৎ-নবাবেরা যেটা ব্যবহার করতেন, সেটা ঠিক হুঁকো নয়। সেটা সোনা-বাঁধানো আলবোলা কিংবা রুপোয় গড়া গড়গড়া। ইংরেজদের নানা মুখে ঘুরতে ঘুরতে সেকালে তৈরী হয়েছিল হুঁকোর নামের নামাবলী। কেউ তাকে বলেছে Cream can, কেউ ডেকেছে aillon, কারও মুখে Hubble-bubble। কারো গলায় goodgudi, অনেকের ভাল লেগেছে Kalyan অপরের সোহাগ marghiles-এ। কিন্তু সবাই সেই একের উপাসনা। রাম-রহিমের মত অভিন্ন।

হুঁকো বলতে আজকে যে বস্তুটিকে আমরা চিনতে পারি, সেটা সেকালে ব্যবহার করত পাল্কী-বেয়ারারা। আলবোলা বা গড়গড়ার অঙ্গে হুঁকো ছিল একটা বিশিষ্ট অনুষঙ্গের মত। সে আছে কেন্দ্রে। তার চারপাশে চাপরাশ-আঁটা নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের খবরদারি চলেছে। দেখা গেল পায়ের তলায় ইয়া লম্বা এক দশহাতী নল যেন রাজ-দরবারে করুণাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তুলে দেখুন, একে-বারে দিব্যকান্তি রাজপুরুষ। গায়ে জরীর পোশাক জড়ানো। আবার হুঁকোর মাথায় যে কল্কে, সেদিকে তাকান। তার বুকের ভিতরে আগুন। মাথায় রাজমুকুট। সেই মুকুট বা ঢাকনি থেকে ঝুলছে রুপোর ঝালর। উড়ছে মধুর খোসবাই। উড়বেই ত। গড়গড়ার জলে যে গোলাপজল মেশানো। গন্ধটা শুধু গোলাপজলেরই বা কেন? তামাক তৈরির মধ্যে কারিকুরি নেই কিছু? তাই যদি না থাকবে, তা হলে কোথায়

বোম্বাই, কোথায় বুন্দেলখণ্ড, সেখানে লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে তামাক আনানোর এত হাঙ্গামা কেন?

ইংরেজ-পরিবারে ধূমপানের প্রথম পর্ব শুরু হত প্রাতঃকালে। ক্ষৌরকার চুল, নখ, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে, কানের ময়লা তুলে দিয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সাহেব ঢুকতেন ভোজনাগারে। ভৃত্য এসে চুল আঁচড়ে দিত। আর হুঁকো-বরদার পাশ থেকে বাড়িয়ে দিত দশহাতী নলটা। স্বদেশে সাহেবরা এই সময়টা খবরের কাগজ পড়ে কাটাতেন। কলকাতায় কাটত ধূমপানে। খবরের কাগজের চেয়ে ধূমপানটাই যে অধিকতর আকর্ষণের, সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে কোন কোন সাহেব খবরের কাগজের উপর তীক্ষ্ন কটাক্ষ করেছেন।

প্রাতরাশের পরে আর-একবার হুঁকোবরদারদের মধ্যে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে যেত, সেটা দ্বিপ্রহরের আহারের পর। আহারের পর ধূমপান করাটা এদেশীয় রীতি। সাহেবরা সেটা গ্রহণ করেছিল। অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে সাহেবরাও তাঁদের নিজস্ব হুঁকোটা এগিয়ে দিত। এটা অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তবে এক নলে দুজনের ধূমপান করা চলত না। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা নল। ইংরেজীতে যাকে বলা হত Snake। উৎসবাদি উপলক্ষে ধূমপানের এই আড়ম্বর বৃদ্ধি পেত দ্বিগুণতর। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত অতিথিই তাঁদের সংগে নিজস্ব হুঁকোবরদার নিয়ে উৎসবে বা ডিনার পার্টিতে আসতেন। আহারের পর লেডিরা কক্ষান্তরে চলে গেলেই শুরু হত তাম্রকূট-পর্ব। দৃশ্যারম্ভেই দেখা যেত পাশের কামরা থেকে হলঘরে সারবন্দী ঢুকছে যে-যার প্রভুর অভিরুচি মাফিক সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে। ধূমপানের অব্যবহিত পূর্বে সমাগত জনমণ্ডলীর গায়ে গোলাপজলের সুবাস কিংবা কস্তুরী-মৃগের সৌরভ ছিটানো হত। তার কিছুক্ষণ পরেই সারাটা হলঘর প্রকম্পিত হয়ে উঠত হুঁকোর হুঙ্কারে। ঝড়ের সংগে মেঘনাদ আর মেঘনাদের সংগে বজ্রপাতের আকাশ-মাটি-কাঁপানো গর্জন মিশলে যেমন হয়, অবিশ্রান্ত হট্টগোল, তুমুল অট্টহাসি, অসংলগ্ন চিৎকার একসংগে মিলে তেমনি উন্মত্ত আবহাওয়া জেগে উঠত। আধ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগত এই উন্মাদনার উত্তাপ জুড়তে। তারপর শুরু হত স্বাভাবিক কথোপকথন, কুশল-বিনিময় ইত্যাদি। কথার দিকে কর্ণপাত করার অবস্থাটা ফিরে এলেও তখনও কথকের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করার রফা-রফা। কেননা, সারা হলঘর তখন ঊর্ধ্ব-অধঃব্যাপী পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন। এই উন্মাদনাময় পরিবেশে সবচেয়ে বিব্রত, বিপর্যস্ত হতে হত তাঁদের, যাঁরা নবাগত, অথবা ধূমপানে অনাসক্ত। তেমন সাহেবের সংখ্যাও সেখানে কম ছিল না। তাঁদের দরজায় ট্যাবলেট ঝুলত—No Hokka up-stairs। তেমনি আবার মেমসাহেবদের মধ্যেও হুঁকানু-রাগিনীর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল ধীরে ধীরে। পার্সিয়ান তামাকের উগ্র ঝাঁঝালো ও মিঠে খোসবাই তাঁদের খাস-কামরা থেকে হলঘরে টেনে নিয়ে আসত কখনও কখনও। কেউ সাহেবদের অলক্ষ্যে, কেউ-বা সাহেবদের

প্রাচীন কোলকাতার হুঁকোবরদার

সংগেই হুঁকো টানতে বসে যেত। অবশ্য এ-রীতি খুব বেশী সংক্রামিত হবার মত সমাদর পায়নি। হুঁকো নিয়ে মাতামাতি যত, হাতাহাতিও তেমনি। এজাতীয় হাতা-হাতির সূত্রপাত হল হুঁকোর নলকে নিয়ে। একের হুঁকোর নল অপরের ডিঙিয়ে যাওয়াটা সেকালে একটা নগণ্য ব্যাপার ছিল না। মস্ত বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হত সেটা। সেই ক্ষমাহীন অসৌজন্যতার পরিণামে "A duel was inevitable."

"গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানি"র লেখক তাঁর সমসাময়িক যুগের বর্ণনায় বলেছেন, "মনে পড়ে সেই সময়ের কথা, যখন দু বেলা আহারের শেষে হুঁকোর প্রচলন শুরু হচ্ছে। এও দেখেছি খাবার টেবিলের এধারে ওধারে তিরিশটা করে হুঁকো সাজানো। হুঁকোবরদারেরা চিলম সাজত। লাল আগুন ঠিকরে বেরুত জ্বলন্ত গুল থেকে। গৃহস্বামী প্রতিবেশীর সংগে বাক্যালাপ করতেন আর তিরিশ তিরিশ যাটটা হুঁকোর গুড় গুড় শব্দের সে এক বিচিত্র না, বিচিত্র নয়—বেসুরো কর্কশ ধ্বনিতে ভরে উঠত সারা ঘর। যাই হক, একথা সত্যি যে, সেযুগের কোন ডিনারই হুঁকোর বহুল সমাবেশ ছাড়া 'বহুৎ আচ্ছা' হয়ে উঠতে পারেনি।"

১৮৪০ পর্যন্ত এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

এযাবৎ যা বলা হল, তা শুধুই হুঁকোর উপাখ্যান। হুঁকো আবিষ্কারের উৎসে পেঁছতে গেলে কয়েক শতক পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সপ্তদশ শতকের উত্তর-পারস্যে। কিংবদন্তী বলে, উত্তর-পারস্যের রাজা করিম খাঁ জেন্দই হলেন হুঁকোর আবিষ্কর্তা। কিন্তু ইতিহাস অনুমান মানে না। প্রমাণহীনতাই সেখানে প্রমাদ। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রমাণ আছে বইকি। প্রাচীন বোম্বাইয়ে হুঁকোর যেদিন প্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেদিন লোকে তাকে চিনত Cream Can নামে। এই Cream Can-ই কি Karim Khan-এর স্মৃতিবাহী নয়। এছাড়াও আরবীতে hugga নামের একটা শব্দ আছে। যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'কাসকেট'। কারও কারও মতে ঐ আরবী hugga-ই হল আধুনিক hukka-র ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ।

ভারতবর্ষে হুঁকোর আগে তামাকের প্রচলন ছিল। আকবরের রাজসভায় দেখা গিয়েছে তামাক সেবনের **handsome pipe of Jewel work** রাজ-দরবারে তামাক আমদানির সে-কাহিনী সত্যি-মিথ্যের রঙে পালিশ-করা, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক।

আসাদ বেগ কাজানী আকবরের রাজ-দরবারের একজন কর্মচারী ও খ্যাতিমান কবি। এক সময় বিজাপুরে বেড়াতে গিয়ে তিনি একদল তীর্থযাত্রীর সংগে পরিচিত হন। তারা সদ্য ফিরেছে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে। এবং তাদের মুখে তামাক খাওয়ার পাইপ। আসাদ বেগ কৌতূহলবশতই তাদের কাছ থেকে তামাক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ফেরার পথে প্রচুর তামাকপাতা কিনলেন তাদেরই কাছ থেকে। বিজাপুর থেকে কেনা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারের সংগে সেই তামাকপাতাও তিনি উপহার দিলেন সম্রাট আকবরকে। এবং পাতার সংগে কারুকার্যখচিত পাইপও।

আকবর সেই তামাকে সবে কয়েকটা টান দিয়েছেন কি দেননি, রাজদরবারের চিৎকার। নবাব খান-ই-আজম আশ্বাস দিলেন, আপনি খেয়ে যান সম্রাট। পবিত্র আরব দেশে অবাধে তামাক সেবন করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রবল আপত্তির ঝড়

বহাল দরবারের চিকিৎসকেরা। তাঁরা বললেন, জাঁহাপনা, ধূমপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ধূমপান-ঘটিত ব্যাধির কোন প্রতিষেধক নেই। আসাদ বেগও জেদী। তিনি সম্রাটকে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বললেন। কারণ তামাক সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

দরবারের চিকিৎসকেরা তবু নাছোড়-বান্দা। তামাক প্রচলনের বিরুদ্ধে তারা জোরালো প্রতিবাদ শুরু করে দিলে। আসাদ বেগ বললেন, আশ্চর্যই বটে! পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই যে-কোন সামাজিক রীতি কোন একটা সময়ে ত একেবারেই নতুন ছিল। নতুন কোন জিনিস প্রচলন করার সময়ে দেখা যায় জনসাধারণ সেটাকে গ্রহণ করতে বেশ কিছুকাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আসাদ বেগেরই জয় হল। বিরোধী পক্ষের সোরগোল আকবরের হাতের একটা ইঙ্গিতেই নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আসাদ বেগ রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছেই পাঠালেন তামাকপাতার নমুনা। খবর পেয়ে আগ্রার ব্যবসায়ীরা এল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে। কীভাবে এবং কোথা থেকে এই তামাকপাতা এ-দেশে আমদানি করা যায় তার হদিস জেনে নিলে সবাই। দেখতে দেখতে তামাকপাতার ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল কয়েক বছরের মধ্যে। তামাক খাওয়ার চর্চাটাও হয়ে উঠল সামাজিক রীতি। সেই সঙ্গে এ-দেশেও শুরু হল তামাকপাতার চাষ। ১৭৪০ সনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই মাদ্রাজ আর কলকাতায় এটাকে 'cash-crop' হিসেবে ঘোষণা করলে। অর্থাৎ অন্যান্য শস্যাদি এদেশ থেকে যা তারা কিনবে তার ট্যাক্স দেবে জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে। কিন্তু তামাকপাতা কেনার বেলায় জিনিসের বদলে টাকা।

মনে রাখা দরকার, তখনও কিন্তু সর্বসাধারণ্যে হুঁকোর প্রচলন হয়নি। কুম্ভকাররাই প্রথম 'পাইপে খাওয়া' তামাকের ধারাটাকে পাল্টে দিলে কলকে বা চিলম আবিষ্কার করে। আগে তামাকপাতা। তারপর কলকে। হুঁকোর ক্রমবিকাশের পথে এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

ভারতবর্ষ যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে তখন এদেশে সুগন্ধী নির্যাসের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে। কীভাবে যেন তামাকসেবীদের মাথায় একটা পরিকল্পনা আসে, সুগন্ধী জলের মধ্যে দিয়ে তামাকের ধোঁয়া পান করতে হবে। তার ফলেই চিলম-এর সঙ্গে সংযোগ ঘটল আরও নানা সাজসরঞ্জামের। এবং তা থেকে উদ্ভূত হল হুঁকোর আদি রূপ বা আদিম হুঁকো। রূপোর কারুকার্যমণ্ডিত যে প্রথম বহুমূল্য একটা হুঁকো ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল, তার অধিকারী ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। প্রবাদ আছে, ধাতুনির্মিত হুঁকোর সেই শিল্পীটিকে পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গীর সাতটি গ্রাম উপহার দিয়েছিলেন।

মোগলযুগে তামাকের সুগন্ধ যে হারেমের বিলাসিতার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মোগলচিত্রে ধূমপানরতা রমণীরা। ক্রমে মোগল-সাম্রাজ্যের দেউটি একে একে নিভে এল ভারতবর্ষে। ইংরেজরা সম্রাট-বাদশাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রাজ্যপাট। আর মুখ থেকে নিল হুঁকোর নল। ভারতবর্ষের নতুন রাষ্ট্রনায়ক হল ইংরেজ। আর ভারতবর্ষে শুরু হল হুঁকোর একনায়কত্ব, যতদিন পর্যন্ত না সিগার-চুরুট-বিড়ি-সিগারেটের সম্মিলিত শক্তি আত্মঘোষণা করল তাদের গণতান্ত্রিক কার্যসূচী নিয়ে।

ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তাকাল। লোকটির মুখে চাপ-দাড়ি ও গোঁফ। ডান চোখটা নেই। নেই মানে একেবারে অক্ষিগোলক-সমেত সবটাই উধাও সেখান থেকে। আলোটা ভালভাবে না পড়ায় ডান চোখের গহ্বরটাকে বড় বেশী অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা ভদ্রলোকের। ট্রেনের ঝাঁকুনিতেও অটল হয়ে বসে আছে লোকটা একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে। বাইরে শীতের রাতের কুয়াশাকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে আমাদের ট্রেন তখন প্রচণ্ড-গতিতে ছুটে চলেছে।

খড়্গপুরে যখন উঠলাম তখন ভদ্রলোক শুয়ে ছিল আমার দিকে পিছন ফিরে। মিনিট পাঁচেক আগে পাশ ফিরতেই আমাকে দেখে উঠে বসেছে ভদ্রলোক। আর তার পর থেকেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে আর কী যেন ভাবছে।

আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। এই এক-চক্ষুহীন মানুষটা হঠাৎ আমার মধ্যে কী দ্রষ্টব্য পেল?

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার রাগ হল, ফস্ করে বলেই ফেললাম, "আমার দিকে তাকিয়ে আপনার হাসবার হেতুটা জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন, "আপনি অজিত গুপ্ত?"

"তার মানে? আমি অজিত গুপ্ত হলেই বা আপনি হাসবেন কেন?"

"চিনি বলে। আমায় চিনতে পারছ না জিতু?"

মানে? ভদ্রলোক যে ডাকনামটিও জানে।

"কে আপনি?"

ভদ্রলোক হাসল, "আমার নাম সঞ্জয়—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় নই—পাটনার সঞ্জয় সেন।"

চিনলাম। সঞ্জয় সেন। স্কুলে পড়তে পড়তে কী করে একবার ওর ডান চোখে ঘা হয়েছিল—সেপ্‌টিক হওয়ায় শেষে পুরো চোখটাই উপড়ে ফেলে দিতে হয়। অবস্থা খুব ভাল ছিল না সঞ্জয়ের। বাপমা ছিল না। কাকার ওখানে থেকে খুব কষ্টে-সৃষ্টে পড়ত। আগে একটু ডানপিটে মত ছিল, কিন্তু ওই চোখটা খারাপ হবার পর থেকেই কেমন যেন মিইয়ে গেল। কারও কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সে গাল খেত—কানা কোথাকার! সবাই যে আড়ালে তাকে কানা সঞ্জয় ছাড়া অন্য নামে ডাকে না তা সে জানত। তাই সে সবার থেকে একটু দূরে দূরে থাকা আরম্ভ করল। একা একা। তার সেই একাকিত্বের নির্জনতায় একমাত্র আমাকেই সে একটু আন্তরিকতার সংগে আহ্বান জানাত। খানিকটা বন্ধুত্ব তার সংগে যে ছিল একথা আজও স্বীকার করি আমি—যদিও আড়ালে আমিও তাকে কানা সঞ্জয়ই বলতাম। স্কুলের পর থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ও গেল আর্টসে, আমি সায়েন্সে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল সঞ্জয়, তবু বি-এ পাস করে আর পড়ার ব্যবস্থা করতে পারল

না সে। কাকার অবস্থাও ভাল ছিল না। চাকরির চেষ্টা শুরু হল তখন। আর ঠিক সেই সময় কানাঘুষো শুনলাম যে, সঞ্জয় নাকি প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম সুধা। আমাদের পাড়ার মেয়ে। আমার ছোট বোনের মতই। একদিন সুধাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'হ্যাঁরে সুধা, সঞ্জয় নাকি তোকে ভালবাসে?' সুধা জবাব দিল, 'আমাকে ভালবাসে ত কী এমন অপরাধ করেছে? বাসুক না।' আমি বললাম, 'আর তুই?' সুধা খিল খিল করে হেসে বলল, 'মরণ আর কি, আমি ওই কানাকে ভালবাসব কেন?' সঞ্জয় সেনের বন্ধু হলেও সুধার কথাটা আমার পছন্দ হয়েছিল সেদিন। ভালবাসার ব্যাপারেও যেমন, তেমনি চাকরির ব্যাপারেও সঞ্জয় সেনের একটি চোখ তার বৈরিতা করল। সে আবিষ্কার করল যে তার একটি চোখের জন্যই তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা সব কিছুই পৃথিবীর কাছে নিরর্থক হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম যে সঞ্জয় নিরুদ্দেশ। তার কাকা দু-একদিন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে হাল ছেড়ে দিলেন। আমরাও কিছুদিন সহানুভূতির সংগেই কানা সঞ্জয়ের চর্চা করে অবশেষে তাকে ভুলে গেলাম।

তারপর আজ দীর্ঘ বারো বছর পরে—

বললাম, "আশ্চর্য, কতদিন বাদে দেখা হল!"

সঞ্জয় বলল, "আশ্চর্য হবার কী আছে জিতু?"

"এই হঠাৎ দেখা?"

"জীবন একটা পথ—ঘুরে-ফিরে এই পথে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে—কোন কিছুতেই আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই।"

"তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।"

"সত্যকে জানলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে না জিতু।"

সঞ্জয় কি শাস্ত্র থেকে আবৃত্তি করছে? প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় বললাম, "হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলে কেন?"

"একটা উদ্দেশ পাবার জন্যে। হ্যাঁ হে, আমার কাকাবাবু কেমন আছেন?"

অবাক হয়ে গেলাম, "বল কি হে, আর যাওনি বাড়ি?"

"না ত!"

"তোমার কাকাবাবু ত প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।"

নির্বিকারভাবে সঞ্জয় বলল, "যাক, একটা চিন্তা কমে গেল।"

আমি না বলে আর পারলাম না, "কাকার মরার খবর পেয়েও তোমার একটু দুঃখ হচ্ছে না? এও কি তোমার সত্য-বোধের ফল নাকি হে?"

সঞ্জয় হাসল, "সত্যকে জানবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর পড়েছি তাই আওড়াচ্ছি। সত্যবোধ হলে হয়ত কিছু জিজ্ঞেসই করতাম না।"

হাসলাম, "খুব শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ছ বোধ হয়?"

সঞ্জয়ের মুখে একটু বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল, বলল, "পড়ছিলাম, কিন্তু নিজের জন্য নয়। আমি যাঁর কাছে চাকরি করতাম তাঁর জন্যে।"

"কে সে?"

"একজন অন্ধ।"

কৌতূহল হল, বললাম, "অন্ধ? কী চাকরি করতে তাঁর ওখানে?"

সঞ্জয় বলল, "সেক্রেটারির কাজ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সঞ্জয়ের শেষে যে কাজ ছিল।"

"হেঁয়ালি কোর না—খুলে বল সঞ্জয়।"

সঞ্জয় একবার তাকাল আমার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বিচার করল যে আমায় বলা যায় কি না। তারপর সে হেসে বলল, "তাহলে একটু ধৈর্য ধর—সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।"

আমাকে একটা দামী সিগারেট দিয়ে সঞ্জয় নিজেও ধরাল, কম্বলটা আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল :

আমি আজ যা বলব তা শুনে তুমি হয়ত আমার ওপর রাগ করবে, হয়ত ভাববে যে আমি একটা পাপিষ্ঠ। পাপপুণ্যের সংজ্ঞা এখন তোমার কী তা আমি জানি না জিতু, তবে এ নিয়ে আমাদের দুজনের মতের মিল যে হবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে আমার তরফ থেকে এইটুক অকপটে বলতে পারি যে, আমি একটা একচক্ষুহীন মানুষ। মুখবন্ধকে গুরুতর শব্দ প্রয়োগে গুরু-গম্ভীর করে তুলে যে পরিমাণ কৌতূহল আমি তোমার মধ্যে সৃষ্টি করছি সেই পরিমাণ চমকপ্রদ কাহিনী তুমি আমার কাছে পাবে কিনা জানি না। কিন্তু কাহিনী মানে ত শুধু ঘটনা নয় জিতু, কাহিনী মানে একটি উদ্ঘাটন—একটি সত্যের প্রকাশ। যদি সেটুক পাও তা হলেই আমার বলা সার্থক হবে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে জিতু? আমার ডান চোখটা নষ্ট হয়ে গেল। সবাই হাসত আড়ালে। একমাত্র তুমিই খানিকটা প্রীতি পোষণ করতে। অবশ্য তুমিও যে আড়ালে এক-আধবার হেসেছ তাও আমি জানি। লজ্জা পেও না, আজ বুঝি যে তোমাদের কারও দোষ নেই, তোমরা সবাই মানুষ। আজ বুঝি যে মানুষ শুধু মানুষের বহিরঙ্গটাই বড় করে দেখে। প্রাকৃতিক বিকৃতিকে মানুষ ঘৃণা করে, করুণা করে উপহাস করে, কিন্তু ভালবাসে না কখনও। মানুষের দেহ আর আত্মা বলে দুটি কথা [illegible]। [illegible] [illegible] নাকি [illegible] সবাই একবর্ণ, একগুণ, [illegible] ওজন। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না। মায়া শব্দের অর্থ আগে বুঝতাম না, পরে বুঝেছি যে তা সত্য। শিক্ষা, বুদ্ধি, তপস্যাকে তা ব্যর্থ করে ওই দেহের স্তরেই এনে বানচাল করে। ওই মায়ার প্রভাবের অমৃতকলস ছেড়ে কৃমি-কীট-ভরা নর্দমায় এসে মুখ থুবড়ে পড়তেই বেশী ভাল লাগে।

ছোটবেলা থেকেই আমি এই বোধ-সমেত বড় হয়ে উঠেছি। আমার এই উপলব্ধিকে বদলে দেবার মত একটি ঘটনাও তখন ঘটেনি। ভাল ছাত্র ছিলাম একথা তোমার হয়ত মনে আছে। বি-এতে দর্শন ও সংস্কৃত ছিল, ডিস্টিংশনে পাস করেছিলাম। কিন্তু তবু ভাল চাকরি পেলাম না। ভালবাসলাম। তুমি নিশ্চয়ই চেন সে মেয়েটিকে। সুধা। কিন্তু চাকরি আর ভালবাসা—দু ব্যাপারেই আমার এক চোখের শূন্যতা ব্যর্থতা আর হতাশার সৃষ্টি করল। শেষে একদিন উধাও হয়ে গেলাম।

পাটনা থেকে গেলাম কলকাতা। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে ডিস্টিংশনের সব চিহ্ন মুছে গেল। এক মোটরের কারখানায় মিস্ত্রী হলাম। সেখানেই ড্রাইভিং শিখলাম। বছর দুই কাটল। সংস্কৃত কাব্য আর নাটকের রস পড়ে ছাই হয়ে গেল। শিলাকঠিন গদ্যের রূপ ধারণ করল আমার মন। হিংস্র হয়ে উঠলাম। একা মানুষের মনের বল অনেক হয়। আমারও তাই হল। আমার ত কেউ ছিল না। মা বাপ ভাই বোন বন্ধু—কেউ না। ঘৃণা হল পৃথিবীর ওপর—একটি আক্রোশ জন্মাল। শুধু অন্ধ, কানা আর বিকলাঙ্গেরাই আমার সহানুভূতির পাত্র হল। বাকী সবাই যেন শত্রু। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। নীতির বাঁধন ছিঁড়ে ফেললাম। পয়সা দিয়ে সস্তা নারীদেহের সংগে পরিচয় ঘটালাম। জয়-মা-কালী ব্র্যান্ড দিয়ে আমার বিবেক ও আত্মার শ্বাসরোধ করলাম। আমার গোত্রান্তর ঘটল সাময়িক-ভাবে। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন একটা নতুন চাকরি পেলাম। এক মস্ত বড়-লোকের বাড়িতে মোটর চালাতে হবে। নিলাম চাকরিটা। দিনরাত লোহালক্কড় এবং পেট্রল গ্রীজ আর ভাল লাগছিল না।

মালিকের আসল নাম বলব না। ধর তাঁর নাম বিনায়ক চৌধুরী। কলিয়ারির মালিক তিনি। দক্ষিণ-কলকাতায় তাঁর বিরাট বড় বাড়ি। লক্ষপতি লোক। কিন্তু অন্ধ। বসন্ত রোগে তাঁর দুটি চোখই গেছে। ভদ্রলোকের বয়স তখন বত্রিশের মত হবে, আমার চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের বড়। চব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তার পরের বছরেই এই দুর্বিপাক ঘটে। সঞ্চারিণী [illegible] মত তাঁর স্ত্রী। [illegible] রূপ। সে রূপ [illegible] [illegible] [illegible] ভার নেমে আসে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর।

যে রূপ আমার এই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার বর্ণনা না করে পারছি না। আজ-কাল রূপবর্ণনাকে মানুষ বড় করে স্থান দেয় না। কিন্তু আমি সংস্কৃতের ছাত্র, রূপের স্তুতি না করে পারি না। বিনায়ক চৌধুরীর স্ত্রী অনসূয়া চৌধুরী বিলেত-ফেরত এক নামজাদা ব্যারিস্টারের সুশিক্ষিতা মেয়ে। আজকাল তাঁর বাপ নেই। এক ভাই আছেন—তিনি বিবাহিত ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অনসূয়া চৌধুরীর বয়স পঁচিশের বেশী নয়, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। তাঁর আবেশভরা যৌবনের ওপর অতীত-কৈশোরের ছায়া যেন তখনও বর্তমান ছিল। তিনি বাণভট্টের কাদম্বরী নন, তবু কাদম্বরীর দেহবর্ণনার সঙ্গে যেন তাঁর সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতির দৃঢ়-নিষ্পেষণে অতি-ক্ষীণ তাঁর কটিদেশ। পয়োধরের উন্নতি যেন অন্তরায় ছিল বলেই তাঁর কটিদেশ অনসূয়া চৌধুরীর মুখ দেখতে না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কটিদেশ থেকে যেন দ্বিধা-বিভক্ত লাবণ্যের স্রোতের মত নেমে গেছে তাঁর উরুযুগল। তাঁর বাহুদুটি যেন দুটি চঞ্চল মৃণাল। ঠোঁট দুটি যেন রূপসাগরের দুটি তরঙ্গ। দুটি চোখ যেন দুটি কৃষ্ণ-ভ্রমর। আর তাঁর হাসি—সে যেন পদ্মরাগমণির বরণডালায় মুক্তার স্বপ্ন। বুঝতে পারছি জিতু, তোমার সন্দেহ হচ্ছে। মনিব-পত্নীর রূপ নিয়ে আমার এত আগ্রহ কেন? সেই জন্যেই ত আগে বলেছি যে, আমাকে তুমি পাপিষ্ঠ ভাবতে পার। তা ভাব। আমি যা সত্য তাই বলছি। কত বছর কেটে গেছে, তবু অনসূয়া চৌধুরীর রূপের সেই প্রথম-দর্শন-স্মৃতি আমাকে এখনও প্রেতের মত অনুসরণ করে। ফুলের গন্ধে, পূর্ণিমার আলোতে, কালবৈশাখীর উদ্দাম হাওয়ায়, চন্দ্রহীন রাতের অতি-নির্জন ও নিকষ-কালো কোন কোন মুহূর্তে এখনও আমার অনসূয়া চৌধুরীর রূপের কথা মনে পড়ে আর মনে পড়ে যে আমি একচক্ষুহীন—অর্ধেক-অন্ধ।

রাগ কোর না জিতু। তোমাকে ত আগেই বলেছি যে, অকপটে সব কথা বলব। না, আমার লজ্জা হচ্ছে না, কারণ আমি জানি যে বিধাতার দুরন্ত ইচ্ছা না হলে তোমার সঙ্গে আমার আর সহজে দেখা হবে না। হ্যাঁ, আমি টাটানগরে নেমে যাব। রাতশেষে আমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার তোমার একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে শোন। আমি চাকরির খবর পেলাম। চৌধুরী বাড়িতে ড্রাইভার আর-একজন ছিল। কিন্তু গাড়ি দুটি। একটি মালিকের, দ্বিতীয়টি তাঁর স্ত্রীর। আমার ওপর দ্বিতীয়টিরই ভার পড়বে।

বিনায়ক চৌধুরীর সামনে প্রথমেই হাজির করা হল আমাকে। দোহারা গড়ন ভদ্রলোকের। দামী ধুতি ও জামা পরনে। দেশী কায়দায় সাজানো বাইরের কামরা। ঘরের চার দিকে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি টাঙানো। আর ছিল বীণা, তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা ও পাখোয়াজ। অনুমান করলাম যে ভদ্রলোক সঙ্গীতানুরাগী। সামনে ম্যানেজার ছিলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক, নাম শ্যামাদাস ভট্টাচার্য। বিনায়কবাবুর বাপের আমলের লোক। বাপের মতই। বিনায়ক আমাকে শিক্ষা-দীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ভাসা ভাসা জবাব দিলাম যে, ইংরেজী-বাংলা লিখতে পড়তে জানি। আরও দু-একটা প্রশ্নের পর আমার চাকরি হল। বিনায়ক তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। অনসূয়া চৌধুরী আমার

জীবন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আমায় দেখে সম্মতি জানালেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু ও অস্পষ্ট একটু হাসি ঝিলিক দিল। আমি বুঝলাম যে সে হাসি আমার একচোখের উৎকট শূন্যতাকে দেখে। কিন্তু আমার রাগ হল না, কারণ আমি আমার এক চোখ দিয়েই তাঁর দু চোখের মধ্যে এক বিচিত্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। স্বামীর ওপর সে দৃষ্টি থাকে না, কারও ওপর নয়—সেই দৃষ্টি যেন চমকে চমকে বাইরের দিকে কী খোঁজে।

কাজ শুরু করলাম। বেশী খাটতে হত না। সারা দিনে হয়ত দু-তিনবার বেরোয় অনসূয়া দেবী। বান্ধবীদের বাড়ি। সবাই বড়লোক। কিংবা হয়ত কোনদিন বিকেলে গড়ের মাঠে, নয় ত সিনেমায়। বাড়িতে ঝি-চাকর অনেক, কিন্তু আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যাঁরা আত্মীয় বলে প্রচার করেন তাঁদের সঙ্গে অনসূয়ার বনে না বলে বিনায়কেরও বনে না। হ্যাঁ, বিনায়কের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেরোতেন তিনি। এক-আধদিন। বেড়াতে কিংবা কোন গানের জলসায়।

গান গাইতেন বিনায়ক চৌধুরী। চমৎকার মিষ্টি গলা তাঁর। পৌরুষ ছিল তাতে। বড় বড় ওস্তাদের কাছে ছোটবেলায় গান শিখেছেন। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গ গানই বেশী গান। কাজ আর কী তাঁর, ওই কাজ। গ্র্যাজুয়েট তিনি। কিন্তু সম্পত্তির কাগজপত্র বা পড়াশোনা আর ত হবে না তাঁর, তাই গানবাজনার চর্চাই একটা প্রধান কাজ। একজন সেক্রেটারি আছেন তাঁর, মাঝে মাঝে এটা ওটা পড়ে শোনায়। কিন্তু ওসব বেশী ভাল লাগে না তাঁর; ভাল লাগে শুধু অনসূয়ার সঙ্গ আর গান। বিয়ের এক বছর বাদেই তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন—অনসূয়ার সেই দেবীদুর্লভ সৌন্দর্য চিরকালের জন্য তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হলেও তার স্মৃতিটুকু তাঁর দু চোখের অন্ধকারে বহু দূরের তারার মত জ্বলে।

কিন্তু অনসূয়ার কি ভালো লাগত স্বামীর সঙ্গ? না। প্রথম দিনে তাঁর চোখের চঞ্চল তারাতে আমি যা পাঠ করেছিলাম তা ঠিক। প্রথম কিছুদিন ভাবলাম, আমার কি ভুল হল? এক মাস বাদেই যখন অনসূয়ার বিশ্বাস জন্মাল আমার ওপর, তখন টের পেলাম যে আমার শয়তান মন ঠিকই ধরেছিল। অনসূয়া চৌধুরী তাঁর অন্ধ স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। গড়ের মাঠে আর সিনেমাতে এঁর বেড়াতে যাওয়ার মাত্রা ক্রমেই যখন বেড়ে গেল তখন লক্ষ্য করলাম যে, সুপ্রকাশ মুখার্জি নামক একজন সুদর্শন যুবক তাঁর প্রতীক্ষায় থাকত। লোকটিকে একদিন বিনায়ক চৌধুরীর দপ্তরে দেখেছিলাম। তাঁর এক পিতৃ-বন্ধুর ছেলে। বিরাট বড়লোক, কলকাতা-বোম্বাইতে ব্যবসা আছে। বোম্বাইতেই বাসা, তবে বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকে। হোটেলে।

কিন্তু কাকে বলি এ-কথা? বলেই বা লাভ কী? আমার পাপ মন আমাকে যে মন্ত্রণা দিল সেই অনুযায়ী আমি নির্লিপ্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। গড়ের মাঠ ছেড়ে এখন ওদের হোটেলেই দেখা হতে লাগল। হোটেল থেকে অনসূয়া চৌধুরীকে যখন বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম তখন পেছনের সীটে বসে তিনি মাঝে মাঝে গুন গুন করে গাইতেন। সেই রূপসী স্বৈরিণীর দেহ থেকে ভেসে আসা মৃদু বিলাতী সেণ্টের সুবাস আমাকে বাসনা-বিহ্বল করে তুলত আর নানা দুরাশার দুঃস্বপ্ন দেখাত।

উৎকট কৌতূহলে লক্ষ্য রাখতাম। কী আশ্চর্য এক মুখোশ পরে অনসূয়া চৌধুরী তাঁর স্বামীর কাছে যেতেন। আর বিনায়ক চৌধুরী? তিনি যেন বাতাসেও গন্ধ পেতেন অনসূয়ার। মাঝে মাঝে তিনি যখন রাতে গাইতেন তখন আমি লুকিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে দেখতাম আর গান শুনতাম। সেই সময় এক-আধদিন অনসূয়া নিঃশব্দে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেন। কিন্তু বিনায়ক ঠিক টের পেতেন। বলতেন, "অনসূয়া এসেছ? বোস। একটি ধানশ্রী গাইছি শোন।" অনসূয়া বসতেন। তখন তাঁকে দেখাত শুচিস্নিগ্ধা, সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি কল্যাণী বধূর মত। বসতেন স্বামীর কাছাকাছি—স্বামীকে যে প্রতারণা করছেন তা যেন পুষিয়ে দেবার জন্য একটু মুগ্ধতার রেশ গলায় তুলে বলতেন, 'আহা, বড় সুন্দর ত—গাও।' বিনায়ক মৃদুকণ্ঠে বলতেন, 'তোমার জন্যেই ত গাই অনু—তুমি কাছে থাক বা দূরে থাক আমার সব গানই তোমার জন্যে।' আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসি পেয়েছে আমার একথা শুনে, করুণা হয়েছে ঐ অন্ধের ওপর। ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে সরে গেছি। বিফল বাসনায় উন্মাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছি, আবার উঁকি মেরে দেখেছি অনসূয়া চৌধুরীকে। ক্রমে আমার হৃদয়ে শয়তান অনসূয়া চৌধুরীর রাজত্ব গড়ে তুলল।

অনসূয়া আমাকে বহুবার পরীক্ষা করেছিলেন যে আমি তাঁর বিশ্বাসভাজন কিনা। আমাকে ইঙ্গিতে বলেও ছিলেন যে আমি তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে এতটুকুও কাউকে বললে আমার চাকরি যাবে। আমিও ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম যে, আমি বিশ্বাসভাজন। একদিন এক কাণ্ড হল। বিনায়ক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে অনসূয়া একদিন বিকেলের পর গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গেলেন।

বিনায়ক প্রশ্ন করলেন, "অনসূয়া, সূর্য কোথায়?"

অনসূয়া বললেন, "অস্তে যাচ্ছে।"

"কেমন দেখাচ্ছে সূর্যকে—বল না একটু।"

"লাল।"

অন্ধের সেই আকুতি আমি বুঝেছিলাম। তাই অনসূয়ার সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার ভাল লাগল না। আমি পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বলে ফেললাম, "গঙ্গার পশ্চিম দিকে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, গঙ্গার জল দুলছে—তার ওপারে লাল টকটকে সূর্যদেবকে মনে হচ্ছে যেন একটি মধুক্ষরা রক্তপদ্ম—"

অনসূয়া ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। বিস্ময়? হয়ত একটু, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল বিরক্তি। একটা কানা ড্রাইভারের এ কী প্রগল্‌ভতা!

বিনায়ক চৌধুরী কিন্তু ভারি খুশী হলেন, বললেন, "তুমি বেশ বললে ত? মনে হল যেন একটি ছবি দেখলাম। কতদূর পড়েছ তুমি?"

একদিন লজ্জায় শিক্ষার কথা গোপন করেছিলাম। আজ যেন অতিদূরের আকাশবিহারী এক নক্ষত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হল।

বললাম, বি-এতে ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করেছি।"

"অ্যাঁ! বল কী? কী কী সাবজেক্ট ছিল?"

"সংস্কৃত আর দর্শন।"

"তাই—তাই এমন সুন্দর উপমা দিলে। কিন্তু—কিন্তু তুমি ড্রাইভারের কাজ করছ কেন?"

অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "আমার একটা চোখ নেই।"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনায়ক চৌধুরী, তারপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছি। কাল থেকে তুমি আমার সেক্রেটারির কাজ করবে।"

অনসূয়া চমকে বললেন, "কিন্তু একজন ত আছেনই।"

বিনায়ক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "তাকে কলিয়ারিতে ভালো কোন কাজে পাঠাব।"

অনসূয়া বললেন, "বেশ, কিন্তু নতুন ভাল ড্রাইভার না আসা পর্যন্ত আরও কটা দিন আমার গাড়িটা ওই চালাক।"

"বেশ।"

অনসূয়ার বলার কারণ স্পষ্ট। সুতরাং তাই হল। পরদিন থেকে সেক্রেটারির কাজ শুরু করলাম। সেক্রেটারি মানে সঙ্গী। বিনায়ককে বই পড়ে শোনাতাম, সব-কিছু নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে বোঝাতাম। ঠিক তোমাদের মহাভারতের সঞ্জয়ের মত।

তিনিও নাকি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন, পরে মন্ত্রী হন। অবশেষে দূত। দিব্য-দৃষ্টি পাওয়াতে তিনি অ-দৃষ্ট বস্তুও দেখতে পেতেন। আমার জীবনে অবিকল তেমনি ঘটনা না ঘটলেও অনুরূপ অনেক কিছুই ঘটল। এই কাজের সঙ্গে অনসূয়া চৌধুরীকে গড়ের মাঠে বা হোটেলে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও আমার চলতে লাগল। প্রায় বছরখানেকের মত কাটল। বিনায়ক আমাকে ভালবেসে ফেললেন। পিতৃসম শ্যামাদাসও স্নেহ করতে লাগলেন। আমার জ্ঞান ও চরিত্র-মাধুর্য তাঁদের মুগ্ধ করল। এমনি সময় একদিন রাতে গানবাজনার পর অনসূয়ার সঙ্গে বিনায়ক চৌধুরীর কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল।

গান বন্ধ করে বিনায়ক হঠাৎ আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কী হয়েছে অনু?"

"কই? কিছু না ত।"

"কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে অনু। বল, কী হয়েছে?"

অনসূয়া ধীরকণ্ঠে বললেন, "কিছু না।"

হঠাৎ বিনায়ক উঠে দাঁড়ালেন, হাতড়াতে হাতড়াতে অনসূয়ার কাঁধ খুঁজে দু হাতে তাঁকে চেপে ধরে বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"হাত সরাও—আমার লাগছে"—দু হাতে সবলে নিজেকে মুক্ত করে বসন্তের দাগে হতশ্রী ও অন্ধ বিনায়কের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন অনসূয়া, বললেন, "রোজ রোজ এক প্রশ্ন। বলেছি ত, কদিন ধরে শরীরটা ভাল নয়—তবে ভাববারও কিছু নেই।"

"অনু। তুমি মিছে কথা বলছ।"

"কী বলতে চাও তুমি?"

দৃঢ়কণ্ঠে বিনায়ক বললেন, "কাল থেকে তুমি আর বাইরে বেরোতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমার হুকুম।"

"কিন্তু কেন এই হুকুম?"

"তোমাকে জিরোতে হবে—ভাল হতে হবে।"

অনসূয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন, বললেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

ঘর ছেড়ে অনসূয়া বেরিয়ে যেতেই বিনায়ক কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে তারপর তিনি তানপুরাটি টেনে মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন:

"তেরো নাম চহুঁচক ভরপুর রহো,
তুঁহি দূরত ফিরত,
তুঁহি সবন মে করত কলোল।
তুঁহি তান, তুঁহি মান, তুঁহি
রোম-রোম রম রহো,
তুঁহি মুন, তুঁহি বোলে বোল।"

আমি এর আগেও এ গান শুনেছি। ধ্রুপদাঙ্গ গান। জোনপুরী রাগ, চৌতাল। প্রতিপাদ্য ঈশ্বর। কিন্তু এ কোন্ ঈশ্বরের গান গাইতে গাইতে আজ বিনায়ক চৌধুরীর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল! অন্ধের আত্মা কি এতদিনে টের পেয়েছে যে অনসূয়া চৌধুরী বদলে গেছে?

কদিন কাটল। অনসূয়া চৌধুরী আর বেরোয় না। তবে কি সুস্থতা ফিরে এল তাঁর। না। পাঁচ-ছ দিন বাদেই এক সকালে অনসূয়া আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠালেন। আমাকে একটা কাগজে-মোড়া বইয়ের প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এই প্যাকেটটা আমাদের বন্ধু সেই সুপ্রকাশবাবুকে দিয়ে এস সঞ্জয়—বড় দরকারী।"

'আজ্ঞে' বলেই পা বাড়াচ্ছিলাম। অনসূয়া ডেকে বললেন, "শোন, কেউ যেন এ কথা না জানে।"

হেসে বললাম, "আজ্ঞে না।"

রাস্তায় থেমে প্যাকেটটা খুলে দুটো বই পেলাম। একটা বইয়ের ভেতর একটি খাম।

প্যাকেট নিয়ে দিলাম সুপ্রকাশবাবুকে। তিনি আমাকে আদর করে বসিয়ে আবার একটা প্যাকেট দিলেন এবং একশো টাকার একটা নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বলা বাহুল্য ফেরার পথে সেই প্যাকেট খুলে বইয়ের ভেতর তাঁর চিঠি পেলাম। অনসূয়ার গৃহত্যাগের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পরদিন অন্ধকার থাকতেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটরে করে অনসূয়াকে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। অনসূয়া যেন ভোর চারটের তাঁর হোটেলে পৌঁছন। তাঁর গাড়ি থাকলে শ্যামাদাসবাবুরা সন্দেহ করবেন।

চিঠিটা পড়ে বাজারে গিয়ে ভাল চিঠির কাগজ কিনে অবিকল সুপ্রকাশবাবুর হাতের লেখা নকল করে আসলটা আমি বুকপকেটে রাখলাম। তারপর নকলটি-সমেত প্যাকেটটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। উন্মাদ আগ্রহের সঙ্গে অনসূয়া প্যাকেটটি নিলেন। খানিকবাদে আবার তিনি ডাকলেন আমাকে, স্থিরদৃষ্টি মেলে বললেন, "তোমায় বিশ্বাস করতে পারি সঞ্জয়?"

বললাম, "এতদিন করেননি?"

অনসূয়া মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, তবু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, কাউকে বলবে না সুপ্রকাশবাবুর কথা?"

বললাম তা। তখন অনসূয়া প্রস্তাব জানালেন যে, তাঁর গাড়িটাকে মেরামত করার নাম করে জনক সেন লেনের মুখে সন্ধ্যের সময় দাঁড় করিয়ে রাখব আমি। তারপর রাতের বেলা ওই গাড়িতেই গিয়ে শুয়ে থাকব। ভোর রাতে তিনি এলে তাঁকে এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। তারপর ভোরবেলায় সত্যি কোন গ্যারেজে গাড়ি দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।
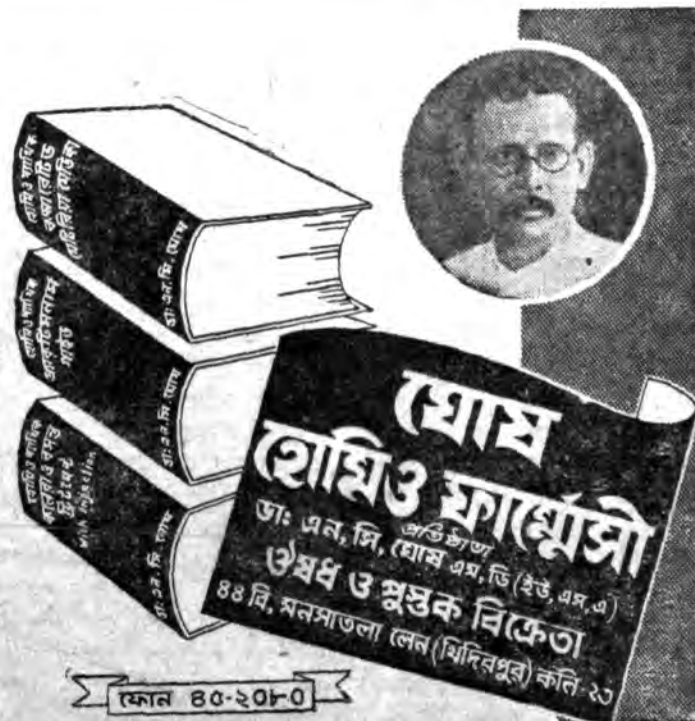
বিনায়ক চৌধুরীর সেদিনকার চোখের জলের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, "এটা কি উচিত হবে?"

"কী উচিত?"

"মাপ করবেন—আপনার এভাবে যাওয়া?"

অনসূয়া আমার দিকে তাকালেন। তাঁর

চোখে কি আগুন জ্বলল? না কি বেদনা? তিনি বললেন, "তোমার এ অনধিকার চর্চা সঞ্জয়। তবু আজ বাধ্য হয়েই বলছি। তুমি শিক্ষিত লোক—কিন্তু তোমার একটা চোখ নেই বলেই কি তুমি আজ ওই অন্ধের কথা বড় করে ভাবলে? আমার কথাও কি ভেবেছ একদিন? আমি বড় ক্লান্ত। আমি এ অন্ধের জগতে আর থাকতে পারছি না। আমি চাই সুস্থের ভালবাসা—আমি চাই যে আমায় ভালবাসবে সে আমায় দু চোখভরে দেখুক আর স্তব করুক।"

প্রচণ্ড এক জ্বালায় জ্বলে উঠলাম, তবু বললাম, "বুঝেছি। আপনি যা বললেন তাই হবে।"

"শোন, তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তা হলেও আমার মতি বদলাবে না। আজ না পারি কাল—একদিন-না-একদিন আমি যাবই।"

"বুঝেছি। কাউকে জানাব না আমি—প্রতিজ্ঞা ত করেইছি।"

আমি চলে গেলাম।

নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম। সত্যি কি ঠাকুর-দেবতা মানি আমি?

বিনায়ক চৌধুরীকে জানাব না?

শেষে আমি সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করলাম।

না, বিনায়ক চৌধুরীর জীবনে অনসূয়া এক অভিশাপ। সে অভিশাপ দূরেই যাক। তা ছাড়া এক ঢিলে দুই পাখি মারব আমি।

দিন গেল। রাত এল। যেমন ঠিক হয়েছিল তেমনি করলাম। মাঝ রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাঁচিল টপকে বাইরে গেলাম। তারপর জনক সেন লেনের মোড়ে। গাড়িতে বসে সিগারেটের পর সিগারেট জ্বালালাম। অনেকক্ষণ জেগে থেকে যখন সবে একটু তন্দ্রা এসেছে তখন অনসূয়া এসে আমায় জাগালেন।

চাদর মুড়ি দিয়ে অতি সাধারণ একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছেন তিনি।

তিনি পেছনে বসতেই বললাম, "কেউ টের পায়নি ত?"

"না। হোটেলে চল সঞ্জয়।"

গাড়ি চালালাম। সবেগে। শেষ রাতের ফাঁকা রাস্তা একেবারে জনশূন্য। হোটেলের দিকে নয়। নির্জনতর অংশের দিকে।

"এ কোথায় যাচ্ছ?" অনসূয়া রুক্ষ প্রশ্ন করলেন।

"একটু নির্জনে।"

"কেন?"

"আপনাকে ঠিকই পেঁছে দেব, চিন্তা করবেন না। তবে একটু বোঝাপড়া আছে আপনার সঙ্গে।"

"বোঝাপড়া মানে?" অনসূয়ার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও বিশ্রী হয়ে উঠল।

গাড়ির বেগ আরও বাড়িয়ে বললাম, "সুপ্রকাশবাবুর আসল চিঠিটা আপনাকে আমি দিইনি—সেটা আমি কর্তাকে দিতে পারতাম বা পারি।"

সামনের ছোট্ট মিররে অনসূয়ার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, "তার মানে—কী চাও তুমি?"

স্পষ্ট করে বললাম।

"গাড়ি থামাও।"

"গাড়ির স্পীড এখন সত্তর মাইল—থামবে না।"

"আমি চেঁচাব।"

"ঠিক আছে। তাহলে বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই আপনাকে—আপনার অন্ধ স্বামীর কাছে—"

অনসূয়ার গলা কাঁপছে তখন, বল্লেন, "টাকার জন্য এমন করছ সঞ্জয়—তোমায় আমি হাজার টাকা দেব।"

বললাম, "না। এ জীবনে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারব, কিন্তু আপনাকে পাব না।"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ক্ষীণ গলায় অনসূয়া বললেন, "কোথায় সে চিঠি?"

দেখালাম দূর থেকে।

"আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও।"

"শর্তটা তা হলে মঞ্জুর করলেন?"

দাঁতে দাঁতে পিষে অনসূয়া বললেন, "শয়তান, আমাকে তাড়াতাড়ি পেঁছে দাও।"

অপমানে, রাগে, দুঃখে অনসূয়া কাঁদলেন, হিংস্র হয়ে উঠলেন কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

ওরা পালাল। আমি সব পর্ব সেরে বাড়ি ফিরলাম। তখনও কেউ টের পায়নি। কিন্তু একটু বাদেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল, কোথায় অনসূয়া? শ্যামাদাসবাবু আমাকে আড়ালে নিয়ে বললেন যে, অনসূয়া নিশ্চয়ই সুপ্রকাশের সঙ্গে পালিয়েছেন। তাঁর সন্দেহকে সত্য করল অনসূয়ার চিঠি। বিনায়কের নামে লেখা। কিন্তু বিনায়ককে তিনি সে কথা জানালেন না। বললেন যে, অনসূয়া বাপের বাড়ি গেছেন। অনসূয়ার দাদা রথীনবাবুর কাছে গেলেন তিনি। কী সব পরামর্শ হল তাঁদের। তারপর তাঁরা এসে বিনায়ককে বললেন যে, অনসূয়া তাঁর কাছেই এবং সেদিনই সকালে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। বিনায়ক তাকে অহেতুক ভাবে বাড়ি থেকে বেরতে নিষেধ করাতেই তিনি এমন করেছেন। দু-চারদিনেই ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে, বিনায়ক যেন এ নিয়ে ছেলেমানুষী বা জেদ না করেন। বিনায়ক স্থির হয়ে শুনলেন সে কথা। শান্ত হলেন, সম্মতি জানালেন। বললেন, 'রথীদা, অনসূয়াকে বলবেন আমায় ক্ষমা করতে।' রথীনবাবু চলে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্যামাদাস বোম্বাইতে সুপ্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। খবর পেলেন যে সে বোম্বাই ফিরবে না, মোটরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবে। পুরনো চাকরদের রাতারাতি তিনি কলিয়ারীতে চালান করে নতুন চাকরদের বহাল করলেন। তারপর রথীনবাবুকে গিয়ে বললেন, 'আর দেরি করা উচিত নয়। হয় সত্যি কথা বলতে হয়। নয় বলতে হয় যে অনসূয়া মারা গেছেন।' রথীন অনেক ভেবে বললেন, 'চলুন তাই বলব—অনসূয়ার এবার মরাই ভাল।' তাঁরা বিনায়কের কাছে গিয়ে জানালেন যে, দার্জিলিংয়ের পথে একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন অনসূয়া। অন্ধের কাছে মিথ্যাকে সত্য করে তোলার যত উপায় ছিল সব প্রয়োগ করা হল। বিনায়ক চৌধুরী বিশ্বাস করলেন।

এর পর বিস্তৃতভাবে বলতে পারব না কিন্তু। বলা যায় না। বিনায়ক চৌধুরী কাঁদেননি অনসূয়ার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেলেন। বাজে-পোড়া গাছ দেখেছ? তেমনি। শ্যামাদাস বাপের মত আগলে রাখতেন। আমিও। কিন্তু আমার অবস্থাও যে তখন বর্ণনাতীত। আমি গ্লানি বোধ করেছিলাম? না। বিনায়ককে দেখে অপরাধ বোধ করছিলাম। এই অন্ধ, সৎ, সুকুমার ও শিল্পী লোকটির জীবনের এক বিয়োগান্ত অধ্যায়-রচনাতে আমি যে হীন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম, সে-কথা স্মরণ করে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। বিনায়ককে বললাম সে কথা। 'আমায় ছুটি দিন।'

বিনায়ক আমার দু হাত চেপে ধরলেন, "আমাকে ছেড়ে যাবে সঞ্জয়? না না, তুমি যেও না। আমার মত অন্ধকে কে সাহায্য করবে? তুমি থাক সঞ্জয়, আমার ছোট ভাই হও—আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

থাকলাম। আমার মাইনে অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু মরমে মরে গেলাম। শিক্ষিত যে মনটাকে জানোয়ার করে তুলেছিলাম, সে আবার নিজের সত্তা ফিরে পেল। ভাবলাম, যার এমন ক্ষতি করেছি তাঁর কাছে থাকব কী করে? কোন উদ্দেশ্যে? তাও ঠিক করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি তাঁকে রক্ষা করব। তাঁর কুলত্যাগিনী স্ত্রীর রূপমুগ্ধ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য আমি—তবু যেন আমি বিনায়কের দুঃখ বুঝলাম। আমি স্থির করলাম যে অনসূয়াকে আমি ভুলে যাব এবং বিনায়ককেও ভুলতে বাধ্য করব।

দিন কাটতে লাগল। আমি বিনায়কের

ছায়া হয়ে উঠলাম। তিনি স্ত্রীর বিষয়ে গল্প করেন না, বেশী কথা বলেন না। আমি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। তখন একদিন তাকে বিয়ে করতে বললাম। তিনি চমকে উঠে বললেন, 'অসম্ভব। অন্ধ হলেও চরিত্রবলে আমি ছোট নই সঞ্জয়।' তিনিই উলটে আমাকে বিয়ে করতে বললেন। আমিও চমকে উঠলাম। অসম্ভব। অন্য কোনও নারী আর আমার সহ্য হবে না। কোন নারীর ভালবাসা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

কিন্তু দিন কাটবে কী করে? বিনায়ক আর গানও করেন না। অনসূয়ার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রেতের মত তিনি শীর্ণ হয়ে উঠছেন। প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলাম তাঁকে। 'বেশ ত, বিয়ে না করলেন, কিন্তু আর কিছু?' ঘৃণায় বিনায়কের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'ছিঃ সঞ্জয়।' তাহলে? এবার কী করি? কী করে বিনায়ককে বাঁচাই? কি করে নিজে বাঁচি? বিনায়ককে একদিন প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, জীবন কী? মানুষের লক্ষ্য কী?' বিনায়ক হাসলেন, 'প্রশ্নটা বেশ ত। এস জানা যাক।'

আবার কাজ পেলাম। বিনায়কবাবু আর আমার কাজ। ফর্দ করে বই আনতে শুরু করলাম। কিনে, লাইব্রেরি থেকে। দর্শন, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বাইবেল। আমি পড়ি আর বোঝাই। আমি বক্তা, তিনি শ্রোতা। আমি অধ্যাপক, তিনি ছাত্র। আমি গুরু, তিনি শিষ্য। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। বলতে বলতে আমি বদলে যেতে লাগলাম, বিনায়ককেও বদলাতে লাগলাম। এক চক্ষু হীন হয়েও আমি বিনায়কের দু চোখ হয়ে উঠলাম। আকাশ বাতাস ফুল-ফলের বর্ণনা করে বোঝাতে লাগলাম তাকে, ছবি এ'কে এ'কে তুলে ধরতে লাগলাম তাঁর কাছে। আমার পাপ স্খালনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ধীরে ধীরে বাড়ির এঘরে ওঘরে অনসূয়া চৌধুরীর যত ছবি ছিল তার ওপর অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ধুলো জমল। তানপুরার ধুলো গেল। আমিও তবলা শিখলাম, পাখোয়াজ শিখলাম। জীবনের অর্থ খুঁজে পেলাম আমরা, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেলাম।

বিনায়ক আবার গান শুরু করলেন। আরও মিষ্টি হয়ে উঠল তাঁর গলা। পাড়ার লোকেরা এসে উঁকি মারতে শুরু করল। মধুমুগ্ধ ভ্রমরের মত। দিন মাস বছর কাটল। বছরের পর বছর। এরই মধ্যে শ্যামাদাস মারা গেলেন। অন্ধের রাজ্যে এক-চক্ষুহীন আমি রাজ-সদৃশ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল। সাধুর মত আকৃতি হয়ে উঠল আমাদের। বিনায়ককে

"কাউকে জানাবো না আমি, প্রতিজ্ঞা ত করেইছি"

দেখাত যোগীর মত। বীতশোক, ব্রহ্মো-পলব্ধিতে আনন্দিত তনু। ভবভূতির সীতাবিহীন রামের মত। এতদিন আমি গুরু ছিলাম, এবার তিনি গুরু হলেন। তিনি তাঁর দিব্য অনুভূতির কথা রোজ শোনাতে লাগলেন। মনে হল যে, আর-কাউকে ঘৃণা করব না, হিংসা করব না। অনুভব করলাম যে আমিই ব্রহ্ম—আমার অন্তরে ব্রহ্ম, বাইরে ব্রহ্ম। আমি অমৃত-সাগরে নিমজ্জমান এক অমৃত-কুম্ভ। সত্যকে অনুভব করলাম। বুঝলাম যে, মানুষের ঘৃণা প্রেম হিংসা ভালবাসা সুখ আর দুঃখ—এসবই গুণের বিকার, এ সব কিছুই। জানলাম যে সত্যই ভগবান।

বছর কয়েক বাদে বিনায়ক বললেন, "এবার তীর্থে চল।"

বললাম, "কোথায়?"

"হিমালয়ে—মানস-কৈলাস তীর্থে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে ভগবানের মুখোমুখি হতে।"

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, "চলুন।"

বেরোলাম। আমি, বিনায়ক, তিন-জন চাকর, একজন সরকার। কুলি আট-দশজন। তাঁবু, রসদ, ওষুধ, মালপত্র আর দুটি বন্দুক। তখন যাত্রী-দের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আলমোড়া থেকে ডাণ্ডিতে চড়িয়ে নিলাম বিনায়ককে। পেছনে মালবাহী ঘোড়ার দল ও কুলিরা। ধলচিনারের পর উতরাইয়ের পথ ধরে একটু নামতেই দূরে অভ্রভেদী হিমালয়কে দেখতে পেলাম। আমি বিনায়ককে চলতে চলতে সব কিছুর বর্ণনা দিতে লাগলাম। হিমালয়ের চূড়োয় চূড়োয় তুষার রাশির ওপর সূর্যের আলো

পড়েছে। কী অদ্ভুত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃশ্য! একটার পর একটা শৃঙ্গ। যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ। বিনায়ক উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'আরও বল।' বলি। কোথায় কেমন ঝরনা, কোথায় কেমন গাছ। পাতার আকার আর রঙ। পাখিদের নাম ও চেহারা। দিন কাটতে লাগল। চড়াই আর উতরাই পার হয়ে। দেবদারু-বনের শন্ শন্ শব্দের ভেতর দিয়ে, পলায়মান কস্তুরী-মৃগের দেহ-গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আকুল করে। ডাণ্ডিরহাট, অ্যাস্কট পার হয়ে, গৌরীশৃঙ্গ, কালীগঙ্গা অতিক্রম করে, নানা মরশুমী ফুলের মাধুরী পান করে, ভেড়ার পালের শব্দের সঙ্গে বায়ুবেগে দোলায়িত বাঁশির শব্দ শুনতে শুনতে, কালিদাসের যক্ষবর্ণিত মেঘের মত আমরা তাঁর কত বর্ণনা সত্য হতে দেখলাম। রাস্তায় কতবার মেঘ এল, আমাদের গাঢ় আলিঙ্গন করে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। দূরের মেঘেরা যেন আমাদের দেখে ডাকতে লাগল আর তাদের সেই ডাক পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে শত-সহস্র মৃদঙ্গের ধ্বনির মত শোনাতে লাগল।

দিনের পর দিন। পাহাড়ে চড়া আর নামা। এখানে ওখানে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম। রাতে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেওয়া। এইভাবে আমরা গার্বিয়াং পেঁৗছলাম। ডাণ্ডি ছেড়ে ঝব্বুর পিঠে চড়লাম আমরা। সঙ্গে ঘোড়াও আছে। পাহাড়ের চেহারা তারপর থেকে বদলে যেতে লাগল। রুক্ষ, উদাসীন। জীবজন্তুর সংখ্যা কমে যেতে লাগল। মনে হল যেন ভূতনাথের যোগাবাসের ভেতর ঢুকেছি। চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। সূর্যা-লোকে তুষার-শৃঙ্গগুলো জ্বলছে। মহা-দেবের রজত শুভ্র অট্টহাসির মত। সেই হাসির শব্দ যেন শন শন হাওয়ায় ধ্রুপদ গান হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ঝব্বুদের গলায় বাঁধা ঘণ্টাগুলো যেন সেই গানের সঙ্গে মঞ্জীরা বাজাতে লাগল।

কালাপানি পার হয়ে সঙচিত্তে থামলাম। শেষ রাতে সতেরো হাজার ফুট উঁচু লিপুলেক পাসের বিস্তৃত তুষার রাশি পার হতে শুরু করলাম। অসহ্য শীত, তৃষ্ণা। তবু থামি না। আমরা মানস-কৈলাসের যাত্রী। ভগবানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দৃঢ় পণে নির্ভর আমাদের হৃদয়। তুষার পার হয়ে ধূম্রায়িত ছায়া দেখলাম দূরে। রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠল, বাতাসের বেগ বাড়ল। অবশেষে আমরা তাকলাকোটে পেঁৗছলাম। তারও দুদিন পরে গুরলা মান্ধাতা পর্বতশৃঙ্গকে ডান দিকে রেখে এগোতেই বাঁ দিকে রাবণ-হ্রদের নীল জল দেখতে পেলাম। তারপর আরও তিন মাইল। আরও তিন-চারটি চড়াই অতিক্রম করলাম। আর তার পরই এক মাস বাদে বেলা চারটের সময় মানসের অনন্ত-বিস্তৃত নীল জলরাশি দেখতে পেলাম।

চিৎকার করে উঠলাম, "পেঁৗছেছি।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব—"

ঘোড়া নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলাম। হু-হু হাওয়ায় মানসের নীল জলে তখন ঢেউ উঠেছে। দূরে তুষার-শোভিত পর্বত-শৃঙ্গের বলয়রেখা। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ধন্য হলাম। এই সেই ব্রহ্মার মানস-সৃষ্টি। এরই তীরে বসে কতদিন না জানি বালখিল্যের দল সন্ধ্যা-বন্দনা করেছেন। এরই জলে স্নান করতেন সপ্তর্ষিরা, সিদ্ধ-বধূরা ধুয়ে নিয়ে যেতেন তাঁদের কল্প-লতার বল্কল। দেবতা ও মুনি ঋষিদের স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে যেন এ গড়া। এত স্বচ্ছ যে, জলের তলার প্রত্যেকটি নুড়ি যেন গোনা যায়।

বিনায়ক এলেন, বললেন, "বল, কী দেখছ?"

বললাম, "নীল জল। দিগন্ত বিস্তৃত। এখানেই এক হংস দম্পতি পরস্পরে সুখে প্রেমে নিরন্তর বিহার করত।"

"আরও বল।"

"পবিত্র এই মানস। অপরূপ। পরি-শ্রান্তের শ্রান্তিহর। নাস্তিকের বিশ্বাস। এশিয়ার নাভিস্থল। ঝড়ের লীলাক্ষেত্র। দেবতাদের চোখের মণি। অরূপ রূপের সরো-বর। এত সুন্দর যে, এর মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব।"

আমাদের তাঁবু পড়ল। আমরা সেই পবিত্র জলে সাহস করে স্নান করলাম। এক ডুব দিয়েই শরীর হিম হয়ে এল। তাঁবুর ভেতরে গিয়ে বসলাম দুজনে। বিনায়ক জপে বসলেন।

হঠাৎ দেখলাম যে, কৈলাসের দিক থেকে কুড়ি-পঁচিশজনের একটি যাত্রী দল আসছে। কৌতূহল হল। বাইরে গেলাম। জানলাম যে, ও'রা আজ রাতে এখানে থেকে আবার ভোরে চলে যাবেন তাকলাকোটের দিকে। তাঁদের তাঁবু পড়তে শুরু করল। কল-কোলাহলে মানসের তীর সরগরম হয়ে উঠল। আমি দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রী ঝন ঝন করে উঠল। মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনসূয়া চৌধুরী। বিধবার বেশ। মলিন বর্ণ। তাঁর সেই অপূর্ব যৌবনকান্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। তুষার-পীড়িত কমলের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। যেন কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ। কিন্তু মনে হল যে, তবু চাঁদ। ষোল কলা না হলেও চাঁদ। এ কী অঘটন!

মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমায় দেখতে পেলেন। একবার তাকিয়েই দ্রুত পদে নিজের তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেলেন।

না, আমার ভুল হয়নি। হিমালয়ের দুর্গম পথ বেয়ে যে দুঃসাহসে ভর করে এসেছি তাও যেন যথেষ্ট নয়। তবু দুরুদুরু বুকে সেই তাঁবুর ভেতর ঢুকলাম।

ডাকলাম, "শুনুন—"

তিনি পেছন ফিরে বসে ছিলেন, বিদ্যু-ৎবেগে ঘুরে তাকালেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি কে?"

"আমি সঞ্জয়।"

"কে সঞ্জয়—আমি আপনাকে চিনি না।"

"আমি আপনার স্বামী বিনায়ক চৌধুরীর সেক্রেটারি—"

"বেরিয়ে যান, আমি কাউকে চিনি না।"

"বিনায়কও আছেন আমার সঙ্গে।"

তিনি গর্জে উঠলেন, "বেরিয়ে যান বলছি—"

তাঁর দু চোখ জ্বলতে লাগল।

একপা পিছিয়ে বললাম, "আপনার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত—"

"ভূপ সিং!" বলে অনসূয়া হাঁক দিলেন।

দৈত্যাকৃতি একজন মাঝারি বয়সের লোক বন্দুক হাতে এগিয়ে এল।

"যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে গেলাম।

ভূপ সিং বলল, "হুকুম মাজী?"

অনসূয়ার গলা শুনলাম, "তোমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?"

"হাঁ মাজী।"

অনসূয়া আমাকে শাস্তি দিলেন না।

তাঁবুতে ফিরে গেলাম।

বিনায়ক বললেন, "কে? সঞ্জয়! বোস। তোমাকে ধন্যবাদ ভাই। তুমি না থাকলে আমার মত এক অন্ধের ভাগ্যে কি এই সৌভাগ্য হত। টাকা থাকলেই কি সব পাওয়া যায়?"

আমার ঈশ্বরানুভূতি তখন লোপ পেয়েছে। এই দশ বছরের শাস্ত্রচর্চা, দর্শনালোচনা আর যোগাভ্যাস সব বুজরুকী বলে মনে হতে লাগল। বহু দিন আগে-কার শেষ রাতের সেই পাপের কথা স্মরণ করে আমার বুকের ভেতর বিবেক আর বাসনার মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমার সামনেকার ওই সাধু বিনায়কের দিকে তাকাতেও কেমন যেন ভয় হতে লাগল। ওর চোখ দুটো জ্বলছে কেন? আমার অন্তর পর্যন্ত দেখে উনি কি আমায় ব্যঙ্গ করছেন। কী করি? বলব? না না, এর জীবনকে ত প্রকারান্তরে আমিই নষ্ট করে-ছিলাম। বহু আয়াসে তাঁর জীবনের গতিকে ধর্মপথে চালিত করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে আবার মেরে ফেলব? না না। অনসূয়া ত দার্জিলিংয়ের পথে অ্যাক্-সিডেণ্টে মারা গেছেন।

"কী হল সঞ্জয়?"

বললাম, "জপ করছি।"

"তাই বল। মাপ কর ভাই, আর বিরক্ত করব না।"

রাত এল। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠল। তুষার শৃঙ্গে প্রতিফলিত সেই চাঁদের আলো যেন উজ্জ্বলতর হয়ে মানসের নীল জলে প্রতিবিম্বিত হল। ক্রমে রাত বাড়ল। বিনায়ক তানপুরা ধরে ডাকলেন, "সঞ্জয়, পাখোয়াজ বাজাও।"

ইমন কল্যাণ ধরলেন বিনায়ক।

"তুঁহি পরম তীর্থ তুঁহি পরম অর্থ
তুঁহি এক অব্যর্থ যোগিজন গাবে।"

আমি আমার উৎকট চিন্তা থেকে বাঁচলাম। সাধকের মত তন্ময় হয়ে উঠলেন বিনায়ক। আমিও চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বাজাতে লাগলাম। ক্রমে সব ভুললাম। ক্রমে চৈতন্যের মধ্যে একটা ধ্বনি আলোকবৃত্তের মত ঘুরতে লাগল। ক্রমেই যেন মনে হতে লাগল, আমি আমার নীরবতার নাগপাশ ছাড়িয়ে আবার ওপরে উঠছি। আমি সেই পরমতীর্থের মুখোমুখী দাঁড়াচ্ছি।

"কে ?"

হঠাৎ গান বন্ধ করলেন বিনায়ক। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "কে ?"

চমকে বাজনা থামিয়ে তাঁবুর দরজার দিকে তাকালাম। দেখলাম অনসূয়া চৌধুরী দাঁড়িয়ে। মুহূর্তকাল। তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছুটে বাইরে গেলাম। মুহূর্তের জন্য তাঁকে দূরে দেখলাম। গন্ধর্ব-কন্যার এক ছায়ার মত। এগোতে গিয়েও আর সাহস হল না।

তাঁবুতে ফিরলাম।

অধীর আগ্রহে বিনায়ক বললেন, "কে সঞ্জয় ?"

"একজন যাত্রী—গান শুনছিল আপনার।"

"পুরুষ না স্ত্রীলোক ?"

"পুরুষ। এবার ঘুমন আপনি।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব।"

বিনায়ক শুয়ে পড়লেন। হয়ত ঘুমলেন। কিন্তু আমার ঘুম এল না অনেকক্ষণ। অনসূয়া এসে কার দিকে তাকিয়েছিলেন ? বিনায়কের দিকে ? না, আমার দিকে ? বুঝলাম না। শুধু স্থির করলাম যে, ভোরবেলা আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাব। প্রেতের মত, রাহুর মত আমি অনসূয়ার অনুসরণ করব। তাঁর ঘৃণার কি শেষ হবে না একদিন!

কিন্তু হায়, যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনলাম যে, রাতের তৃতীয় যামে সেই ঘোর শীতের মধ্যেই অনসূয়ার দল তাকলাকোটের দিকে চলে গেছেন। দলের প্রায় অর্ধেক ছিল তাতে। দলচ্যুত বাকী লোকেরা রাগারাগি করে বলাবলি করছিলো যে, ওই 'মেসেস মুখার্জি' বড় জেদী মেয়েছেলে। শুনলাম যে, তিনি বোম্বাই থেকে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর অনুগ্রহ-পুষ্ট দল। বুঝলাম যে, সুপ্রকাশ মারা গেছেন।

বিনায়কের দিকে তাকালাম। যাব ওঁকে ছেড়ে ? আমি একচক্ষুহীন পুরুষ, আমার জিদ অনসূয়ার চেয়ে অনেক বেশী তা আমি প্রমাণ করেছি। যাব ? কিন্তু বিনায়কের সেই সাধুর মত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা ভেঙে গেল। না, না, বিনায়ককে নিয়ে চলা মানেই অনসূয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমার এই যুদ্ধই আমার অনুরাগের চিহ্ন। না, না,

আমি ঈশ্বরকে পাব না জানি, কিন্তু বিনায়ককে পেতে হবে।

বেলা বাড়ল। হাওয়া বাড়ল। মানসের নীল জল আমার মনের মতই অস্থির হয়ে উঠল। আমরা আবার যাত্রা করলাম কৈলাসের দিকে। কিন্তু মানসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছতেই বিকেল হল। আমরা তখন মানস আর রাবণ-হ্রদের মধ্যবর্তী খালটার ধারে তাঁবু ফেললাম।

আবার দিন গেল। সন্ধ্যা হল। চাঁদ উঠল। কৈলাসের স্বপ্নে বিভোর বিনায়ক শাস্ত্রালোচনা শুরু করলেন। কিন্তু আমার মনে তখন অজস্র কীট কুড়ে খাচ্ছে। আমার খালি ভুল হতে লাগল।

বিনায়ক হেসে বললেন, "কাল তাঁর দর্শন হবে সঞ্জয়?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বিনায়ক তানপুরোয় ঝংকার তুলে গাইতে শুরু করলেন। পূরবী থেকে শ্রী-রাগে, শ্রী-রাগ থেকে দরবারীতে গেলেন তিনি। বাজাতে আজ ভাল লাগছিল না আমার, তবু বাজিয়ে চললাম। ক্রমে আঙুলগুলো অবশ হয়ে এল।

হঠাৎ গান বন্ধ করে বিনায়ক বললেন, "কে?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কেউ না।"

"আচ্ছা সঞ্জয়, কাল কে এসেছিল?"

বললাম, "একজন লোক।"

বিনায়কের অন্ধ চোখে কি দৃষ্টি ফিরে এল? আমার দিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সত্যি করে বল—স্ত্রীলোক?"

হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভগবানের সামনে যে দাঁড়াতে চায় তাঁকে আমি কেন সত্য কথা বলব না? সত্যই ত ভগবান। দাঁড়াক সে ভগবানের মুখোমুখী।

বললাম, "সত্যি কথা বলব?"

"বল সঞ্জয়।"

"অনসূয়া দেবী এসেছিলেন।"

তানপুরো নামিয়ে রেখে বিনায়ক হাসলেন, "অনসূয়া তা হলে মরেনি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"রথীদা আর শ্যামকাকা তা হলে মিছে কথা বলেছিলেন। বুঝেছি কেন বলেছিলেন। শিব—শিব।" বিনায়ক আবার তানপুরো তুলে নিলেন, বললেন, "সত্যই ভগবান সঞ্জয়—সেই সত্য তুমি গোপন করেছিলে?"

জবাব দিলাম না।

প্রশান্ত হেসে বিনায়ক বললে, "বাজাও ভাই।"

বললাম, "আমার হাত কেটে গেছে।"

"আহা, তা হলে তুমি শোও—আমি আরও গাইব।"

তিনি মধুর কণ্ঠে শুরু করলেন।

"ধন ধন ভাগ, সুহাগ তেরো,
তু পিয় কে মন ভাই—"

বিনায়কের উদ্দেশে মাথা নিচু করলাম। যে ভয়কে আমি বজ্রাগ্নির মত ভয়ংকর ভেবেছিলাম তা এক ফুঁয়ে যেন কোথায় উড়িয়ে দিলেন বিনায়ক। বিনায়ক ভগবানকে পেয়েছেন। আমি হীন, নরাধম, লালসাতুর। তবু বিনায়কই আমার সাধনা। সে সাধনায় আমি সিদ্ধি পেয়েছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বিনায়কের গানের স্রোতে স্রোতে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙল। রাতের বেলা অমন বন্দুক ছাড়ি আমরা। ডাকাত না আসে সেই ভয়ে। কিন্তু চোখ মেলে ঘরের ভেতর আলো দেখলাম, অথচ বিনায়ককে দেখলাম না। ছুটে বাইরে গেলাম। দেখলাম আরও দু-চারজন বেরিয়ে এসেছে। দূরে মানসের নীল জলে আজও চাঁদের আলো। স্থির, অচঞ্চল জল এখন। আর তেমনি স্থির ও অচঞ্চল হয়ে রক্তাক্ত দেহে পাথরের ওপর পড়ে আছেন বিনায়ক। বন্দুকটা ছিটকে দূরে পড়েছে। মারা গেছেন তিনি।

তাঁবুর ভেতর গিয়ে দেখলাম, চিঠি রেখে গেছেন:

"সঞ্জয়, আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম। তুমিও ভুল করছিলে। আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, ভাল না বাসলে ঈশ্বরকে সঠিক জানা যায় না। এতদিন যা জেনেছি তা তোমার পুঁথি থেকে পড়ে। শোনানো কথা দিয়ে। কিন্তু জানা আর অনুভব করা ত এক কথা নয় সঞ্জয়। আমি ভালবাসতে পারিনি। কারণ আমি ভালবাসা পাইনি। তাই প্রেমহীন জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটবে না জেনেই আমি মরলাম। আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে তুচ্ছ করে দিলাম। এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে মরবার আগে আজ আমি রাজহংসের মত গেয়েছি। মানসের জলে হাওয়ার দোলা লেগে যে অনন্তের সুর বাজে তা আমি শুনেছি। তুমি ফিরে যাও সঞ্জয় ইতি—। বিনায়ক চৌধুরী।"

ট্রেনের গতি বেড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সঞ্জয়ের কথা থেমে যেতেই নড়ে বসলাম। এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

প্রশ্ন করলাম, "তারপর?"

সঞ্জয় বলল, "আমি সেদিন সেই মানসের তীরে শেষ রাতে সত্যকে দেখলাম। এই সত্যকে দেখলাম যে, এতদিন এক চোখ দিয়ে আমি শুধু অর্ধেক সত্যই দেখে এসেছি। জীবনকে দেখেছি আমি অর্ধেক আলো আর অর্ধেক অন্ধকারে।"

"তারপর?"

"অনেক ঘুরেছি। প্রায় দু বছর অনসূয়াকে খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। শুনেছি বোম্বাইয়ের সব-কিছু স্থাবর সম্পত্তি দান করে তিনি নাকি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"এখন কোথায় যাচ্ছো?"

"টাটানগরে। আমার নতুন মনিব সেখানে। কফি বাগানের মালিক, কোটিপতি লোক। মাদ্রাজী। মোটা মাইনে দেবে।"

"আবার চাকরি করছো? বেশ বেশ কি করে পেলে?"

সঞ্জয় ম্লান হেসে বলল, "আমার এক-চোখের কথা শুনেই ভদ্রলোক ভয়ানক খুশী হয়ে গেলেন।"

"সে কী—এ কেমন লোক?"

সঞ্জয় বলল, "এও অন্ধ।"

সিদ্ধার্থ

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

(ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত)

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীনিরঞ্জন বসুর সৌজন্যে

বাসাবাড়ী

বিষ্ণু দে

বাসাবাড়ী রুক্ষ মাটি। শিকড় গজাতে লাগে
বহু গ্রীষ্ম বর্ষা বহু হিম।
ভাবি কোন্ ঘর পাব কবিতার ভাগে,
কোথায় ছড়াবে মন, পূব না পশ্চিম।

এখানে উত্তর খোলা, তবুও ফাল্গুনে রিমঝিম
মন আর হাওয়া দোলে গন্ধের বাহারে,
টুনটুনির মিহি গলা খুলে দেয় ঝুরুঝুরু নিম,
ঘুঘু, বুলবুলি বসে আর আসে মিছিলে আহারে

বহু টিয়া, মহাসুখে নিমফল তিক্ত ওষ্ঠাধরে
খায় আর চুপচাপ ভাবে,
তাছাড়া শালিক আছে আর কাক, যতই আদরে
অন্য পাখী চাও, এরা সমানে চেঁচাবে।

বাসাবাড়ী রুক্ষমাটি, অনাবাদী, ভূদানের মতো,
ভোগ্য বাসযোগ্য নয়, তাও পেতে হিমশিম,
দালাল্লি সেলামে নানা দাবিতে বিব্রত আপাতত
উত্তরের ঘরে উঠি, ফুলে ছায় নির্বিকার নিম।

দিনলিপি : জ্যৈষ্ঠ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

হাস্যময় রৌদ্রের সকাল—
টেবিলে আমার ছোট রাধাচূড়া ডাল।
জীবন দেখায় হাসি মৃত্যু থেকে টেনে
আমাকে আবার।
ছুঁয়ে যাই এই আলো, যেন অন্ধকার
বুকে বজ্র হেনে
চলে যায় আজকে সকালে—
বাড়ি-ঘর স্বপ্ন দেয় চোখ ভরে স্বচ্ছ রৌদ্রজালে।
স্বপ্ন আসে অতীতের যৌবনের মতো
ভুলে যাই প্রৌঢ় বুকে আছে শত ক্ষত।
ক্ষতকে ভোলায়—
মনের যৌবন আজ, মুগ্ধ আমি জীবনের শান্তির কুলায়।

২

রুগ্ন বুকে সকালের শব্দগুলো ভারি
তবু শব্দ শুনি, যেন জীবনের ভারি
ঢেলে দেয় চারদিক হতে।
এ পৃথিবী লাবণ্যের স্রোতে
রবে চিরদিন—
তোমার মতন নয়, দু' দিনের ভালোলাগা ঋণ
শোধ করে দিয়ে যাওয়া নয়।
পৃথিবীর পরিচয়
চির যুবতীর মতো পেয়ে গেছি বলে—
ভালো লাগে এ স্নিগ্ধাকে ভোর সন্ধ্যা হলে॥

মেলা

অরুণ মিত্র

গাঁ থেকে অনেকখানি পথ ভাঙার পর এই মেলা। ছেলেটাকে নিয়ে রওনা হওয়ার সময় তাদের ভয় ছিল মাঝখানের সীমানা যদি না পেরোনো যায়। অথচ গোটা বছরকে তারা এই দিকেই ঘুরিয়ে রেখেছিল। নইলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো কি ক'রে? তাই মেলার জমিতে পা দেওয়ামাত্র বাপমা'র রক্তেও হুল্লোড় লেগে যায়। তাদের কুঁড়ে ঘরটা এখন দিগন্তের ওধারে ডুবে গিয়েছে, ঝিঁঝিঁর ডাক আর লম্বা ছায়া নিয়ে গাছের ঝাড়গুলো হ'টে হ'টে প্রকাণ্ড জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আলোর জন্যে হাসির জন্যে। আর কোনো ভাবনা নেই, দৌড়ও, এক দৌড়ে একেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে থামো।

ছোট্ট মেয়ের সামনে বিরাট দরজাটা হাসতে হাসতে খুলে গেল। এক মুহূর্ত তার মনে পড়ল ইন্দ্রধনুর তলা দিয়ে অনেকবার সে এইখানটায় আসতে চেয়েও আসতে পারেনি। ভেতরে ঢুকে সে সব কথা তার মনে থাকে না। তার পরনের ন্যাতায় তখন ফুলের নক্সা ফুটে উঠছে, সারা গা জলের মতো ছলছল করছে। এখানকার স্রোতে মিশে সে মুখটা শুধু জাগিয়ে রাখে আর চোখ বড় বড় ক'রে দ্যাখে। কি নেবে সে, কি নেবে? শেষকালে পুতুলগুলোর সামনে এসে তাকে থেমে পড়তে হল। এই তো এতক্ষণ সে খুঁজছিল। দুটো মাটির পুতুল তুলে নিয়ে সে আহ্লাদে আটখানা। আর কিছু তার নেবার নেই।

ছেলেটা তাকে দেখেও দ্যাখেনি। স্রোতের টানে একবার কাছে এসেছিল, কিন্তু তাকে চিনত না, চিনলে চীৎকার ক'রে ডাকত। একা একাই সে তার ব্যাকুলতা নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে। ভাসতে ভাসতে দিশেহারা হাত বাড়িয়ে পেয়ে গিয়েছে একটা তালপাতার ভেঁপু। তখন তার খুশী আর ধরে না, যেন মুঠোর মধ্যে যাদুমন্ত্র পেয়েছে।

মেলা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথই ধরতে হয়। বয়েসের আর গাছপাথর নেই বাপমা'র। ধুলোর উপর ভারী পা ফেলে ছেলেকে নিয়ে তারা ফেরে। তার হাতে তালপাতার ভেঁপু, সেটা সে কেবলই বাজায়। পুতুল বুকে আঁকড়ে একটা মেয়ে অন্য পথে গিয়েছে, আওয়াজটা এখন সে শুনতে পায় না। কিন্তু একদিন পাবে। যখন এ গাঁয়ের হাওয়া ও গাঁয়ে পৌঁছুবে। তখন সে আকুল হয়ে কাছে আসবে। তারপর হাওয়ার জাদু ফুরোলে দুজনে মেলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিন গুণবে।

আশ্বিনে রোদ্দুর

হরপ্রসাদ মিত্র

সে এলে আজ লাগতো ভালো এই জগতের সমস্ত রূপ-রঙ
সে আসেনি, সে আসেনি,
তাই এখানে অশান্ত মন নিয়ে
খোলা দরজা পেরিয়ে চলা
যদিও তা কাছেই,—কাছেই, মানে
চেনা রাস্তায় হাঁটা কেবল
চেনা ইঁটের রঙ-কুয়াশার বুকে—
একান্ত এই নিজের মতো সংস্কারের
রসি ছোঁড়ার খেলা।
সমুদ্রকে মাপছে পাগল
ওরে পাগল, এ তো সাগর নয়!

তোর চেয়ে ঢের সুস্থ মানুষ এই আমাদের মদন-মহাজন,
সজনেতলার মুকুন্দ শেঠ, রহিমপুরের রহিম বা রামধন।
দিন গুজরান সহজ স্রোতে, তেজারতির সামান্য সব ঢেউ
অভ্যাসে যায় সহজ হয়ে বে-খেয়ালী বলবে তাদের কেউ?
বুকের মধ্যে বিঁধলে কেবল,—নেইত তেমন
গোপন আত্মরতি,
বৈধ ভালোবাসার উঠোন পেরিয়ে যাবার যদিই-বা হয় মতি,
আছে রসের রহস্যরাগ এই সংসার-কুরুক্ষেত্রে তবু,
আত্মগ্লানির ফেউ লাগে না, হাকিমবাবুই অদ্বিতীয় প্রভু!

চেনা সময়, চেনা বাড়ি—
প্রতিদিনের কান্না-হাসি ফিকে—
তারই মধ্যে রাস্তা খোঁজে
যে অশান্ত নতুন প্রাণের দিকে,
নিজেকেই সে ছাড়ছে কেবল,
ছেড়ে-ছেড়েই পৌঁছবে ঠিক, ঠিক।
তার প্রতীক্ষা মনে-মনে, তারই জন্যে উৎসুক দশ দিক॥

করবী ফুল ফুটছে এখন এই-যে আমার জানলাতলায় আজ
ওদের মতন সহজ এবং প্রগল্‌ভ সুখ,
সর্বনাশের সাজ
জ্বলবে তোমার অঙ্গে অঙ্গে
—সেই দেখাতেই অশান্তি ভরপুর
মদন-মহাজনের মুখে পড়লো এসে আশ্বিনে রোদ্দুর!

খুকুর মুকুর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

খুকুর মুকুর ছোট হোক্, তবু খুকু যে দেখিতে পায়
আকাশের ছবি, পৃথিবীর ছবি, মানুষের ছবি তায়।
সাদা কালো মেঘ, তরুলতা পাখি, কত যে পথিক, পথ,
কত যে রঙিন ফুলফলপাতা, কত কুঁড়ে, ইমারত,
মোটর, রিক্‌শা, ভ্যান, সাইকেল, কত বাস, কত ট্রাম,
খুকুর মুকুরে ক্ষণিকের ছবি এঁকে যায় অবিরাম;
খুকুর মুকুরে ছায়া ফেলে কত হাসি-কান্নার মুখ,
কেহ ভ্যাংচায়, কেহ শিস্ দেয়, কেহ করে কৌতুক;
রবি ধরা দেয় মুকুরে তাহার, চাঁদ খেলে চোর-চোর,
সারাদিন খুকু মুকুর লইয়া দেখার নেশায় ভোর।
ক্ষণিক সেথায় ছায়া ফেলে যায় এ পৃথিবী কি মায়ায়,
একখানি শিশুমনের মাধুরী স্বর্গ গড়িতে চায়;
হঠাৎ কখন খুকুর মুকুর ভেঙে হোল চুরমার,
খুকু কেঁদে বলে—"আমার পৃথিবী ফিরে দাও একবার!"

স্টেশন

দিনেশ দাস

স্টেশন অনেক দূরে।
তুমি এলে রেশমী ধুলোর পথে আমাকে এগিয়ে দিতে।
এতক্ষণ ঘরে ছিলে জলের অতলে ডুব দিয়ে,
হঠাৎ আলোয় এসে
মাছের মতই যেন উঠলে লাফিয়ে।

স্টেশন অনেক দূর।
তবু পথে যেতে যেতে ক্রমাগত
কিসের আওয়াজ শুনি,
টেলিগ্রাফ তারে-তারে হাওয়ার শব্দের মত।
তুমি পাশে চলেছিলে ঘাড়টি হেলিয়ে শুধু কঁথা ব'লে ব'লে।
একবার ক্ষীণ হেসে বললাম,
"তুমি কি এখনো আছো মোমের পুতুল,
ধারে ধারে রঙের বাহার ?"
তোমার ঠোঁটের ফাঁকে সরল উত্তর ঃ
"পুরোনো পুতুল নিয়ে খেলবে আবার ?
হারানো খেলনা নিয়ে খেললে কি ক্ষতি ?"
আমি শুধু চুপচাপ চেয়ে দেখি, রাস্তার ধারে
শাদা এক ফুলের ওপর ব'সে মিছিমিছি ডানা নাড়ে
আরো শাদা এক প্রজাপতি।

শুধু পথ হাঁটি
সামনে একটি গাছ কালোনখে আঁকড়ে ধরেছে মাটি।
তুমি কথা বলো অনর্গল,
সে কথা শুনিনি সব
কথার পাপড়িগুলি মাঠময় ঝরেছে কেবল।
আমি পথ হাঁটি আনমনে
শুধুই একটি পথ
যে-পথ চলেছে সোজা মনের গহনে।

মনে হ'ল, এ মেয়েকে খুলে সব বলি,
জীবনের দুধশাদা কাগজের পাতা
পুড়ে পুড়ে মিশকালো হয়েছে কেবলই,
সেখানে কেমন করে' রঙিন কথার দাগ পড়ে ঃ
ভয় হল ঃ এ কথা বলার পরে
আরো তো নিঃসঙ্গ মনে হবে
আরো মনে হবে একা একা ঃ
এর চেয়ে বরং অনেক ভাল
চুপচাপ পথ চলা। শুধু পথ দেখা।

এখনো আকাশে সেই একটানা আওয়াজ কিসের !
টেলিগ্রাফ তারে তারে উড়ো বাতাসের ?
হয়তো ঘুমের মত নতুন জলের সুর—
স্টেশন এখনো দূর।

রঘুবাবুর যুক্তিতে

মণীন্দ্র রায়

জয়ন্তী, আবার আমি ছবি আঁকছি ! অবাক হ'য়ো না,
ভুলিনি দুঃখের দিন, চাকরিতেও নিইনি বিদায়।
যোগবালা বিদ্যালয়ে অঙ্কন-শিক্ষক আশী টাকা
এখনো আনবে। শুধু আরো এক বাঁচার উপায়
শিখেছে সে, তাই ধুলো ঝেড়ে
ইজেলে নতুন রঙ ঢালে, আর চলে ছবি আঁকা।

একদিন, জয়ন্তী, তুমি বলেছিলে—ভোলোনি নিশ্চয়—
'জীবন কী সাধারণ ! কিছুই হলো না।'
তারি প্রতিধ্বনি বুকে বেজেছিল, আর দীর্ঘশ্বাসে
সমুদ্রশ্বসিত রাত্রি অনিদ্রায় হল অশ্রুলোনা।
যেন আলো-আঁধারির বনপথে ঘুরে স্বপ্নময়
হঠাৎ এলাম নগ্ন রোদেপোড়া মঠের সন্ত্রাসে।

কেটেছে অনেক কাল। তুমি আর আমি
কেউ কারো মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে, নিয়তিকে মেনে,
চলেছি সমান্তরাল—একটি আকাশে দুটি পাখি।
দুজনে মেলার মতো কোনো শাখা আছে-কি না-জেনে
ক্লান্তির দূরত্বে বাঁচি প্রতিদিন। কী হল সহসা,
দেখ সে শূন্যতা আজ জাগে রূপে, মুছে যায় ফাঁকি।

আজকে রাস্তায়, জানো, বহুদিন পরে
পিছনে শুনেছি দূর শৈশবের ডাকনাম, আর
রঘুদাকে দেখি আসে দু' যুগ ডিঙিয়ে।
সেই হাসিমুখ, রোগা, দীর্ঘদেহ হাড়ের পাহাড়
কাছে এসে ধরে হাত; আর মেষশাবকে ঈগল
যেমন উড়ায় বেগে, আমাকেও গেল ঘরে নিয়ে।

কতোদিন পরে দেখা। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নের
পরে জানা গেল ক্রমে, চাকরি আর ব্যবসাতে মিলে
ছ' বার শিকল কেটে পেশা তার অরণ্যে উধাও।
অধুনা খোঁজার পালা চলছে। তা হোক, এ নিখিলে
কর্ম তো সবারি আছে, ক'রে যেতে হবে, কিন্তু ভাবো
এ অভাব মেটে যদি, পাবে কি সত্যি—যা তুমি চাও।

হঠাৎ আশ্চর্য লাগে। বাণপ্রস্থ এল কি চল্লিশে ?
রঘুদা আবার বলে, 'তন্ত্রমন্ত্র জানি না, শুধুই
একটি জানালা আমি খুলে রেখে দিয়েছি। গুমোটে
তাই বেঁচে আছি। তাই সকালের খুশি নিয়ে দু' একটি চড়ুই
উড়ে আসে; আমারো এ বুনোগাছে দেখি
আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটে !'

কৌতূহল সীমা ছাড়ে, প্রশ্ন করি তাই—
'কী ক'রে তা ঘটে ?' শুনি রঘুদার সলজ্জ গলায়
ধীরে ধীরে ভাষা জাগে, 'নাটকের নেশা ছিল, তাতো
জানোই, নাটক করি। আর তারি চলায় বলায়
মুক্তি পাই। কেটে গেল অর্ধেক জীবন। কী পেলাম
হিসাব কষি না। কিন্তু স্মৃতির করাতও

রক্তাক্ত করে না মন। শিখেছি—কেবল
আচমকা প্রবেশ আর করতালি নয়, আত্মদানে
প্রতি মুহূর্তের বলা-না-বলার সমস্ত মহিমা
বাঁচে শুধু চরিত্রের শেষের প্রস্থানে !'............
জয়ন্তী, এ সব শুনে মনে হল বাঁচি, ছবি আঁকি।
প্রথমে তো মাটি, শেষে যা রাখি তা আমারি প্রতিমা।

অনিচ্ছা থেকে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সৃষ্টির আগ্রহ নেই শিল্পীর আঙুলে,
নিদ্রার নিগড়ে হাত বাঁধা।
অথচ সম্মুখে তার সিক্ত এলোচুলে
জন্ম নেয় রাধা।

কোথায় হাতুড়ি তোর, কোথা রে বাটালি,
স্বপ্নের যন্ত্রণা কই তোর।
ওরে শিল্পী, বিভাবরী বৃথাই কাটালি,
রাত্রি হয় ভোর।

আমি ত ছিলাম সেই পুষ্পিত তমালে,
প্রহর কেটেছে দুই তিন।
ভাবিনি যে, ইচ্ছা হতে পারে কোনোকালে
যন্ত্রণাবিহীন।

অথচ যন্ত্রণা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার হাওয়া
সত্যিই রাত্রির জানালায়
এসেছিল, বকুলের-গন্ধে নিশি-পাওয়া
শিল্পীর আশায়।

তা না-হলে তরঙ্গিত যমুনার কূলে
এই রাত্রি হত না সমাধা;
নিত না নবীন জন্ম সিক্ত এলোচুলে
ত্রিকালিনী রাধা।

না, তবু আগ্রহ নেই শিল্পীর আঙুলে,
নিদ্রায় নয়ন তার বাঁধা।

সাম্রাজ্য

উমা দেবী

সে মুহূর্তে মাঝে মাঝে আসে
হৃদয়ের নির্জন আকাশে।
জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনারা—খণ্ড খণ্ড ভাঙা কাঁচ—
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারালো
কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে চিত্র-রচা হ'লে সেই রহস্যের আলো
তাতে প্রতিবিম্ব ফেলে জ্বলে
অস্তিত্বের গভীর অতলে।
সেখানে অনেক স্মৃতি ঘুমায় মুক্তার মত বিস্মৃতির
শুক্তি-গর্ভাশয়ে,
অনেক আশ্চর্য ক্ষণ ধীরে ধীরে জেগে ওঠে উজ্জ্বল
প্রবালদ্বীপ হ'য়ে,
হৃদয়ের ভরন্ত বিশ্বাস
অনায়াসে ফেলে মুক্তিশ্বাস।

সে মুহূর্তে তোমাকেই মনে হয় সে দ্বীপের একক সম্রাট!
এলোমেলো জীবনের ভাঙা রাজপাট
আবার বিন্যস্ত কর দূরশ্মি করে
সুশাসিত নিস্তব্ধ প্রহরে।
সযত্নে শাসন কর অশ্রুর সমুদ্র-ঘেরা বাসনার স্বর্ণময় দ্বীপ,
সমুদ্র মেখলা এই ধরিত্রীরই সম্রাট-প্রতীপ।

সে মুহূর্তে মাঝে মাঝে আসে
নির্বাপিত কাম-তৃষ্ণা শান্ত অবকাশে,
ধ্যানের দেবতা হ'য়ে রূপ পায় যে মুহূর্তে ধমনীর
রক্তাশ্রয়ী প্রেম
হিসাব বিস্মৃত হয়—কি নিলেম—কিংবা কি দিলেম—
হৃদয়ের ভরন্ত বিশ্বাস
অনায়াসে ফেলে মুক্তিশ্বাস।

ভালোবাসি

অরুণকুমার সরকার

মানুষ এখনো মাটির পুতুল কেনে
রথের মেলায় বাঁশি,
জানলায় দোরে গভীর পর্দা টেনে
হেসো না অবিশ্বাসীর বিজ্ঞ হাসি।

স্নিগ্ধ আলোক রয়েছে শিশুর চোখে
আশা প্রেমিকের মনে।
শ্রাবণদিনের আর্দ্রতা কারো শোকে
স্বপ্ন আবেশ অনেকের জাগরণে।

ছোটোখাটো সুখ ব্যর্থতা চেষ্টায়
হাজার জীবন চলে
সমুদ্রে নয়, দূর নির্জন উপত্যকায়;
একা একা কথা বলে।

সেই কথাগুলি পুতুল বানায়, বাঁশি
বাজায় উদাস সুরে।
সব সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসি
বলে শুধু ঘুরে ঘুরে।

পারস্পরিক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
কনকনে শীতের রাত্রে যখন পাখিরা হিমে জড়
গ্যারাজে গাড়ির মতো গুটিশুটি, নিরাপদ নীড়ে;
নির্বান্ধব গলি শূন্য; জনশূন্য। কার্নিসের নীচে
দরিদ্র মাধবীলতা—আমারই আশ্রিতা—চুপ;
কুয়াশায় আবৃত কলকাতা।
আমি তাকে খুঁজি
যে আমাকে অহরহ খোঁজে।

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
শ্রাবণের উচ্ছ্বসিত জল, অথৈ, দুরন্ত, মত্ত-
বর্ষাতির আড়ালে না, অসংকোচে ভিজি।
সেই দণ্ডে আমি যেন মাধবীলতার কেউ, নিরাশ্রয়;
পৃথিবীর যতো কান্না আমার শরীরে নামে, আমি স্তব্ধ।

এই বর্ষা রস ঢালে গোপন শিকড়ে
চন্দ্রমল্লিকার আর লজ্জাবতী লতার গহনে,
এই বৃষ্টি গান গায় বেহালার তারে।
আমি তাকে দেখি
যে আমাকে অহরহ দেখে।

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
আমি নয়, অন্য কেউ যেন—
কে যেন দরজা খুলে দেয়, ডাকে,
মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো উঠে আসি,
আমার ব্যাধকে খুঁজি, কস্তুরী-সৌরভে ঢাকি
আমার মৃত্যুর পথ।

নিষ্ঠুর কৃতান্ত ব্যাধ, তাকে খুঁজি
যে আমাকে অহরহ খোঁজে।
কনকনে শীতের রাত্রে আকাশের নীচে
বৃষ্টির ঝড়ের মধ্যে করুণ শ্রাবণে
আমি তাকে দেখি
যে আমাকে অহরহ দেখে॥

ক্রান্তিকাল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনে আমার জন্ম, তোমার ফাল্গুনে—
শুভ্র কাশমঞ্জরীতে তুমি আনো পলাশের লাল;
আবর্তিত ঋতুচক্রে আমরা দুজনে রাখি ধরে
দুই হাতে দুই ক্রান্তিকাল।

আমি থাকি নীল শূন্যে ফেরারী মেঘের শুভ্রপালে,
তুমি থাকো মাটিতে নিহিত;
তোমায় রেখেছে ঘিরে ধাতু-জল-বীজ ইন্দ্রজালে
কখন যে হবে জাগরিত!

আমি আসি আকস্মিক বর্ষণের সজল আবেগে
মাথা কুটি মৃত্তিকার দ্বারে,
কুমার-সম্ভব নাট্যে কখন জাগবে তুমি উমা
হিন্দোলে না বসন্ত-বাহারে!

শমী শাখা দীর্ণ করে যেমন সহসা অগ্নি আসে
তুমি আনবে পলাশের বিভা,
আমি দেব শরতের আমনের সচ্ছল সংবাদ
সংহতির প্রদীপ্ত প্রতিভা।

সৃষ্টি স্থিতি কাঁপে এই মিলনের রাগিনী ঝঙ্কারে:
রচি সেই আনন্দ সংহিতা—
বজ্রসত্ত্ব সে আবেগে থরো থরো আলিঙ্গনে বাঁধে
বক্ষলগ্না প্রজ্ঞাপারমিতা।

পৃথিবীর দুই লগ্ন মিশে যায় সে-কেন্দ্রবিন্দুতে,
সেইখানে নৃত্যময় সবই
নট-বালকের মত মাতে বিশ্ব ঘূর্ণমান বেগে
নাচে লক্ষ গ্রহ-তারা-রবি।

নির্জন চেতনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ছায়ার মতোই যেন দূরে-দূরে সঙ্গে-সঙ্গে আছে!
সুহৃদ বৃষ্টির পর একমুঠো রোদের মমতা
কখনো সে। পক্ষান্তরে মনীষীর প্রেরণার কাছে
দর্পণে প্রিয়ার চোখ, হৃদয়ের নিখুঁত স্বচ্ছতা।

একটি পাখির শুভ্র আকাঙ্ক্ষায় আধো অন্ধকারে
নিভন্ত সত্তায় আনে সারাক্ষণ নক্ষত্রকামনা;
ভেজায় তৃষিত মাটি, ছড়ায় দুহাতে বারে বারে
দুধের আর্দ্রতা জল, প্রত্যাশার স্বর্ণশস্যকণা।

অভিভূত বন্যতায় যখন তৃষ্ণায় পিচ গলে,
আগ্নেয় আবেগ জাগে বিচলিত অন্ধকার কোণে
এবং বিষণ্ণমুখে সংবর্তের ক্ষুব্ধ রোষ জ্বলে—
সে আমাকে নিয়ে যায় জীবনের গভীর অতলে

যেখানে সন্ধ্যার চোখে সৃজনের মায়াবী কাজল
এবং উষার বীজে রক্তিমাভ দিগন্তের বাঁক;
আকাঙ্ক্ষায় যন্ত্রণায় সুগভীর তবু অচঞ্চল
সেখানে গুহার মুখে নিরুদ্ধার সিংহকণ্ঠ হাঁক।

সেখানে সৃজনবেগে কল্লোলিনী হৃদয়ের নদী
মুহূর্তেই তিলোত্তমা, একবার ডাক দিই যদি॥

রূপান্তর

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

মরুভূমির বিফল গোধূলি
সবুজ শস্যের সুষমা নিয়ে ফিরে আসবে,
আলস্যের বিষণ্ণ দিনগুলি
শ্রমের ফাঁকে আনন্দে হাসবে.
বেকারকে আমি কাজ দেব,
সেই রূপান্তরের স্বপ্ন দেখি।

হায় হেমন্ত, এ বারেও আমি লজ্জিত,
তোমার ফসল ফলাতে পারিনি.
নামতে পারিনি মাটির মর্মমূলে,

আমার মান্ধাতার আমলের লাঙলে
কবির পুরনো ভাব ও কৌশল
রসের গভীরে আমাকে নিল না।

আমার শিকড়কে নিয়ে চলো মাটি,
তোমার হৃদয়ের আরো গভীরে,
কবিকে নিয়ে চলো দুঃখিনী নারী
তোমার হাসি-কান্নার গোপন খনিতে,
বসন্তকে আমি কথা দিয়েছি,
আর সৃষ্টিতে কৃপণ থাকব না।

ক্ষীণায়ু

অরবিন্দ গুহ

আমার বাগান নেই। কিন্তু আমি তোমাকে অম্লান
কিছু ফুল দিতে চাই। তা ব'লে কি দোকানীর কাছে
ফুল কিনতে যাবো? না, যাবো না। মনে-মনে বলি, 'আনো,
আগে আনো বাগানের দিন, বীজ, ফুল ফোটাও গাছে।'
তাছাড়া কি অন্য ফুল আমি নিতে পারি, দিতে পারি?
না, পারি না। আগে চাই বাগান, বিশ্বস্ত সহকারী।

ফুল ফোটানো তেমন সহজ নয়। একটি ছোটো চারা
অনেক চেষ্টায় যত্নে ধৈর্যে পরিশ্রমে বেঁচে থাকে,
বড়ো হয়, পাতা মেলে, ফুল ফোটায়। সতর্ক পাহারা
কিন্তু সারাক্ষণ রাখা চাই। মানে, আমি যা তোমাকে
দেবো তা ও ফোটাবে আপন রক্তে—সর্বস্বের ভারে
উদয়াস্ত ছয়ঋতু সাতসমুদ্রের সমাহারে।

সব বাতাস, যাবতীয় বৃষ্টিমেঘ বন্ধু? না, বন্ধু না।
পরাক্রান্ত কীট বৈরী। সব শত্রুতার প্রতিবাদ?
আমার অপার প্রেম কম্পমান। সুন্দর করুণা
তাই দেবে অন্য বায়ু, বৃষ্টি, মেঘ—গন্ধে, বর্ণে, স্বাদে।
অযত্ন-নিয়ত ফুল কে চায়। কয়েকটি ক্ষীণজীবী
উপহারে ধন্য হবে বাগানের নিভৃত পৃথিবী।

ক্ষীণায়ু আমার দিন। যদি ফুল ফোটানোর আগে
দিন যায়, রাত্রি যায়, জীবনযৌবন দেশান্তরী
হয়ে যায়! তাহলে কি বাগানের সামান্য ভূভাগে
বিপুল সুদৃঢ় ফুল নিতে আসবে? দুঃসাহসে ভরি
আমার ক্ষীণায়ু রাত্রি ঃ তুমি আসবে অন্ধকারে। ঘাসে
আলো কেন? পুনর্বসু, অনুরাধা অতন্দ্র আকাশে॥

অনেক দিনের শূন্যতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম বুঝি আর কোনদিন মনেও পড়বে না
হে আমার উত্তরের জানালার আলো
ঋতুরঙ্গে দগ্ধ দিন, তৃষ্ণা, শোক, খর চক্ষে চেনা
দেওয়ালের লম্বমান অন্ধকার, জীর্ণ স্মৃতি জীবনে ছড়ালো,—
হাওয়ার নিপুণ শিল্প রেখে গেল চক্ষে ওষ্ঠে মুখে
কালের পুরোনো গল্প, বেঁচে থাকা যেন চির দুশ্যানির্বাসন
একলা ঘরে স্থির থাকি, তিনটি ইঁদুর এসে
প্রতিদিন ঘুরে ফিরে চোখের সম্মুখে
একদিন গলি কেটে আমার বুকের মধ্যে করে এল
পাতাল দর্শন।

পদ্মপত্রে নীর কাঁপে, বেলা ভাঙে সায়াহ্নের মায়াবী শরীরে
হে আমার উত্তরের জানালার আলো,
আকাশে একটি স্থির নিষ্ঠুর আলেয়া জ্বলে
আমাকে বলেছে ধীরে ধীরে,—
সমস্ত গবাক্ষ রুদ্ধ করে দাও, ভুলে থাকা সবচেয়ে ভালো।
আদিম সর্পের মত ভেদ করো অন্ধকার যোনির গহ্বর
দ্বার খোলো নৈঃশব্দের, চেয়ে দেখ পূর্বজন্ম, মৃত্যুর. বিভাস,
ভুলে যাও প্রেম-পুণ্য, রহস্যের মুগ্ধ ডাক, প্রিয় কণ্ঠস্বর
সমস্ত মানুষ দেখ দূষিত স্বপ্নের ক্রীতদাস।

বহুদিন পর আজ ঘুম ভেঙে মনে হল আমার শিয়রে
শীতল দুঃখের মূর্তি, হে আমার বিস্মৃত বাসনা,—
উদাসী হাওয়ার সঙ্গী সুগন্ধের মত তুমি ভরে আছ
অন্ধকার ঘরে
হৃৎস্পন্দনের শব্দ অস্তিত্বের, জীবনের করে উপাসনা।
সব দৃশ্য মনে পড়ে, সব আলো, সুখ-শোক,
রমণীর উজ্জ্বল হৃদয়,
বোধি এসে কণ্ঠ চাপে, যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে প্রাণ;
লোভের আঙুল দিয়ে আমি কোন ভবিষ্যৎ করিনি তো জয়
দূরের আলেয়া তুমি দূরে যাও,
ঘনিষ্ঠ আলোর আমি করি স্তুতিগান।

বোধন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

দিগন্তে
অদৃশ্য মেঘের পাখোয়াজ।
এখানে জলের মত সুরে
ঘুরে-ঘুরে ডাকে।
নদীস্রোতে এস্রাজের ছড়—
গীটারের মত দোয়েল-শ্যামার কণ্ঠস্বর।
শিউলি ফোটে, স্থলপদ্ম ফোটে—
ক'টি অপরাজিতা।

সবুজ আগুনের মত
আমের শাখা, বেলের পাতা।
পাকা ধানে
হলুদ পোখরাজের আলো।
ঘাসের শীষে মুক্তো জ্বলে ঃ
কাশের শীষে হীরে জ্বলে ঃ
আরেক নীল আগুনে
গনগন করে আকাশ।
কোথায় একটি হোমের আয়োজন
এই বুঝি সম্পূর্ণ হ'ল।
পৃথিবী—দেবতার মত।

এই প্রতিপদে,
প্রতি পদে শুধু পদক্ষেপ শুনি
তৃণে, তারায়, পাহাড়ে—সমুদ্রে।
পথের পাঁওদলে,
মানুষের মনে।
শুধু পদক্ষেপ শুনি,
পদক্ষেপ শুনি।

স্মৃতিরেখা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ডলি বলেছিল, ভুলে যেয়ো,
রুমি বলেছিল, মনে রবে?
ইলা ছিল যুবতী বিধবা
বড়ো ভয়, বুঝি পাপ হবে।

কে লিখে রেখেছ কথাগুলি
কিছু ডায়েরিতে, কিছু মনে;
সতন চোখ চম্পক-অঙ্গুলি
হারালাম নীল ফুলবনে॥

একটি কবিতা

অবন্তী সান্যাল

হৃদয়ের মুখে ফুঁ দিয়েছিলাম
বেজে উঠেছিল শঙ্খের গর্জন,
শিরা উপশিরা নেচে উঠেছিল যুদ্ধের ঘোড়ার মত,
পেশিগুলো যেন ছিলা-টানটান ধনুক।

মনের আগুনে ফুঁ দিয়েছিলাম
জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ দাবানল,
পুড়ে ছাই হ'তে চেয়েছিল ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান-
ইহকাল পরকাল সমগ্র অস্তিত্ব।

হৃদয়ের মুখে ফুঁ দিলাম
ককিয়ে উঠল ফাটা বাঁশির আর্তনাদ,
শিরা উপশিরায় জেগে উঠল হিমশঙ্কার সঞ্চরণ—
পেশিগুলো প্রাণহীন রক্তহীন শ্লথ।

মনের আগুনে ফুঁ দিলাম
কুণ্ডলী পাকিয়ে এল চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়া,
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল দম-আটকানো বিরাট পাহাড়—
অস্তিত্বের চারপাশে নাস্তির আড়াল।

আকাশ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সেই দিনগুলো জানি যে নেই
গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছে হাওয়ায় মিশে ঃ
সময় যখন চোখে-চোখেই
চেয়েই কাটত—বয়সটা উনবিংশে।

একফালি চাঁদ, নীল আকাশ
নিয়েই যে ছিল জীবনটা প্রজাপতি;
ভালবাসতুম ফুল যে ঘাস—
একটি নীড়ের নিবিড় স্বপ্ন অতি।

আকাশ সেদিন অনেক কাছে
নেমে এসেছিল দু'চোখে জ্যোৎস্না নিয়ে,
খোলা জানালার ফ্রেমের কাচে
সাদা শাড়ি তার গিয়েছিল আটকিয়ে।

সে আকাশ আজ অনেক দূরে—
জানিনা কখন বহুদূরে স'রে গেছে,
একা, কেউ নেই, শুধু ঘুঘুর
সাড়া ভেসে আসে, মনটা কী বুড়িয়েছে?

আয়নায় মুখ

চিত্ত ঘোষ

আয়নায় ত্রিকোণ মুখ। শোকার্ত ত্বকের রেখা জ্বলে :
ক্ষয়ের অথই শূন্যে সে-অতীত পরিত্যক্ত গুহা—
স্মৃতিসেতু অন্ধকার। গভীরতা গাঢ়স্বর জলে,
বর্ষার দুর্বার নদী ধাবমান তরঙ্গে আত্মহা।

সে কেন নিশ্চিন্ত তবু? ক্লেদ, ক্লান্তি, নশ্বরতা তার
লালিত গর্হিত স্বপ্নে। অগ্নিময় নিরন্ত আয়নায়
দগ্ধ দেহ, দগ্ধ পরিণাম। প্রতিচ্ছবি নিঃসংগ তুষার
হরিৎ শস্যের বর্ণ হেমন্তের অশ্রুর পাতায়।
থামবে না কখনো তুমি তারাময় তরঙ্গের গান :
হে সময়, অন্ধকার স্রোতমগ্ন নদী—।
হে আকাশ, জলধারা, হে শুভ্র পাষাণ
আমাকে যা দিলে দাও, তাকে দিও সে-দানের ক্ষতি।

গাগরীটা পড়ে আছে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শাদা মশা ছেঁকে ধরে, হাটুতে এখন ধৈর্য নেই,
ঘড়ির কাঁটার মতো হৃৎপিণ্ড সব নিচ্ছে মেপে,
এখন এখানে কোনো শিউশরণ প্রদীপ জ্বেলো না,
বিবেকের হাতে আমি মারা পড়বো প্রদীপ জ্বললেই।
বিবেক দেখতে ঠিক মোম-শাদা ভূতের মতন,
মাংসমেদমজ্জা নেই, আর আমি এই সন্ধ্যাবেলা
ক্লান্ত আছি, তাকে দেখে ঠিকমতো কথোপকথন
যদি না চালাতে পারি!

তবু দ্যাখো পা-তোলা পা-ফেলা;
ঘড়ির কাঁটার মতো বিতর্কমূলক পদক্ষেপে
হৃৎপিণ্ড চলেছে যে, এই ভালো। যে তার গাগরী
ভরেছিল, সে এখন দূরে, নীল দিগ্বলয় ব্যেপে;
অবশাম্বুহীনতায় পড়ে আছে গাগরী একেলা,
শীতে ফাটা ওর ঠোঁট শাদা মশা হ'য়ে ছেঁকে ধরি॥

শিশিরের মুখ

বটকৃষ্ণ দে

ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি, বাইরে। ঘরে নম্র নীল আলো আঁকা।
রেডিয়োর রবীন্দ্রসংগীত, শোন, সুচিত্রা মিত্রের :
দেয়ালে যামিনী রায়, কাছে কাব্যগ্রন্থ, বিচিত্রের
বিচিন্তা, দর্শন, আমি কে, তুমি কে!—এই আমি-তুমি,
এই যে টুপ্ টুপ্ বৃষ্টি, তার মূলে দূরে মেঘ-ভূমি
তারও পারে ওই যে আকাশ, ওই দূরান্তৃত ফাঁকা
পটলোক, সেখানে ঝংকার ঝরে দ্বৈত রাগিণীর,—
দুই-এক-হওয়া মন্ত্র গেয়ে চলে বেদনা বৃষ্টির!

ঝিরি ঝিরি শান্তি, বাইরে। বৃষ্টির শ্লোকের শোক শেষে
সুখের আনন্দঘন মৌন মন পৃথিবীকে দেখে,
শিল্পী যাকে রক্ত-রঙ যন্ত্রণার তুলিকায় আঁকে
প্রশান্ত প্রদীপ্ত ছবি, সুর যাতে রূপ পায় এসে,—
(সেই প্রেম!) সৃষ্টির বেদনা-তীর্থে পরিস্নাত সুখ,—
—ভোরের শিউলি-শীর্ষে রাত্রি আঁকে শিশিরের মুখ॥

জনান্তিক

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সকলেই ছদ্মবেশ ধরে আছে দৈনিক নাটকে।
কেউ প্রেমে সুখী, কেউ পরাজিত, প্রত্যহ সংসার
ডাক দিচ্ছে নেপথ্যের রঙ্গমঞ্চে, ঘন অন্ধকার;
আলো জ্বললে দেখা যাবে দুঃখে-সুখে আনন্দে বা শোকে
প্রত্যেকেই মগ্ন কোনো নিজস্ব নিপুণ ভূমিকায়।
বহুরূপী রাত্রিদিন দৃশ্যপটে রেখেছে আকাশ
সজ্জিত মেঘের শিল্প, রৌদ্র-ঝড়, দীর্ঘ বার মাস,
আবহসংগীত বাজে ঋতুরঙ্গে, বসন্ত-বর্ষায়।
সকলেই ছদ্মবেশ ধরে আছে প্রাচীন নাটকে—
ক্লান্তিহীন বৃত্তরেখা, তুমি এর উৎসের গভীরে।
আর না, এবার তুমি খুলে ফেল ছদ্মরূপময়
নকল ছায়ার মূর্তি, জীবনের শুদ্ধ দুঃখ-শোকে
আনন্দে সুখের স্পর্শে উন্মোচিত হও ধীরে-ধীরে।

দ্যাখো, কার চোখে জ্বলছে স্বচ্ছ, মুগ্ধ, পবিত্র প্রণয়॥

আলোছায়া

সুনীল বসু

শ্যাওলা ঝোপে সরিয়ে বুঝি পান্সি চলে বেঁকে
আকাশ দেখ তারা ফুলের সাজি।
ডাক-পাখিরা জলাবিলের চড়ায় ওঠে ডেকে
অকূল গাঙে বৈঠা বায় মাঝি।

রেশমী সুতো জোছ্না যেন মেঘের তাঁতে বোনা
লুটিয়ে ঝলে পদ্মফোটা ঝিলে
প্রিয়তমা বশ করেছো তোমার চোখের নীলে,
বশ করেছে তোমার হাতের ঝিলিক দেওয়া সোনা।

হারিকেনের দুলছে আলো দূরের আল্‌পথে
চাঁপাগাছের চাতালটার কোলে
কুয়োতলায় বালতিতে জল তোলে
রেশমী ছায়ায় ডুরে শাড়ি দেখায় খদ্যোতে।

পান্সি গেল দূরের বাঁকে হাল্‌কা চালে ঘুরে
শীতের লেপের উষ্ণতা কি মিঠে
নীড় বেঁধেছি অনেক হাজার ইঁটে
তনুর তাপ লাগুক এবার অবশ অঙ্গ জুড়ে॥

বইয়ের আদর

শ্রীকালিদাস রায়

আহরণের দিক থেকে পুস্তককে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে—(১) স্বকীয় অর্থে ক্রীত, (২) উপহৃত, (৩) অপহৃত। এ ছাড়া ভিক্ষাহৃত ও বলাহৃত আরও দুটি উপশ্রেণী আছে। অনুনয় বা দীনতা প্রকাশে লেখক কিংবা প্রকাশকের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়াই ভিক্ষাহৃতি। ভিক্ষাহরণ সাধারণতই পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধেই দেখা যায়। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা বা অনুরক্তজনের আবেদনের যে আহরণ তাও ভিক্ষাহরণের শ্রেণীভুক্ত। আর জোর করে দাতার অনিচ্ছায় যে আহরণ তা হল বলাহরণ। অপহৃতি যদি চুরি হয়, বলাহৃতি তবে ডাকাতি। বলাহৃতি অপহৃতি না হলেও অপাহৃতি (অপ+আ+হৃতি)।

স্বকীয় অর্থে ক্রীত পুস্তক বন্ধুজন বা আত্মীয়জনের বিবাহ, জন্মতিথি ইত্যাদি—উপলক্ষে উপহৃত হতে পারে—সে ক্ষেত্রে ক্রেতা 'চন্দনভারবাহী জীববিশেষ' মাত্র। অথবা সে পুস্তক নিজের এবং প্রিয়জনগণের পাঠের জন্য রক্ষিত হতে পারে। যে-সকল বইয়ের একবার পড়া হয়ে গেলেই আর প্রয়োজন থাকে না, সে-সকল বই আর সযত্নে সংরক্ষিত হয় না। যে-সব বইয়ের প্রয়োজন চিরন্তন, সেই বইগুলিই সযত্নে রক্ষিত হয়।

কারও টেবিল বা আলমারি থেকে গোপনে বই সরানোই আসল অপহৃতি। অপহরণ করে বিক্রি করবার উদ্দেশ্য থাকলে, সে-বই অপহর্তা অত্যন্ত সাদরে সযত্নে ও গোপনেই রক্ষা করে। সে-উদ্দেশ্য না থাকলেও অপহৃত বই অপহর্তার গৃহে সযত্নে এবং কতকটা গোপনেই থাকে।

লাইব্রেরি বা পাঠাগার থেকে ধার-করা বই টাকা জমা দিয়ে নাম সই করে আনা হয়, কাজেই সে-বই গাপ করা যায় না। সে-সব বই সম্বন্ধে সাধারণত কোন যত্ন নেওয়া হয় না। সাধারণত সে-সব বই অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ফেরত যায়। অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের বহু পাতায় পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মন্তব্যও লিখে থাকেন। বইয়ের উপর রবার-স্ট্যাম্পে ছাপ দিতে হয়—"অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকের পাতার কোণ মুড়িবেন না"।

কলেজের অধ্যাপকের কাছে শুনেছি—কলেজ-লাইব্রেরির কোন কোন মূল্যবান পুস্তকের অনেক ফর্মা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করে কোন-না-কোন পাঠক কতকগুলি পাতা ছিঁড়ে নিয়েছে। এ হল আংশিক অপহরণ। গ্রন্থানুরত্ন একাধিক জ্ঞানান্বেষী পাঠক যদি আপন আপন প্রয়োজনমত অংশগুলি ছিঁড়ে নেন—তা হলে শুধু ভূমিকা সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট সহ মলাটটাই লাইব্রেরিতে থেকে যেতে পারে। তখন একখানা অর্থনীতির পুস্তকের শূন্য মলাটের ভিতর উস্টয়ভস্কির একখানা মলাটহারা নভেল অনায়াসে প্রবেশ করে দুখানা বইয়ের হিসাব বজায় রাখতে পারে।

নিজের বই নিজেই অপহরণ করা যেতে পারে। যদি কোন ছাত্র নিজের নতুন-কেনা বইখানি পুরাতন বইয়ের দোকানে বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থে সিনেমা দেখে এবং বাড়িতে বাপ-মার কাছে বলে ইস্কুলে বা কলেজে বইখানা চুরি গিয়েছে, তা হলে সেটা হল স্বাপহৃতি।

সবচেয়ে বেশী বই খোয়া যায় পড়বার জন্য অপরকে বই ধার দেওয়ায়। প্রায়ই দেখা যায়, পরিচিত ব্যক্তিরা বা বন্ধুবান্ধবরা বই পড়তে নেন, কিন্তু যথাসময়ে তা ফেরত দিতে তাঁদের মনে থাকে না।—না-চাইতে খুব কম লোকই বই ফেরত দেন। তবে যাঁর বই তাঁরও ত স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ—বহুদিন অতীত হলে তাঁরও মনে থাকে না—কে বইখানি পড়তে নিয়ে গিয়েছে। সবাই যে ইচ্ছা করে ফেরত দেন না তা না হতে পারে। কারও কারও বইখানাকে এতই দরকারী মনে হয় যে, তিনি তা আর ফেরত দিতে চান না। ছাতা, ঘড়ি, দা কুড়ুল, থার্মোমিটার, হটব্যাগ, টাইমটেবল, পাঁজি ইত্যাদির মত পড়ার বই এমন এসেনস্যাল বস্তু নয়, ধার নেওয়া টাকাও নয় যে, ফেরত দিতেই হবে—অনেকের এইরূপই ধারণা। ফেরত দেবার ইচ্ছা না থাকলে ধার-করা বইকে অত্যন্ত সযত্নে সংগোপনেই রাখতে হয়। কাচের আলমারিতে রাখা চলে না, অন্য কাউকে ধার দেওয়াও চলে না। অনেকেরই এ অভ্যাস আছে কাজেই এইভাবে গ্রন্থ আহরণকে অপহৃতি বললে তাঁরা রাগ করবেন—সেজন্য একে অপহৃতি না বলে অপাহৃতি বলব, অর্থাৎ হরণ না বলে আহরণ বলব। তবে অপ উপসর্গটি অপরিহার্য।

আমার 'বিদ্যাপতির পদাবলী' দুবার অপাহৃত হয়—তৃতীয় বার যখন বইখানা খুঁজে পেলাম না—কে নিয়ে গিয়েছে মনেও পড়ল না, তখন পাড়াসুদ্ধ সুপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম "ওহে বিদ্যাপতিখানা ফেরত দিচ্ছ না কেন? তিন বছর হয়ে গেল—এখনও তোমার কাজ শেষ হল না?" এইরূপ প্রশ্ন করতে করতে বইখানার হদিস মিলে গেল। একজন বললে, "হাঁ স্যার, অনেক দিন হল। দোষ হয়েছে। কাল নিশ্চয় দিয়ে আসব।" বলা বাহুল্য, বইখানা দিয়ে গেল। তখন অন্যান্য যে সকল সুপরিচিতদের ঐরূপ অনুযোগ করেছিলাম—তাঁদের কাছে সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করলাম। এইরূপ প্রশ্ন করায় আর-একখানা বইয়েরও হদিস পাওয়া গেল। একজন বলেছিল, "বিদ্যাপতি ত আমি নিইনি স্যার, তবে আপনার 'ভক্তিরত্নাকর'খানা আমার কাছে আছে—তিন বছর নয়, মাত্র এক বছর। সাত দিনের মধ্যে দিয়ে আসব।" একেবারেই এ বইয়ের কথা মনে ছিল না। বললাম "ভুল হয়েছে,—হাঁ হাঁ 'ভক্তিরত্নাকর'। কী যে তোমাদের কাণ্ড! না চাইলে বা বেশী তাগিদ না দিলে ফেরত দেন না এইরূপ সংকল্পই অধিকাংশের। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, "হারিয়ে ফেলেছি স্যার, একখানা কিনেই দেব। দামটা কত বলুন ত!" তখন বলতে হয়, "থাক্, আর কিনে দিতে হবে না। বই পড়তে নিলে বই সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়।" অপহৃত ও অপাহৃত বইয়ের আদর সবচেয়ে বেশী।

এইবার উপহৃত বইয়ের কথা বলি। বিবাহ উপলক্ষে তরুণ-তরুণীরা এবং জন্মতিথি উপলক্ষে ক্ষণজন্মারা নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে রাশি রাশি বই উপহার পান। বলা বাহুল্য, বইগুলি মূল্যবান উপহারের অনুকম্পমাত্র, 'মধুভাবে গুড়'। অতএব অনুকম্পের যতটা আদর এগুলিরও আদর ততটাই। এ সব বই সাধারণত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে লুট হয়ে যায়। মূল্যবান শৌখিন বস্তুগুলি ফেলে বইয়ের দিকে তাকাবার অবসর থাকে না কারও। এইরূপ উপহৃত বইগুলি কদাচিৎ কোথাও সযত্নে রক্ষিত হয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়িতে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিজে অপ্রবীণ। গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে কতকগুলি বই স্তূপায়মান—কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন বইয়ের দোকানের একজন মালিক বইগুলির স্বাস্থ্য, মূল্যবত্তা ও শ্রীসৌষ্ঠব পরীক্ষা করছে। গৃহকর্তা আরও বইয়ের সন্ধানে তেতলায় গিয়েছেন। ওই বইয়ের স্তূপে নৈবেদ্যের উপর মোণ্ডার মত আমার রচিত উপহৃত তিনখানি বই বিরাজ করছে। এই দেখে আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করলাম—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে অপ্রতিভ ত করা যায় না। আমারই উপহৃত আমার নিজের বই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে দু আনা দশ পয়সায় অনেকবার কিনে এনেছি। এপথ দিয়ে আমার বহু পরিচিত লোক চলাফেরা করে, কাজেই উপায় কী?

সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে তিনবার একই বই দিয়েছি—তিনি তবু বলেন, "তোমার সেই হাসির গানের বইখানা দিলে না ত! তোমার বই কি কিনতে হবে নাকি?" তর্ক করিনি, চতুর্থবার আর-একখানি বইয়ের অপচয় করেছি।

বন্ধু বাড়িতে এসেছেন—বই উপহার দিয়েছি—নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছেন। তবু ভাল, আমার বই আমার কাছেই থাকল। নয়ত তিনি ট্রামে বাসে ফেলে যেতেন। মোটর চড়ে এলেই কি উপহৃত বই তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছত? একজন মোটর-ড্রাইভার একবার আমাকে বলেছিল, "আপনার পদ্য ও ছড়াগুলো বেশ মিষ্টি স্যর্—বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব মুখস্থ করেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কোনও বই কিনেছ নাকি?" সে বলল, "না স্যর্। সেদিন মেজোবাবুর হাতে একখানা বই দিলেন। বাড়ি পেঁাছে মোটর থেকে নেমে তিনি উপরে উঠছিলেন—আমি বইখানা দিতে গেলাম ছুটে, সিঁড়ি থেকে তিনি বললেন, ওখানা তুমিই নাও। আমার বেশ লাভ হল।" দেখলাম অপহৃত না হলেও সে বইখানা একজনের কাছে বেশ সমাদর লাভ করেছে। মেজোবাবুর দোতলায় উঠলে তার পাতা কেউ খুলত না। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথেই চলে যেত।

একজন পদস্থ প্রতপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—রসচক্রের প্রকাশিত ১৮ খানা কথাসাহিত্যের বই উপহার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন, কিন্তু বললেন, "বাংলা বই আমি ত পড়ি না, রেখে যান, থাক্, মেয়েরা পড়বে।" একখানা বইও হাতে করে ছুঁলেন না। বাড়ি ফিরে ভাইয়ের কাছে তিরস্কৃত হলাম। আর এক বন্ধুকে একখানা বই উপহার দিলাম বাড়িতে এলে। চলে গেলে দেখলাম বইখানা পড়ে রয়েছে। পরদিন দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম, "বইখানা না নিয়েই চলে এলে কেন?" সে বললে "আমি আনন্দবাজার জড়িয়ে তোমার সাক্ষাতেই ত নিয়ে এলাম। এখনও অবশ্য তা মোড়ক খুলে পড়বার অবসর পাইনি।" আমি বললাম, "বাড়ি গিয়ে দেখবে, সে বইখানা বিভূতির 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। আমার বই তোমার নামে উপহার লেখা এ বাড়িতেই রয়েছে—'দৃষ্টিপ্রদীপ'টাই খুঁজে পেলাম না।" যাই হক, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'টাও ফেরত পাইনি—উপহৃত বইও সে নিতে আসেনি।

রা—বাবু ছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধু শ-কে খুব ভালবাসতেন। তখন আমাদের বয়স বাইশ-তেইশ। তাঁর সিমলা স্ট্রীটের বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে তাঁর সাতখানা বড় বড় বই উপহার দিয়েছিলেন। আমি শ-এর কাছে সগর্বে সে কথা বললাম। তাতে শ—বলল, "আমাকেও দিয়েছিলেন সাতখানা বই। বোঝা বইতে হবে বলে আনিনি।" ভাবলাম শ—মিথ্যা জাঁক করছে। রা-বাবুকে শ-এর কথা বললাম। রা-বাবু বললেন, "হাঁ, আমি শ-এর জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভিতর গেলাম—ফিরে এসে দেখি শ—পালিয়েছে,—বইগুলোর মধ্যে কেবল একখানা নেই। ও বুঝি ইতিহাসের বই—পছন্দ করে না?"

উপহৃত বইয়ের দুর্দশা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি একজন অকৃতবিদ্য শিক্ষকমাত্র, সাহিত্যসেবার দ্বারা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিনি—পদগৌরবও আমার নেই। আমি নিজে রাশি রাশি পুস্তক উপহার পাই না। জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাংলা পুস্তকগুলি হয় কিনেছি, নয়ত ভিক্ষা করে পেয়েছি। অবশ্য কথাসাহিত্যের দু-দশখানা বই উপহার পেয়েছি, অধিকাংশই অনুজ সাহিত্যিকদের কাছে চেয়ে নেওয়া—ইচ্ছা করে শ্রদ্ধাবশত উপহার কচিৎ কেউ দিয়েছে। রাশি রাশি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য কবিতার বই উপহার পাই। তাই আমারও উপহৃত পুস্তকের প্রতি দরদ নেই। উপহৃত অধিকাংশ উপন্যাসও বাড়িতে নেই। ছেলেদের মাসিমারা বেড়াতে এসে সব নিয়ে যায়, পনরো দিনের মধ্যে সে সব বই টালিগঞ্জ থেকে টালায় কিংবা বালিগঞ্জ থেকে বালিতে চলে যায়। উপন্যাসগুলোর পাখা আছে। ওগুলো কিছুতেই পোষও মানে না। যে পোষ মানে না, স্বতই তার প্রতি দরদ থাকে না।

পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত লোকদের পরিতোষণের জন্য আমরা বই উপহার দিই। সেগুলিকে তাঁদের গৃহে রাখবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখতে পাই না। অধ্যাপকরা তাঁদের অধ্যাপনার সহায়ক গ্রন্থগুলিকে, ব্যবহারাজীবেরা আইনের বইগুলিকে যত্ন করে রক্ষা করেন। অনেক পদস্থ লোকের বাড়িতে পোশাকের জন্য ও খেলনার জন্য স্বতন্ত্র আলমারি দেখি, কিন্তু সাহিত্য-পুস্তক রাখার জন্য স্বতন্ত্র আলমারি দেখি না। তাঁদেরও বই উপহার পাওয়ার আগ্রহ নেই—অতএব বই উপহার দিয়ে তাঁদের তুষ্ট করা যায় না। অধিকাংশ উপহৃত বই সরাসরি না-হোক একাধিক হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পুরাতন বইয়ের দোকানে চলে যায়। যাঁরা পুরাতন বই কেনেন, তাঁরা পুরাতন বইয়ের পাতা উল্টিয়েই দেখতে পাবেন—কে কাকে বইখানা উপহার দিয়েছেন। সেয়ানা লেখকরা বইয়ের এমন পাতায় উপহার লেখেন যে, পাতাটা ছিঁড়ে নতুন বই বলে তা দোকানে বিক্রি করা চলবে না।

যাঁর নামে কোন বই উৎসর্গ করা হয়—উৎসর্গ-করা বই একখানা অন্তত তিনি সযত্নে রক্ষা করবেন—এ প্রত্যাশা করা যায়। সকলেই কি তা করেন? অনেকে অল্প দিনের মধ্যে উৎসর্গের কথা ভুলে যান। একখানা পোস্ট কার্ড লিখেও অনেকে একটা ধন্যবাদও দেন না। উৎসর্গের দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তি ও উৎসর্গকারী লেখকের মধ্যে এদেশে একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠে না। এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

যাক, এ সব অবান্তর কথা। যা বলছিলাম তাই বলি—অপহরণের ভয়ে জ্ঞানগর্ভ, চিরন্তন মূল্যের বইগুলো ও রেফারেন্সের বইগুলোকে তালা বন্ধ করে রাখতে হয়। জানি না তারা বন্দী হয়ে স্বাধীনতা ও অধিকতর সমাদর লাভের জন্য ব্যাকুল কি না! অধিকতর সমাদর যারা করবে তাদের চোখে যাতে না পড়ে সেজনাই এই বন্দী রাখার ব্যবস্থা। আমার নিজের নামে উৎসর্গ-করা বইগুলোকেও আমি আলমারিতে তালাবন্দী করে রেখেছি—এগুলি আমার পরম সম্পদ। যখনই সেগুলি আমার চোখে পড়ে তখনই তাদের লেখকের উদ্দেশে আমার হৃদয়ে প্রীতি বিগলিত হয়। যখনই এই সব উৎসর্গের কথা মনে পড়ে, তখনই তাদের রচনার উদ্দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করি।

ইংরাজী ও সংস্কৃত বইগুলিকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন হয় না। 'বিদ্যাপতির পদবলী' সংস্কৃতও নয়, ইংরাজীও নয়। এর সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আমার দুখানি বিদ্যাপতি অন্য সাহিত্যানুরাগীর গৃহে অধিকতর যত্নে আদরে রক্ষিত আছে—সে যত্ন আদর যদি এ গৃহে পেত, তা হলে তা গৃহান্তরিত হত না।

গ্রন্থের যথোচিত আদর করতে হলে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করতে হবে।

যুবতী-হৃদয়

সন্তোষকুমার ঘোষ

“এ-বাসটা ভাল না, এই বাসে যাব না।”

অন্য সব দিনের মত আজও বিশবস্ত রেনটি-গাছটা ছাতা ধরে ছিল, মাদী শুয়োরটা নর্দামার কাদা শুঁকতে শুঁকতেই মুখ তুলে এক-একবার ভীত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, দুপুরের চড়া রোদে কৃষ্ণচূড়াগাছটাকে খুব রাগী আর এলোচুল মাতালের মত লাগছিল, মোটর-মেরামতী দোকানটায় লোহাপেটানো আওয়াজের বিরাম ছিল না। কাছাকাছি, কিন্তু অন্তত তখন চোখের আড়াল কোন উৎস থেকে মৃদু-মিষ্টি একটা গন্ধ আসছিল, হয়ত কোন ফুলের, যার নাম করবী জানে না, কিন্তু গন্ধটুকু মন্দ লাগে না, আজও লাগছিল না, আর লাগছিল না বলেই মোটর-মেকানিক ছোকরা অন্যান্য দিনের মত আজও তাকে দেখে হাসল, করবী তবু রাগ করতে পারল না।

নিজের হাসি চেপে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। ছেলেটা রোজ ওকে চেয়ে চেয়ে দেখে। রোজ হাসে। ও করবীর নাম জানে।

করবীও ওর নাম জানে। হাবুল। ওই নামে দোকানের একটা লোক ওকে ডাকছিল। করবী শুনেছে।

মাথা নিচু করে কাজ করছিল হাবুল। ওর পোষা কুকুরটা পাশে শুয়ে শুয়ে দেখছিল। মুগ্ধ, নিরীহ, ভক্ত। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-রকম ছবি দেখা যায়। কুকুরটাও কাজ শিখছে নাকি। হাবুল বুঝি কুকুরটাকেই ওর শাগরেদ বানাবে। তেল-কালিমাখা খাকী প্যান্টটার পিছনে হাত মুছল হাবুল, শুকনো পাঁউরুটি পকেট থেকে বের করে, ছিঁড়ে মুখে পুরল এক টুকরো। কুকুরটা খাবায় ভর করে উঠে দাঁড়িয়েছিল, হাবুল ওকে তাক করে প্রথমে একটা ঢিল ছুড়ল। কুকুরটা নড়ল না দেখে হাবুল অগত্যা পাঁউরুটিরই খানিকটা কুকুরটাকে ছিঁড়ে দিল। রোজ যেমন দেয়। ওর সারাদিনের খোরাকে কুকুরটা ভাগ বসায়, হাবুল রাগ করে বটে, কিন্তু সেটা রাগের ভানমাত্র, সত্যিকারের রাগ নয়। প্রভু আর ভক্ত কুকুরের কাড়াকাড়ি দেখতে মন্দ লাগে না।

লাগে না, তাই অন্য দিনের মত করবী আজও একটুখানি দাঁড়াল। লোহা-লক্কড়-লকড়ির একটা লোকে-ভর্তি খাঁচা এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সেটায় উঠল না। গরম টায়ার থেকে ভাপসা গন্ধ উঠছিল, তার হলকা নাকে লাগতে করবী সরে দাঁড়াল। কেমন যেন কড়া, কটু-কটু। বিশ্রী লাগে, সহ্য হয় না।

“এ-বাসটা ভাল না, এই বাসে যাব না।” করবী বলল মনে মনে। বাসটাকে এক বাক্যে নামঞ্জুর করল। কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যেমন করে। তাকেও অনেকে যা করেছে। “ওরা ভাল করে দেখে না, যাচাই করে না, সরাসরি খারিজ করে দেয়।”

করবীও তাই করল। শোধ নিল। অস্পষ্ট অবচেতন বিরাগ বাসটার উপর যেন পুরুষ সত্তা আরোপ করল। করবীও ইচ্ছা হলে তার অপছন্দ করার অধিকারকে প্রয়োগ করতে পারে।

প্রত্যাখ্যাত বাসটা যেই চোখের আড়াল হল, অমনই করবীর মনে হল, কাজটা ভাল হয়নি। বাস অবশ্য আরও আছে, আরও আসবে, কিন্তু হাতের একটা বাস ঝোপের দুটোর চেয়ে ভাল। আর সত্যই সামনের খোলা রাস্তাটার দিকে করবী যতক্ষণ চেয়ে রইল, কোন বাসের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না।

এত দেরি কেন করছে, কে জানে। দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল। খানিকটা সরে রেনট্রি-গাছটার নীচে দাঁড়াতে হল করবীকে, হাওয়ায় আঁচল উড়ছিল, বিব্রত আঁচল সামলাতে ব্যস্ত করবী টের পাচ্ছিল, মোটর-মেরামতী দোকানের হাবুল তার দিকে চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে হাবুল একটু হাসলও। এ-হাসির কোন

মানে নেই, এ-হাসিতে বিশ্রী কোন ইশারাও নেই, এ শুধু হাসার জন্যেই হাসা।

এতক্ষণ পথের পিচ, ধুলো আর বালি তেতে ছিল, বৃষ্টির ফোঁটা তাই মাটি ছুঁতে-না-ছুঁতে উবে গেল। বাষ্প হয়ে ফের আকাশে উড়ে যাবার পথে খানিকটা ধুলো-বালির গন্ধ গায়ে মেখে নিল। কারখানাটা টিনের আটচালা, টুপটুপ বৃষ্টির ফোঁটা টোকা দিয়ে দিয়ে ফুটো খুঁজছিল। আর, সেই মাদী শুয়োরটা তার বাচ্চার পাল নিয়ে কালভার্টের নীচে আশ্রয় খুঁজছিল। আর-একটু পরেই ত কালভার্টের তলা দিয়ে ঢল বয়ে যাবে, তখন কোথায় যাবে ও?

আসলে করবী নিজেও একটু ভয় পেয়েছিল। যদি আরও জোরে বৃষ্টি নামে? তখন ধুলোমাখা বৃষ্টির গন্ধে হয়ত নেশা থাকবে না, করবীকে আরও পিছিয়ে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়াতে হবে। গুঁড়ি বেয়ে সারি-সারি পিঁপড়ের ওঠা-নামা করবী আগেই দেখে নিয়েছিল, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়াতে করবীর আপত্তি ছিল না। এখনই পিঠের কাছটা সিরসির করছে, জামার নীচে যেন পিঁপড়ে হাঁটছে। পিঁপড়ে, না, জলের ফোঁটা?

যদি চেপে নেমে আসে বৃষ্টি, তখন হয়ত আর এই গাছের তলাতে কুলোবে না, করবীকে ওই মোটর-মেরামতী চালায় দাঁড়াতে হবে। হাবুল ওকে দাঁড়াতে দেবে নিশ্চয়ই, হয়ত একটা টুলও পেতে দেবে। তারপর হাসবে। সেই হাসি ফিরিয়েও দিতে হবে। আশ্রয়টুকু আর টুলে বসার দাম। কিন্তু তার পরে? আরও কোন কথা হবে কি? কী কথা হতে পারে টাইপিস্ট একটি মেয়ের সঙ্গে মোটর-মেকানিক এক ছোকরার? বই নিয়ে?—না। গান নিয়ে? ও গানের কী বোঝে! তবে সিনেমার গান জানে। সিনেমা নিয়েও দু-চার কথা অবশ্য হতে পারে। ছোট্ট চালাটার মধ্যে হাবুলও চলাফেরা করবে, কাজে না হক, কাজের অছিলায়, এক-আধবার গা-ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে, যেতে পারে। আঁচলে একটু তেলকালি লাগবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে। কিন্তু আর কী-ই বা ক্ষতি হবে! অপরিচিত লোকগুলো যে মাসে দু-চার বার করে কনে-পছন্দ করার ছুতোয় তাকে ছুঁয়ে যায়, হাতের তেলো টিপে দেখে, যারা আধবুড়োটে তারা পায়ের গোছও দেখে, কতটুকু ক্ষতি হয় করবীর? কী খোয়া যায়? কিছু না। হাবুল ছুঁলেও অতএব কিছু এসে যাবে না। বাড়ি ফিরে একবার গা ধুলেই—ব্যস্।

কিন্তু এত ভাবনার দরকার ছিল না, বৃষ্টি আর জোরে নামেনি, করবীও তাই গাছ-তলায় দাঁড়িয়েই অল্প-অল্প ভিজছিল। আর, তার ভাগ্য ভাল, দ্বিতীয় বাসটা একটু পরে এসেও পড়ল। এর চেহারা ভাল, কিন্তু এ কি আমাকে নেবে, বড্ড যে ভিড়, করবী ভয়ে ভয়ে ভাবল, হাত তুলল, কয়েক পা এগিয়েও গেল তাড়াতাড়ি। পা-দানিতেও লোক দাঁড়িয়ে, বাসের পিছনেও যে লোক দাঁড়িয়ে, তা টের পাওয়া যায়।

'এ-বাস আমাকে নেবে না' করবী আবার ভাবল ভয় পেয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভরসাও পেল, কেন না ফুটবোর্ডে কনডাকটারের শাগরেদ যে ছোকরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। করবীকে আর কষ্ট করতে হল না, ওই ছোকরাই তাকে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল।

"উঠুন, উঠুন, উঠে যান, চলে যান ভেতরে।" করবী বুঝতে পারছিল না, ছোকরা কাকে লক্ষ্য করে বলছিল, তাকে, না, অন্য কাউকে। পা কাঁপছে, করবী তখন পর্যন্ত মাত্র হাতলটাই ধরতে পেরেছিল। চোখে অন্ধকার, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

"যান, যান ভেতরে যান", ছোকরা আবার বলল। যাই কী করে, করবী মনে মনে বলল, হাতের বেড় দিয়ে তুমি এখন আমাকে ধরে আছ, জাপটে রেখেছ বলতে পারি, তবে আমি রাগ করছি না, কারণ তুমি আমাকে তুলেও নিয়েছ। তুমি না থাকলে এ-বাসেও আমার ওঠা হত না। এ-বাসটাও আমাকে নিত না।

বাস চলছিল। টলতে টলতে করবী এগিয়ে গেল সামনে, প্রায় নিরবয়ব হয়ে গলে গলে। যাত্রীরা সকলেই ঊর্ধ্ববাহু, উপরের রডে হাত রাখার জায়গা নেই। তবু করবী কোনমতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট সীটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল। সীটে অন্য লোক ছিল—পুরুষ। করবীকে দেখেই সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিল, কিন্তু সামান্য একটু ইতস্তত করে লোকটা উঠেও পড়ল। তার পিছনে-পিছনে তার পাশের ভদ্রলোকটিও। ধপ করে বসে পড়ল করবী, এতক্ষণে ব্যাগটা কোলে ফেলে কোমরে-গোঁজা ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ মোছার অবসর পেল। রুমালে ঘামের গন্ধ, কিন্তু এ-গন্ধ করবী চেনে, ঘাম তার নিজের। কঁসিতে গুঁজে রাখা রুমালটা এতক্ষণ তবে একটু-একটু করে ভিজে উঠছিল?

পাঞ্জাবির কোণাই এতক্ষণ পাশের লোকটির উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ ছিল। মুখ মুছে করবী আড়চোখে তাকাল তার দিকে। কামানো গাল, ফরসা-ফরসা মুখ, আর দশজনের মতই, তবু যেন চেনা-চেনা মনে হয়।

লোকটাও করবীর দিকে চেয়েছিল। করবী তাকাতে তার চোখের পলক পড়ল। লোকটা যেন একটু হাসল। সেই হাসি দিয়েই করবী চিনতে পারল ওকে।

সামনের বাড়ির ছাদে যে বিকেলে ওঠে, সেই লোকটা না? পাড়ার লোক। আগে কখনও আলাপ হয়নি, তবু করবীর কেমন সংকোচ হল, সরে বসল জানলার ধারে। অস্ফুট স্বরে বলল, "বসুন আপনি, বসুন না।"

দ্বিরুক্তি করল না, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে করবী টের পেল, দুজনের পক্ষে সীটগুলির পরিসর কত কম। লোকটাও নিতান্ত রোগা নয়, সত্যি। ওর কব্জির বেড় দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু ইচ্ছে করেই ও এদিকে ঘেঁষে বসেনি ত!

এ-বাসটার চলা কেমন যেন, মাতাল-মাতাল। যেন টলমল নৌকো। যাত্রীদেরও মাতাল করে দেয়। টাল সামলানো দায়, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। সে ভয় করবীরও ছিল, সে শক্ত করে জানলার রড আঁকড়ে ধরে বসে রইল।

পাড়ার যে-লোকটা ওর পাশে বসে আছে, যাকে ও বসতে দিয়েছে, না না, বসতে দিতে বাধ্য হয়েছে, সে কেন সামনের সীটের পিঠটা শক্ত করে ধরেনি, করবী বুঝতে পারছিল না। একে গরম, তাতে ভিড়, আর বাসটার অসভ্য মাতাল-মাতাল চলা—করবী চটছিল। বিশ্রী গুমোট গন্ধটা এড়াতে সে জানালার রডে নাক রেখেছিল। রডটা ঠান্ডা। পাশে তাকালেই ঝিম ধরে, মাথা ঘোরে, তবু করবী মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। মৃদু একটা সুবাস—ফুলের, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসছে কোথা থেকে? বিশেষ করে চলন্ত বাসে, এই ভিড়ে? করবী চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চাইছিল, আর, তখনই তার নজরে পড়ল। পাশের ভদ্রলোকই ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ধরে আছেন। সবুজ ডাঁটার আভাস করবী অনেক আগেই পেয়েছিল, তখন ঠিক ধরতে পারেনি। ভেবেছিল, সজনে বা ওই-জাতীয় কিছু হবে। এই দমবন্ধ ঊর্ধ্বশ্বাস বাসে, বমি-বমি পরিবেশেও যিনি রজনীগন্ধার গুচ্ছ বয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁর প্রতি করবী কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

ভদ্রলোক যে কিছু শৌখিন, তা ত করবী জানেই। ছাদ ত সবার বাড়িতেই আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই কজন সেখানে উঠে হাওয়া খায়? ইনি খান। অনেকখানি শখ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন বলেই ত?

অথচ আমি, মরমে মরে গিয়ে করবী ভাবল, অথচ আমি ভুল বুঝেছি ওঁকে। ওঁর হাওয়া-খাওয়ার খারাপ মানে করেছি। ঘরে ফিরে কাপড়-ছাড়বার সময় অস্বস্তি বোধ করেছি। কোনদিন শব্দ করে বন্ধ করে দিয়েছি জানলা। এই ত এতক্ষণ ধরে উনি আমারই পাশে বসে, কই, চুরি করে অন্য বাড়ির মেয়েদের দেখে নেবার মত লোক ত উনি নন! অন্তত তেমন ত মনে হচ্ছে না এখন। যারা বাসেও রজনীগন্ধার সুবাস

বিলোতে বিলোতে যায়, পরের বাড়ির মেয়েদের দেখে উঁকি দেবার মত কুরুচি তাদের হয় না।

অথচ এই লোকটা দেখেও কিন্তু। লোকটা নয়, এই ভদ্রলোক। ইনি দেখেন। তাতে কোন ভুল নেই—করবীর মনে তখন পাল্টা ভাবনার স্রোত বইছিল। আমার চোখের সাক্ষিকে আমি ভুলব কী করে!

কতবার এই লোকটাই করবীর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে। সরে গিয়েছে চোর-চোর ভাব নিয়ে। মনে পাপ না থাকলে অমন চোর-চোর ভাব হবে কেন?

পাপ? করবী আবার ভাবল, এই ভদ্রলোক যা করে থাকেন, তা কি পাপ? অন্যায়, তাই বা কেন! মাঝে মাঝে আমার ত বেশ মজাই লাগে। আমিও চোখ না নামিয়ে সোজাসুজি ও'র দিকে চেয়ে থাকি। সন্ধ্যাবেলা গা ধুয়ে এসে যখন কোন কাজ থাকে না, বই ছুঁতে মন যায় না, তখন ওই মজাটুকুই বা মন্দ কী! খেলা বই ত নয়। নিখরচার আনন্দ।

সেই ভদ্রলোকই এখন ওর পাশে বসে আছে, করবীর গায়ে কাঁটা দিল। ও'র কোঁচা নীচে লুটোচ্ছে, ও'র হাতে ফুলের গুচ্ছ। যাকে আড়ি-পাতা লোভী লোক ভাবতুম, তাকে ঠিক এখন অন্য রকম লাগছে।

"আপনি কোথায় যাবেন—চৌরঙ্গী?" করবী চমকে তাকাল। ভদ্রলোকের গলা। তাকেই বলছেন। এতক্ষণ বাদে কনডাকটার টিকিটের পয়সা নিতে হাত পেতেছে। তাকে দেবেন বলে ভদ্রলোক এক টাকার একটি নোট বের করেছেন। বাধা দেবে বলে করবী হাত তুলতে গেল, চঞ্চল হাতে ঘাঁটাঘাঁটি করল নিজের ব্যাগের খুচরো পয়সা, কিন্তু সবিস্ময়ে এও লক্ষ্য করল, প্রতিবাদের একটি কথাও তার মুখে ফুটল না। অবাক হয়ে টের পেল, সে অর্থহীন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, "চৌরঙ্গীতে যাব কী করে জানলেন?"

"আমি জানি।" মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক, ওর হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিলেন। করবী সেই সঙ্গে এ-ও দেখল, ও'র নিজের টিকিটটা আলাদা রঙের—বোধ হয় দু-পয়সা কম ভাড়ার।

"আমি নামব কলুটোলায়", বললেন ভদ্রলোক। যেন করবীর কৌতূহলটা নিরসন করলেন।

করবী ফুলগুলির দিকে চেয়েছিল। ভদ্রলোক বুঝি সে-প্রশ্নটাও বুঝলেন—"আমার এক বন্ধুর আজ জন্মদিন। সে অসুস্থ। তাকে দেব।"

আশ্চর্য, কী সুন্দর রুচি। কী পরিমিত হাসি! আর উনি কী বন্ধুবৎসল! তবু কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠতে ছাড়েন না। নির্লজ্জের মত চেয়ে থাকেন আমাদের ঘরের দিকে।

কিন্তু কী দেখেন উনি, আমাকে? বউদিকে দেখেন না ত! বউদি ফরসা—বউদি সুন্দরী। তবে সুন্দর শুধু মুখটাই। ওকে দেখার কিছু নেই। ওর শরীরে নেই। বিয়ে হবার পর এই সাত বছরে চারবার হাসপাতালে গিয়েছে। এবার ওদের সাবধান হওয়া ভাল। ও একেবারে কাঠি হয়ে গিয়েছে। মাসে আজকাল চারবার বিছানা নেয়। তবু বুঝি ভিজে কাঁথা, ট্যাঁ-ট্যাঁ কান্না-শোনার শখ মেটে না? এইভাবে যদি ফতুর হতে থাকে বউদি তবে ত বাইরের লোক দূরে থাক, দাদাকেও ও আর টানতে পারবে না। রূপ মানে কি শুধু রঙ আর মুখের কাটিং? পুরুষেরা আরও কিছু চায়। বউদি বোকা, জানে না।

বাস চলছিল, থামছিল, দোলানিতে ঝিমুনি আসছিল, আর করবী ভাবছিল। বউদিকে ইনি দেখেন না, এটা সে ধরেই নিয়েছিল। তাকেই দেখেন। যদিও সে ময়লা এবং মোটা। তবু তার দেহে সৌষ্ঠব আছে। ওই ভদ্রলোক তাই দেখেন। সে যখন ঘাড় নুইয়ে জামার বোতাম আঁটে, তখন। সে যখন পিছন দিকে মাথা এলিয়ে চুলে চিরুনি চালায়, তখনও।

আমারও যে কোন আকর্ষণ নেই, বলা যায় না। করবী ভাবল। কিন্তু আছে যে, তাই বা বলি কী করে! আজ পর্যন্ত পছন্দ ত কারও হল না, অথচ দেখে গেল কত জন। মাসে গড়ে পাঁচজন। আমার বয়স এই আটাশ—না না, সাতাশ বছর দশ মাস। ছোট-ছোট চোখ, চ্যাপটা নাক, ভরা গোলগোল গাল, যেন ফোলানো বেগুনী বেলুন। আমাকে লোকের চোখে ধরবে কেন! বউদির মত শুকিয়ে চিমসে ত হব না, একদিন একেবারে ফেটে মরব। এই বাসে এই ভদ্রলোক উঠলেন কোথা থেকে? আমি এটাতেই উঠব, উনি জানতেন? তা কী করে হবে, উনি আসলে ভিড় এড়াতে একটা বা দুটো স্টপ আগে থেকে উঠেছিলেন। তবু লেডীজ সীট ছাড়া বসবার জায়গা পাননি।

করবীর ঘুম পেয়েছিল, তবু টান টান করে চোখ মেলে চেয়ে রইল। ভদ্রলোকের ভঙ্গি কেমন নির্বিকার, অন্যমনস্ক দেখ। করবীর রাগ হল। সব ভান, সে যেন আর বোঝে না! মাঝ মাঝে ঝাঁকুনিতে কাঁধে-কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে, কখনও বা হাতে-হাতে—দূরের ছাদ থেকে চেয়ে চেয়ে যতটুকু পান ভদ্রলোক, আজ তার থেকে ঢের বেশী পেয়ে গেলেন।

করবীর তন্দ্রা এসেছিল। একটা রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামতেই তন্দ্রা ছুটে গেল, চেয়ে দেখল, ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছেন। কিছু বললেন না, যাবার আগে সামান্য হাসলেন। যেন করবীর কাছে গচ্ছিত রাখলেন হাসিটা। সে-হাসির মানে করবী বুঝল। মানে, "আমি এখানেই নামব।"

ফিরতি পথেও করবী বাসে উঠেছিল। এ-বাসেও ভিড়, তবে তেমন নয়। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঝিরঝির বৃষ্টি চলছে ত চলছেই, নামছে, থামছে, নামছে।

এই বৃষ্টির জন্যেই ত আজ অফিসে কাজ বিশেষ হল না। মাত্র গোটা চারেক চিঠি খটাখট করতে হয়েছিল। কিন্তু সাহেব একবারও ডাকেননি। আর সেকশনের বড়বাবু নিজেই গরহাজির। বীরেন, ললিত, তালুকদার, দত্ত, ওরা সবাই মিলে উপর তলার ক্যানটিনের কোণের ঘরটায় আড্ডা জমিয়েছিল। করবীকে ওরা ডেকে নিয়েছিল। মিনাকেও। ডিমভাজা আর চা চলছিল। চা আর চুরুট। ধোঁয়া আর কড়া গন্ধ। ওরা ইলেকশনের কথা বলছিল। বীরেন এবার ইলেকশনে দাঁড়াবে, ইউনিয়নের সেক্রেটারি হবে। মিনাও ওদের কথায় যোগ দিয়েছিল, ওর একটু পাকামি-ভাব আছে। আমি কিছু বলছিলাম না, শুধু শুনছিলাম। ডিমভাজা ভেঙে ভেঙে মুখে তুলছিলাম।

মিনা প্লেটটা ছুঁয়েও দেখেনি, গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বলেছে, খিদে নেই। ঢং। ওরা মিনাকে সাধছিল, নিজেরাও খাচ্ছিল। আমার খিদে পেয়েছে, আমি ত খাবই। আমার কি খিদে বেশী! দস্তুর কী একটা কথায় মিনা হেসে উঠল, সাদা দাঁত কিন্তু মাড়িও দেখা গেল। তোর উপরের ঠোঁট ছোট কোন্ লজ্জায় তুই খোলাখুলি হাসিস জানিনে। হাসি পেলে হাত দিয়ে ত মুখ আড়াল করা যায়। আর-একবার কী-একটা কথার পিঠে সকলে হেসে উঠল, কিন্তু মিনা আলগোছে ললিতের পিঠে থাপ্পড় মারল, ও বরাবরই গায়ে-পড়া। ওর কটা মুখ চড়া আলোয় বিশ্রী লাগছিল—অত কটা সত্যি-সত্যিই তুমি কিন্তু নও বাপু। বেশ কয়েক পাল্লা ত পালিশ! নইলে তোমার কনুই থেকে হাতের পাতা অবধি আলাদা রকমের হত না। গোঁজামিল ধরা পড়েই। চেষ্টা করলে আমিও—নাকটাকে টিকলো না করতে পারি—আর-একটু ফরসা হতে কি পারি না? ধরা পড়ার ভয় আছে যে। রুচিও নেই। তা-হলেও আড্ডা জমেছিল কিন্তু খুব। আমার নেশার মত লাগছিল। উঠে আসতে মন চাইছিল না। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টাও চলছিল। এত হাসি আমি জীবনে হাসিনি। তালুকদার আমার কব্জিতে একটা চিমটি কাটল। এখনও যেন জলছে। ওর সাহস কিন্তু খুব—কিন্তু আমি রাগ করিনি। ওর বেশী ত এগোবে না, ওদের আমি চিনি। চিমটি পর্যন্তই। তা-ছাড়া তালুকদারের ত বউ আছে, বীরেন ত শুনেছি বিয়েই করবে না। চুরুটের কড়া গন্ধ, চা, আড্ডা, বড় জোর চিমটি—এর চেয়ে বেশী কিছু ওরা দেবে না। আমিও নেব না। ডিমভাজা অতটা খেয়ে ফেলা কিন্তু ঠিক হয়নি। ভাল খেতে পাইনে বলেই কি আমার খিদে একটু বেশী?

কনডাকটার, 'টিকিট' বলতেই করবীর ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। চেয়ে দেখতে মনে হল, দুপুরের বাসে যে ছিল, সেই। মুখ শুকনো, চুল এলোমেলো। সেই থেকে এই অবধি খাটছে? দুপুরে ওই ভদ্রলোক পাশে ছিলেন, পয়সা দিয়েছিলেন। এখন করবীর পাশটা খালি। এই জলে সাধ করে কেউ পথে বের হয়! বউদি কী করেছ এখন? কাত হয়ে শুয়ে বাচ্চাকে থাবড়াচ্ছে? আছে বেশ আরামে। খাটুনি নেই, রাস্তা নেই, বাস নেই, ভিড় নেই। ঘর, বারান্দা, বিছানা। ঘরে শোওয়া আর থুথু ফেলার ছুতোয় বারান্দায় বেরোনো। দাদা ফিরলে একবার হাই তুলবে, খাবারের থালার ঢাকনাটা তুলে দেবে শুধু। তারপর? আলো নেবানো, আবার বিছানা, গভীর রাত। এ-জীবনে কী সুখ, ওই জানে। সুখ যাই হক, তার দামও দিতে হয় পুরোপুরি চুকিয়ে। এই সাত বছরেই হাড় ভাজা-ভাজা হয়েছে, মাস দাঁড়ি, শুকিয়ে খিটখিটে শাঁকচুন্নি, আর এক গণ্ডা বাচ্চার মা জননী। ঘর পেয়েছে কিন্তু ঘরনীগিরির সুখের সুদ মেটাচ্ছে বার বার হাসপাতালে গিয়ে। সেবার ত তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

অমিতবাবু ফিরেছেন কিনা, তাও করবী একবার ভাবল। দাদার বন্ধু পেয়িং গেস্ট এই ভদ্রলোকটি এক নম্বরের কুড়ে। পাশ ফিরে শোন না, জল গড়িয়ে খান না। হয়ত চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। অলস বটে, তবে ভাল মানুষ। একটা ঘরে থাকা আর দু-বেলা দু-থালা ভাত, তার জন্যেই মাস গেলে সওয়া-শ টাকা। দাদার আয়ের ফন্দিটা বেশ। জামা-কাপড় ময়লা হয়ে জমে থাকে, ভদ্রলোকের হুঁশ নেই। বউদি মাঝে মাঝে গেঞ্জি-টেঞ্জি কেচে দেয়। তা দিক, কিন্তু বউদি করবীকে নিয়ে ঠাট্টা করে কেন? অমিতবাবু কি ভুলেও কোনদিন তার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন? চশমার আড়ালে ও'র চোখ দুটি কানা কিনা তাই বা কে জানে! করবীর ভাবতেই হাসি পেল—বউদি বলে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। বলে, তুমি কোন কাজের নও ঠাকুরঝি। থাকত আমার উপায় তবে দেখতে মুনিবরের ধ্যান কবে দিতুম ছুটিয়ে। মুখের বড়াই যত সব। তোমার সাধ্য নয়। আমি এই ভারী গতর নিয়ে পারি না, আর তুমি ত চামচিকে!

ও'র গেঞ্জি-টেঞ্জি মাঝে মাঝে কাচতে হয় কিন্তু করবীকেও। বউদি ত প্রায়ই বিছানা নেয়। সাবানের ফেনা জমে, নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়—থিকথিক, ঘিনঘিন! ঘেন্না করে। কিন্তু সবটাই কি ঘেন্না? যদি তাই হবে তবে ওই থিকথিক-ঘিনঘিন ফেনার স্তূপ একদিন নাকের কাছে ধরেছিলুম কেন? আমার মাথা ঘুরছিল, গা উঠেছিল ঘুলিয়ে। কী উৎকট, কী অসহ্য! বউদি কোনদিন কি টের পায় না এ-সব—নাকি এ-গন্ধ ওর সয়ে গিয়েছে? বিয়ে হলে কি মেয়েদের এ-সব বোধ ভোঁতা হয়? জানব কী করে!

আরও জোরে বৃষ্টি নেমেছিল, হঠাৎ একটা ঝমঝম পাগলামি, করবী সরে বসল। তাতেও হল না—সব ভিজে যায় যে। জানলা ধরে টানাটানি করল খানিক, কিন্তু পাল্লা একচুল নড়ল না। অসহায় করবী বসে ছিল, চাইছিল এদিক-ওদিক, তখন ঐ খাকী জামাপরা কনডাকটর এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দিল সে, বেয়ারা বাচ্চাকে যেমন করে শাসন করে, তেমন করে যেন কান ধরে ঝাঁকাতে থাকল জানলাটাকে।

যতক্ষণ না উঠল জানলা ততক্ষণ করবী কাঁপতে থাকল। কনডাকটারের কনুই ঠেকছে তার মাথায়, করবীর কাঁধ ওর কোমরের কাছে। এত নুয়েই বা পড়ছে কেন লোকটা, ওর নিশ্বাস কি তার চুলে পড়ছে? করবী কাঠ হয়ে ছিল। শিটিয়ে যাচ্ছে কেন সারা শরীর—সেই সঙ্গে, সেই সঙ্গে একটু ভালই বা লাগছে কেন!

জানলা বন্ধ হবার পরও অনেকক্ষণ করবী যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে ছিল। পলক পড়ছিল না, একটি স্পর্শকে কিছুতেই কি ভোলা যায় না, মোছা যায় না! রাগ করতে চাইছে করবী, পারছে না। শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে গোটা দুই স্টপ আগেই কোনমতে মাথা নিচু করে নেমে পড়তে হল।

তখনও বৃষ্টি একেবারে থামেনি। পথে ছলছল জল ছিল। তবু এ-পথটুকু হেঁটে, পার হওয়া শক্ত হবে না। ধুয়ে যাক অশুচিতা, আর যত গ্লানি আর কুরুচি।

নিচু হয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধল করবী, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তার একমুখী ভাবনা ঠোক্কর খেল। অশুচি—এ-কথাই বা সে ভাবছে কেন? রুচির কথাই বা উঠছে কিসে? কিছু কি লোকসান হল আমার, কিছু কি হারালাম, করবী জিজ্ঞাসা করল নিজেকে, সোজা হয়ে উঠে উপর দিকে চাইল।—কিছু না। বরং পেলাম।

আস্তে আস্তে এগিয়ে করবী দাঁড়াল সেই রেনট্রি-গাছটার নীচে। মোটর-মেরামতির দোকানে তখনও আলো জ্বলছিল, হাবুল জেগেছিল।—আর এ-ছাড়া, করবী ভাবছিল, আর এ-ছাড়া আমি পাবই বা কী! রুচি-শুচি দিয়ে ত কিছু হল না, আটাশ বছর পুরো হয়ে এল। আমার বাকী জীবনও এই। সামনের বাড়ির ওই ভদ্রলোকের চাউনি, ওই হাবুলের একটু হাসি, অফিস ক্যানটিনে হাসাহাসি আর চা-চুরুটের গন্ধ মাখামাখি; কখনও কখনও গেঞ্জিকাচা ফেনা—আর, আর কী? মনে পড়ছে না। এই দিয়েই ভরে তোলা। কোনদিন হয়ত বাড়ি-ফেরার পথে বৃষ্টি নামবে, কনডাকটার জানলা তুলে দেবে। বৃষ্টি যদি না থাকে, তবে রোদ ত থাকবে! এই সব গন্ধ আর স্পর্শের ছিটেফোঁটা নিয়েই বেঁচে চলব। বউদি কী সুখ পেয়েছে জীবনে? জানি না। কোনদিন তার অভিজ্ঞতা আমার হবে না। কিন্তু আমিও কম পাব না। ওরা পায় যেমন বেশী, দামও তেমনি বেশী দেয়। আমি পাব সামান্য, কিন্তু দামও ত দেব সামান্যই! তিল-তিল কুড়িয়েই সুখকে সম্পূর্ণ করে নেব।

বৃষ্টি থেমেছিল। করবী বাড়ির দিকে পা বাড়াল।